গুজরাট ফাইলস
এক ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্রের ময়নাতদন্ত
রানা আইয়ুব

গুজরাট ফাইলস

এক ভয়ংকর ষড়যন্ত্রের ময়নাতদন্ত

মূল: রানা আইয়ুব

ভাষান্তর: সুমন দত্ত
সম্পাদনা: টিম প্রজন্ম

৪৫ বাংলাবাজার, কম্পিউটার কমপ্লেক্স (৪র্থ তলা), ঢাকা-১১০০
মোবাইল : ০১৫৭২ ৪১০ ০১৮
facebook.com/projonmopublication
www.projonmo.pub

সূচিপত্র

লেখক পরিচিতি

রানা আইয়ুব ১৯৮৪ সালের পহেলা মে ভারতের মুম্বাই শহরে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৯২-৯৩ এ দাঙ্গার সময় তাঁর পরিবার শহর ছেড়ে মুসলিম প্রধান অঞ্চল দেওনার এ চলে যায়। রানা এই শহরেই বেড়ে ওঠেন। দিল্লির জামিয়া মিল্লিয়া ইসলামিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'মিডিয়া ও জার্নালিজম' এ স্নাতকোত্তর সম্পূর্ন করে সাংবাদিকতা শুরু করেন।

অনুসন্ধানী সাংবাদিকতায় আগ্রহ থেকে নামকরা ম্যাগাজিন '*তেহেলকা*'য় যোগ দেন রানা। ২০১৩ সালের নভেম্বর মাসে *তেহেলকা*'র প্রধান সম্পাদক তরুণ তেজপালের বিরুদ্ধে একজন অধঃস্তন কর্মী যৌন হয়রানির অভিযোগ করে। এই অভিযোগের প্রেক্ষিতে *তেহেলকা* কর্তৃপক্ষের অসন্তোষজনক প্রতিক্রিয়ার প্রতিবাদে তিনি প্রতিষ্ঠানটি ত্যাগ করেন।

বর্তমানে রানা আইয়ুব ফ্রিল্যান্স সাংবাদিক হিসেবে কাজ করছেন। *আল জাজিরা*, *ওয়াশিংটন পোস্ট*, *নিউ ইয়র্ক টাইমস*, *গার্ডিয়ান*, *ফরেন পলিসি* সহ বিভিন্ন গণমাধ্যমে নিয়মিত লিখছেন তিনি।

২০১০ সালে 'দেশভাগের পর ভারতের শীর্ষ প্রভাবশালী ৫০ মুসলিম' এর তালিকায় উঠে আসে রানার নাম। ২০১১ সালে তাঁর কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ 'সংস্কৃতি' অ্যাওয়ার্ড লাভ করেন। ২০১৬ সালে 'এমএম জার্নালিস্ট অব দ্য ইয়ার' অ্যাওয়ার্ড, ২০১৭ সালে 'গ্লোবাল শাইনিং লাইট' অ্যাওয়ার্ড এবং ২০১৮ সালে রানা 'মোস্ট রিজিয়েলেন্ট গ্লোবাল জার্নালিস্ট' অ্যাওয়ার্ড লাভ করেন রানা আইয়ুব।

ভূমিকা

সত্যের মুখ আবৃত আছে সোনার পাত্রে;
হে পূষণ, সত্যময় ধর্মের দর্শনের জন্য তা অনাবৃত করো...
- ঈশভাষ্যোপনিষদ

'গল্পকাহিনীর চেয়ে সত্য বিচিত্রতর, কারন গল্পকাহিনীকে কিছু সম্ভাবনার মধ্যে আটকে থাকতে হয়। এতে সত্যের কোন লেশ নেই' এই কথাটি বিদ্রুপ করে বলেছিলেন মার্কিন রম্য লেখক মার্ক টোয়েন। সত্যকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জন বিভিন্ন অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে দেখেছেন খ্রীষ্টের রক্ত ধরা থালার মতোই। কেননা সত্যকে একাগ্রচিত্তে খুঁজতে চাইলে দুঃখ-কষ্ট-যন্ত্রণাময় নিঃসঙ্গ পথ ধরেই চলতে হবে। পথ দেখানোর জন্য থাকবে শুধু নিজের বিবেক। কারও কাছে সাহায্য পাওয়া যাবে না। এই সত্যের প্রকৃতি কী সে-প্রশ্ন সারা পৃথিবীর দার্শনিকদের ভাবিয়ে তুলেছে বহু যুগ ধরে।

এই বই থেকে পাঠক জানতে পারবেন ২০০২ সালে গুজরাটের মর্মান্তিক ঘটনা এবং সাজানো বন্দুকযুদ্ধের কল্পকাহিনি সম্পর্কে। লেখিকার মতে, এক দীর্ঘ স্টিং অপারেশনের সময় বহুল-ব্যবহৃত একটি গোপন ক্যামেরা ও গোপন মাইক্রোফোনের সূত্রে প্রাপ্ত বিষয়গুলি জানতে পারবেন। এই বইতে উপস্থাপিত বিষয়গুলি সত্য নাকি নিছকই ঘটনার রূপমাত্র তা বিচার করবেন পাঠক মহল।

ঘটনার বিবরণের মধ্যে লিখিত কথোপকথনগুলি পড়তে চমৎকার লাগে। রাষ্ট্রের কর্তব্য এই বইতে বর্ণিত তথ্যগুলির বিশ্বাসযোগ্যতা যাচাই করে আইনের শাসনের প্রতি দেশের নাগরিকদের আস্থা পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা। এবং আপন প্রহরী হিসেবে আইনের শাসন ও সাংবিধানিক কাঠামোকে ব্যবহার করা।

মুম্বাইয়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও হিংসাত্মক ঘটনাগুলি ঘটেছিল ১৯৯২ সালের ডিসেম্বর থেকে শুরু করে ১৯৯৩ সালের জানুয়ারি মাস পর্যন্ত। দাঙ্গা সংক্রান্ত তদন্ত কমিশনের সূত্রে অর্জিত যন্ত্রণাদায়ক অভিজ্ঞতা এবং এই ধরনের দাঙ্গার শিকারদের প্রতি চরম উদাসীনতা দেখে মনে হয়, এখনই এইসব দাঙ্গার কারণ অনুসন্ধানে আরও গুরুত্ব দিতে হবে। এই ঘটনাগুলির পুনরাবৃত্তি বন্ধ করার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে রাষ্ট্র ও সাংবিধানিক কর্মকর্তাদের।

এই বইয়ে বর্ণিত সমস্ত তথ্য সঠিক কিনা তাঁর মূল্যায়ন করা হয়তো সবার পক্ষে সম্ভব হবে না। কিন্তু সত্য উন্মোচনে লেখিকার সৎ সাহস ও প্রচেষ্ঠার প্রশংসা করতে সকলেই বাধ্য হবেন। ক্রমবর্ধমান অসততা, প্রতারণা ও রাজনীতিকীকরণের এই যুগে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার প্রয়োজনীয়তা ক্রমশই বেড়ে উঠেছে। এ ধরনের সাংবাদিকতায় লেখিকার সাহসী প্রচেষ্টাকে আমি সম্মান জানাই।

বি.এন.শ্রীকৃষ্ণ
মুম্বাই
১১ এপ্রিল, ২০১৬

মুখবন্ধ

ক্ষমতার বিরুদ্ধে মানুষের সংগ্রাম হচ্ছে
বিস্মৃতির বিরুদ্ধে স্মৃতির সংগ্রাম।
- *মিলান কুন্দেরা*

২০০৭ সালে তিন বছরের একটি বাচ্চা মেয়েকে ধর্ষণ করা নিয়ে একটি নিউজ চ্যানেলের জন্য করা রিপোর্টটি আমার জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে গিয়ে তরতাজা স্মৃতি হয়ে রয়ে গেছে। মিউনিসিপ্যাল হাসতাপালে ভর্তি ছিল মেয়েটি। মেয়েটির বাবা-মা একটা ট্রাফিক সিগন্যালে চোরাই বইপত্র বিক্রি করতেন। মাদকের ভয়াল নেশায় আচ্ছন্ন থাকার দরুন নিজেদের পাঁচ মেয়ের একজনের যন্ত্রণা ও দুর্দশা বুঝে ওঠার অবস্থায় ছিলেন না তাঁরা। মেয়েটির মুখে আর শরীরে ছিল প্রহারজনিত কালশিটের দাগ। ছোট্ট সেই নিষ্পাপ শরীরের সর্বত্র বর্বরতার চিহ্ন আঁকা। রিপোর্টের টেপটা দিল্লির স্টুডিওতে পাঠিয়ে দিয়ে বাড়ি ফিরতে রাত দুইটা বেজে গেল। মনে হল ধর্ষকটি ধরা পড়েছে কিনা তাঁর খোঁজ নেওয়ার জন্য ওই মাঝরাতেই তদন্তকারী অফিসারকে মেসেজ পাঠানো দরকার। মেয়েটির অবস্থা জানার জন্য পরের দিন হাসপাতালে গেলাম। নানা রকম সংক্রমণ ঘটেছে ছোট মেয়েটির শরীরে। ক্ষতস্থানে মাছি বসছে, ছোট্ট কবজিতে ছুঁচ ফোটানো রয়েছে। এবারও আশেপাশে তাঁর মা-বাবাকে চোখে পড়ল না। অফিসে পৌছে আমার বসকে বললাম এই বিষয়টায় যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া দরকার, যাতে অপরাধী ধরা পড়ে এবং বিচার হয়। আমার কথা শুনে একটু হেসে নিজের ল্যাপটপের দিকে তাকিয়ে রইলেন তিনি। বাহিরে মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে। আমার বস বললেন, এর বদলে আমি যেন মিলান সাবওয়ে আর বৃষ্টির দিকে মন দিই এবং বন্যার কিছু ভালো ছবি জোগাড় করি।

'আমার পক্ষে সম্ভব নয়', মিলান সাবওয়ের দিকে যাওয়ার পথে মাকে ফোন করে চেঁচিয়ে বললাম আমি। মুম্বাইয়ের বিখ্যাত বর্ষার মরশুমে

মিলান সাবওয়ে আলোকচিত্রীদের খুব প্রিয় হয়ে ওঠে। বসের সাথে কথার পর থেকে বুক ধরফর করছিল। সারাদিন কিছু খেতে পারলাম না। ঘটনার তিন দিন পর পারিবারিক চিকিৎসক আমাকে ঘুমের ওষুধ দিলেন। সম্পাদককে ফোন করে বললাম, আমার এক সপ্তাহ ছুটি চাই। ছোট্ট মেয়েটির ঘটনার আগে স্টুডেন্টস্ ইসলামিক মুভমেন্ট অফ ইন্ডিয়া (সিমি) সম্বন্ধে একটা অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের কাজ করছিলাম আমি। কাজটা করার সময় সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে নীতিবোধ নিয়ে সম্পাদকের সঙ্গে ব্যাপক তর্ক হয়েছিল। আমার কথাগুলো মন দিয়ে শুনে তিনি এমন কিছু বলেছিলেন, যা আমি আজও ভুলতে পারিনি।

একজন ভালো সাংবাদিকের একটি কৌশল আয়ত্ত করা দরকার সেটি হলো যে-বিষয় নিয়ে কাজ করা হচ্ছে তা থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা। একই সাথে তাকে বাস্তববাদী হতে হবে। আমার আজও দুঃখ হয় কারণ এই কৌশলগুলি আয়ত্ত করে উঠতে পারি নি। এই কৌশল প্রায়শই ব্যবহৃত হয় বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক শক্তিগুলির নির্দেশে কোন ঘটনাকে ধামাচাপা দেওয়ার অজুহাত হিসেবে।

প্রথম পরিচ্ছেদ

২০১০-এর গ্রীষ্মকালটা আমার জন্য সাংবাদিকতার নতুন সংজ্ঞা ঠিক করে দিল। নিজেকে একজন পরিশ্রমী, মধ্যমেধার সাংবাদিকই মনে করতাম আমি, যে তাঁর পুরোনো দিনের সাংবাদিক পিতার কাছ থেকে কিছু আদর্শ পেয়েছে। কিন্তু ওই সময়ে নিজেকে এমন এক সংকটের মুখোমুখি দেখতে পেলাম, প্রার্থনা করি তেমন সংকটে যেন কোনো সাংবাদিককে কখনো পড়তে না হয়।

অসুস্থতাজনিত দীর্ঘ ছুটির পর আবার *তেহেলকা*-র কাজে যোগ দিয়েছি ২০১০ সালের কোনো এক সময়ে। চিকিৎসকরা সঠিকভাবে আমার রোগনির্ণয় করতে ব্যর্থ হয়েছেন। গড়চিরোলির নকশালপন্থী কার্যকলাপের কেন্দ্রভূমিতে একটা রিপোর্টিংয়ের কাজ সেরে ফিরেছি। তাঁর ঠিক পর পরই ঘটল আমার জীবনের সবচেয়ে দুঃখজনক ও মর্মান্তিক একটি ঘটনা। হঠাৎ খুন হয়ে গেল আমার অত্যন্ত প্রিয় বন্ধু শাহিদ আজমি। সে ছিল ফৌজদারি আইনে দেশের সবথেকে বিচক্ষণ আইনজীবিদের একজন। আমার জীবনে আজমি'র ভূমিকা ছিল খুব গুরুত্বপূর্ণ। যেদিন সন্ধ্যায় আজমি খুন হয়, সেদিনই ওর সঙ্গে আমার দেখা করার কথা ছিল। সেইসব আদিবাসী ও বুদ্ধিজীবীদের মামলা নিয়ে আলোচনা করার কথা ছিল তাঁর সাথে, যাদের নকশাল নামে চিহ্নিত করে মিথ্যে মামলায় জেলে ঢুকিয়েছে সরকার।

আজমি'র সাথে সাক্ষাতের পরিকল্পনা থাকলেও ভাগ্য আমাকে তাঁর কাছ থেকে দূরে রাখলো। ভাইঝির সতেরোতম জন্মদিনে ওর আবদার রক্ষার্থে বাড়িতেই থেকে যেতে হল আমাকে। কয়েক ডজন মিসড কল এসেছে আমার ফোনে, মেসেজ পাঠিয়ে অনেকে জানতে চেয়েছে 'শাহিদের ব্যাপারে শেষ খবর' আমি জানি কিনা। আসলে এগুলো আমি পরে দেখেছিলাম। বন্ধুদের লাগাতার ফোনে এবং নিউজ চ্যানেলগুলোর ব্রেকিং নিউজ থেকে বাকিটুকু জানলাম। 'জাতীয়তা বিরোধী' ব্যক্তিদের মামলা হাতে নেওয়ায় শহিদকে তাঁর নিজ অফিসেই অজ্ঞাতপরিচয় আততায়ীরা

গুলি করে হত্যা করেছে। কিছুদিন আগেই ৭/১১-র মুম্বাই ট্রেন বিস্ফোরণের নিরপরাধ অভিযুক্তরা মুক্তি পেয়েছিল শাহিদের প্রশ্নের জোরেই। ওর মৃত্যুর পর ২৬/১১-র মুম্বাই হামলার দু'জন অভিযুক্তকে মুক্তি দেয় মুম্বাই কোর্ট। শাহিদের হত্যার পিছনে মূল হোতা কে তা আজও রহস্য রয়ে গেছে, অন্তত সাধারণ মানুষের কাছে।

শাহিদের মৃত্যুর তিনদিন পর নাগপুর যাচ্ছিলাম। যে জন্য যাচ্ছিলাম সেটা আমার সাংবাদিক জীবনের একটা সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হতে চলেছিল। কোন ক্ষতি মোকাবিলার অনেক উপায় আছে। কেউ একটানা বিলাপ করে চলতে পারে। কেউ-বা মুখ ফিরিয়ে কাজের মধ্যে ডুবে গিয়ে শান্তনা খোঁজে। আমি দ্বিতীয় পন্থাটাই বেছে নিয়েছিলাম। নাগপুরের কাজটা ছিল নকশালপন্থী হিসেবে অভিযুক্ত ছাত্রদের গ্রেপ্তার সংক্রান্ত, যাদের মধ্যে অধিকাংশই ছিল অনুন্নত শ্রেণির। তাদের বিরুদ্ধে প্রমাণগুলো ছিল নিতান্তই হাস্যকর। তাদের কাছে ভগৎ সিং এবং চন্দ্রশেখর আজাদের লেখাপত্র পাওয়া গেছে বলে দাবি করা হলো। কাজটা যেন আমার জন্যই নির্দিষ্ট ছিল, কেননা এই ধরনের মামলা লড়তে গিয়েই আমার বন্ধু শাহিদ জীবন দিয়েছে। এটা যেন অনেকটা তাঁর স্মৃতির প্রতি আমার শ্রদ্ধা নিবেদন।

কিন্তু ভাগ্যের লিখন না যায় খণ্ডন। এক দুর্বোধ্য অসুস্থতা নিয়ে আবার বাড়ি ফিরতে হল আমাকে।

বাড়ি পৌছে আমার চিকিৎসা চলতে থাকলো। আমার ব্যাকুল বাবা-মা চিকিৎসার কোন কমতি করলেন না। ব্রঙ্কোস্কোপি থেকে এমআরআই পর্যন্ত কিছুই বাদ যায়নি। একজন চিকিৎসক বলেন আমার যক্ষ্মা হয়েছে, আমার বাবা-মার উচিত আমাকে ধ্যানের অভ্যাস করানো। কিন্তু ভাগ্যক্রমে সাউথ বম্বে হাসপাতালে মুম্বাইয়ের খুব ভালো একজন চিকিৎসক আমাকে পরীক্ষা করেন। রিপোর্টগুলো দেখে ডা. চিটনিস কিছু প্রশ্ন করেন আমাকে। তারপর বড় করে নিঃশ্বাস নিয়ে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'কোন বিষয়টা সারাক্ষণ ভাবিয়ে চলেছে আপনাকে?' প্রশ্নটা শুনে যেন আচমকা ঘুম থেকে থেকে জেগে উঠলাম আমি। শান্তভাবে বললাম 'কিছুই না ডাক্তারসাহেব।

আসলে আমি বড্ড ক্লান্ত, খুব দুর্বল লাগছে, কোথায় যে কী হচ্ছে ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না।'

আমার কথা শুনে ডাক্তার একটু মুচকি হেসে বললেন, 'নিজেকে এইরকম দুঃখী-দুঃখী বানিয়ে রাখাটা আপনাকে কিন্তু ছাড়তে হবে। এইসব রক্ত পরীক্ষা-টরিক্ষা করিয়ে নিজের দুঃখ বাড়িয়ে লাভ নেই। আপনি একদম সুস্থ আছেন। সবটাই আপনার মনের ব্যাপার।' কাজে যোগ দিন, কাজই আপনার ঔষধ।

নিজের অবস্থা যাচাই করার চেষ্টা করতে গিয়ে কয়েকদিন আগে একটা শব্দ শিখেছিলাম 'হাইপোকনড্রিয়া'। আজ মনের অজান্তেই মুখ থেকে উচ্চারিত হলো 'হাইপোকনড্রিয়া?' শব্দটি শুনে ডা. চিটনিস শান্ত সুরে বললেন, 'না। আপনি স্রেফ অলস হয়ে পড়েছেন আর নিজের উপর অর্পিত দায়দায়িত্ব থেকে পালাতে চাইছেন।'

আমি যখন ডা. চিটনিসের উপদেশগুলো নিয়ে ভাবতে লাগলাম ঠিক সেই সময়ে আমার একাকীত্বের বন্ধু হিসাবে আমার মা এগিয়ে এলেন। মা আমার সবচেয়ে প্রিয় ও বিশ্বস্ত বন্ধু। আমার মা একজন সহজ সরল মানুষ। তিনি কোনোদিন আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষিতা হননি। আমার শ্রদ্ধেয় আব্বাই ছিলেন তাঁর গৃহশিক্ষক। আম্মা বলতেন, নিজের স্বপ্নগুলো আমাকে দিয়ে পূরণ করতে চান তিনি। তাঁর স্বপ্নের কথাগুলো শুনে আমি বেঁকে বসতাম। তবুও আম্মা হাল ছাড়তেন না, আশকারা দিতেন, শেষমেষ বাড়ির সবাই এসে জড়ো হতো। সেদিন আমাকে কফি দিয়ে আম্মা জিজ্ঞেস করলেন, 'তাহলে কি চাকরিটা ছেড়েই দিচ্ছিস?'

একটু কাঁধ ঝাঁকিয়ে কফির কাপটার দিকেই মন দিলাম। বরাবরের মতোই আম্মা আমার বিছানায় পাশে বসে 'ইনকিলাব' (বিশিষ্ট উর্দু সংবাদপত্র) পড়তে শুরু করলেন তিনি। মিনিট দশেক পড়ার পর সবে আমাকে কিছু বলতে যাবেন, মাঝপথেই তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বললাম, 'আম্মা, আমাকে আর কাগজের উপদেশ দিতে হবে না, কাগজ-না পড়েই আমি ভালো আছি।'

'আরে না। তুই কি সোহরাব উদ্দিনের ঘটনাটা পড়েছিস?' আম্মা বললেন। নামটা শুনেই আমার কৌতুহল বেড়ে গেল। এই সময়ের সবথেকে বিতর্কিত ব্যক্তিদের অন্যতম নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে দেখা হয় আমার সোহরাব উদ্দিনের সূত্র ধরেই। তাই তাকে আমি ভালো করেই জানি।

সাজানো বন্দুকযুদ্ধে পাতি জুয়াচোর সোহরাব উদ্দিনকে হত্যাকারী তিন পুলিশ কর্মকর্তা নিজেদেরই একজন ঘনিষ্ঠ সহকর্মী রজনীশ রাইয়ের হাতে গ্রেপ্তার হয়ে খবরের শিরোনামে উঠে এসেছিলেন। জেলে যেতে হয়েছিল ডি.জি. বানজারা আর রাজকুমার পান্ডিয়ানকে। তাঁরা ছিলেন মোদি সরকারের সবথেকে বিশ্বস্ত অফিসার। অত্যন্ত প্রতাপশালী এই অফিসাররা গ্রেপ্তার হওয়ার ফলে স্বাভাবিকভাবেই সারা দেশের নজর আকৃষ্ট হয়েছিল এই খবরের দিকে। কাগজে প্রতিদিন তাঁদের সাংবাদিক সম্মেলনের ছবি বেরোত। ২০০৪ সালে জিহাদিরা যখন 'হিন্দু হৃদয়সম্রাট' নরেন্দ্র মোদিকে হত্যা করতে যাচ্ছিল, তখন এই অফিসাররাই তাদের খুঁজে বের করে হত্যা করেছিলেন।

একটি টেলিভিশন নিউজ চ্যানেলে রাজনৈতিক প্রতিবেদক হিসেবে যোগদান করি ২০০৭ সালে। আমার প্রথম কাজটা ছিল গুজরাটের নির্বাচন সংক্রান্ত রিপোর্টিং করা। ২০০২ সালের গুজরাটের দাঙ্গা সমাজকে স্পষ্টতই বিভক্ত করে দিয়েছিল এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের কাছে নায়কে পরিণত হয়েছিল মোদি। ২০০৭ সালের নির্বাচনে নিরঙ্কুশ জয়লাভ করা তাঁর পক্ষে খুব কঠিন ছিল না। অধিকাংশ বিশ্লেষকই বলেছিলেন, গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আবার নিরঙ্কুশভাবে জিততে চলেছেন।

একজন ক্যামেরাম্যান সাথে নিয়ে তাঁর প্রথম নির্বাচনী সমাবেশে গেলাম। ঠিক মনে নেই, তবে সম্ভববত এই সমাবেশের উদ্যোক্তা ছিল গুজরাট চেম্বার অফ কমার্স। মঞ্চে বসে ছিলেন নরেন্দ্র মোদি, পাশে তাঁর ডান হাত অমিত শাহ। অন্য কিছু মন্ত্রীও ছিলেন। এর আগে অন্যান্য রাজনৈতিক সমাবেশ কভার করেছি আমি। প্রথমটায় এই সমাবেশকেও সেগুলোর থেকে আলাদা মনে হচ্ছিল না। তবে আমার দিল্লির প্রযোজকরা আগেই বলে দিয়েছিলেন, মোদির প্ররোচণামূলক বক্তৃতা দেওয়ার একটা ক্ষমতা

আছে। সেদিনও হতাশ করলেন না। মোদি শুরু করলেন, 'সোহরাব উদ্দিন, ওরা জিজ্ঞেস করছে সোহরাব উদ্দিনের মতো একজন সন্ত্রাসীর ব্যাপারে কী করেছি আমি।' জনতা উল্লাসধ্বনি করে উঠল। মহিলারা হাততালি দিলেন। সামনের সারিটা সর্বদাই মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত থাকত, কেননা মনে করা হত গুজরাটের মহিলাদের মধ্যে মোদি অত্যন্ত জনপ্রিয়। কলামিস্ট আকর প্যাটেল তো একটা কলামে এমনও লিখেছিলেন যে, গুজরাটি মহিলাদের কাছে মোদি হচ্ছেন সেক্স সিম্বল।

জনতার মধ্যে থেকে প্রত্যাশিত ভাবেই আওয়াজ উঠছিল, 'মেরে ফেলো, মেরে ফেলো।' আমার মনে হচ্ছিল যেন কোনো রোমান এ্যাম্ফিথিয়েটারে বসে আছি। 'মিঁয়া মোশারফ' আর 'দিল্লি কা সালতানাত'- এর মতো নানান কুৎসিত মন্তব্য সহকারে ভাষণ চলতে লাগল। ভাষণ শেষ করে মোদি যখন মঞ্চ থেকে নামলো তখন তাঁকে মালা পরালেন গুজরাটের চেম্বার অফ কমার্সের সদস্যরা। তাঁর চারপাশে মানুষের ভিড়, নিরাপত্তারক্ষীদের টপকে ঠেলেঠুলে এগোতে এগোতে আমার ক্যামেরাম্যানকে চিৎকার করে ডাকতে লাগলাম। আমার পিছনে আসার জন্য রীতিমতো ধস্তাধস্তি করতে হচ্ছিল তাকে।

ভীড় ঠেলে যখন মোদীর কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম 'মোদিজি, মোদিজি, একটা প্রশ্ন ছিল।' ভাগ্য ভালোই বলতে হবে, অনুরাগী ও সঙ্গীসাথীতে পরিবৃত মানুষটি ফিরে তাকালেন আমার দিকে, সম্ভবত কোন রাজনৈতিক প্রশ্নই প্রত্যাশা করেছিলেন। 'মোদিজি, গুজরাটে সাজানো বন্দুকযুদ্ধে সোহরাব উদ্দিনকে হত্যার অভিযোগে তিনজন অফিসারকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এর পরেও কি আপনি বলবেন, বক্তৃতায় আপনি যা-কিছু বললেন সবই সঠিক?' উত্তর পাওয়ার জন্য মাইকটা তাঁর দিকে এগিয়ে দিলাম। পুরো ১০ সেকেন্ড আমার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে উত্তর না দিয়ে ফিরে চলে গেলেন নরেন্দ্র মোদি। আমার দিকে ঘৃণার চোখে তাকালেন তাঁর মন্ত্রী। দেশের সবথেকে লোভনীয় পদ অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রীর আসনে বর্তমানে অধিষ্ঠিত মানুষটির সঙ্গে এটাই ছিল আমার প্রথম দেখা।

সোহরাব উদ্দিনের ঘটনা অবশ্যই প্রকাশ্যে আসা উচিত। আম্মার 'ইনকিলাব' পড়ার সূত্রে সুযোগটা এসে গেল আমার কাছে। বিবেকের তাড়নায় চলে গেলাম সেখানকার এক সাইবার ক্যাফেতে।

সোহরাব উদ্দিন সংক্রান্ত যাবতীয় সংবাদ থেকে জানা গেল, সিবিআই এ-ব্যাপারে তদন্ত করেছে এবং গুজরাটের একজন শীর্ষস্থানীয় আইপিএস অফিসার অভয় সুদাসামা গ্রেপ্তার হয়েছেন। সুদাসামাকে আমি চিনতাম। মাত্র একবছর আগেই গুজরাট বিস্ফোরণ মামলায় তাঁর এক প্রধান স্বাক্ষীর স্বীকারোক্তি আমি প্রকাশ করেছিলাম। তখন টেলিফোনে আমাকে হুমকি দিয়েছিলেন তিনি। গুজরাট বিস্ফোরণের তদন্তের মূল দায়িত্বে ছিলেন সুদাসামা, যে-বিস্ফোরণের সঙ্গে 'ইন্ডিয়ান মুজাহিদিন' নামক গ্রুপটি যুক্ত ছিল। রাজ্যের সবথেকে স্পষ্টবাদী ও মিডিয়া ঘনিষ্ঠ অফিসারদের অন্যতম একজন ছিলেন সুদাসামা। জনশ্রুতি আছে, তিনি গুজরাটের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের খুবই ঘনিষ্ঠ ছিলেন। তবে খ্যাতিমান হয়ে ওঠা অন্যদের থেকে আলাদা ছিলেন সুদাসামা। চোর-জোচ্চোর ও হাওলা সংক্রান্ত বিষয়ে কাজ করতেই বেশি স্বচ্ছন্দ বোধ করতেন তিনি। সোহরাব উদ্দিন তাঁর সহায়ক হয়ে উঠেছিল।

এই ঘটনা সম্পর্কে যাবতীয় প্রিন্টআউট আর নোট তৈরি করে এটি নিয়ে লেখালেখির প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে দিল্লিতে আমার দুই সম্পাদক সোমা চৌধুরি ও তরুণ তেজপালের কাছে একটা চিঠি পাঠালাম। আমি জানতাম, আমার স্ব-আরোপিত বিচ্ছিন্নতা ও অবসাদ থেকে বেরিয়ে আসার এটাই একমাত্র উপায়। দুই সম্পাদকই প্রচুর উৎসাহ দিলেন। আবার আহমেদাবাদ রওনা দিলাম আমি। এই আহমেদাবাদ যাত্রা আমার জীবন পাল্টে দিয়েছিল।

আহমেদাবাদ যাওয়ার প্রায় একমাসের মধ্যেই দুটো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার কথা মিডিয়ায় প্রকাশ আমি। কয়েকজন অফিসারের সাহায্যে কলরেকর্ড আর বিভিন্ন অভ্যন্তরীণ নোট ঘেঁটেই কাজটা করতে পেরেছিলাম। এই অফিসারদের নাম আমি উল্লেখ করব না। খুব সতর্কভাবে তাঁদের সাহায্য চাই, জানতাম তাঁরাই আমার একমাত্র আশা। কিন্তু গুজরাটের মতো

একটা রাজ্যে বিশ্বাস অর্জন করা আদৌ সহজ নয় কারন সেখানে কর্তব্যনিষ্ঠ অফিসারদের সরকারের রোষের শিকার হতে হয়। তাছাড়া এঁদের মধ্যে বেশিরভাগ সেই প্রথম দেখলেন আমাকে। আমি *তেহেলকার*'র সাংবাদিক বিষয়টা একারনে আরও জটিল ছিল। যেহেতু আমি *তেহেলকার*'র সাংবাদিক অর্থাৎ যে-কোন সময় আমার কাছে একটা স্টিং ক্যামেরা থাকতেই পারে।

গুজরাটে আমি যে বিষয়টার মুখোমুখি হয়েছিলাম, তা শুধু গুজরাটকেন্দ্রিক বিষয় ছিল না। সৎ পুলিশ অফিসারদের নামে মামলা রুজু করে হেনস্থা করাটা উত্তরপ্রদেশ আর মণিপুরেও একেবারে পানিভাত হয়ে উঠেছে- এই দুটি রাজ্য সম্বন্ধে বিস্তৃত রিপোর্টিং করেছি আমি। এটাও বুঝেছিলাম যে এই হেনস্থা করার ব্যাপারটাই আমার রক্ষাকর্তা হয়ে উঠবে। সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য যে অফিসার জানিয়েছেন, দেখা গেল তিনি আসলে এমন কোনো অফিসারের সহপাঠী ছিলেন, যাঁর সম্বন্ধে কিছু রিপোর্ট করেছি আমি। এভাবেই বরফ গললো। মানবাধিকার কর্মী ও তথ্য-জোগানো অফিসারদের সহায়তায় বছরের সবথেকে চাঞ্চল্যকর একটা ঘটনা ফাঁস করতে সক্ষম হলাম আমি। এটা ছিল সংঘর্ষ চলাকালীন তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে উচ্চপদস্থ অফিসারদের ফোনে কথাবার্তার কলরেকর্ড ও অভ্যন্তরীণ 'অফিসিয়াল সিক্রেটস্ অ্যাক্ট' সংক্রান্ত একটা অত্যন্ত নিন্দাজনক নোট। মন্ত্রীর কার্যকলাপের দিকে নজর রেখেছিল সিআইডি। ফাঁস করা সেই নোটে বলা হয়েছিল, সংঘর্ষ হচ্ছে নিরপরাধ মানুষদের হত্যা করার ও তাদের সন্ত্রাসবাদী হিসেবে চিহ্নিত করার মাধ্যম।

এই চাঞ্চল্যকর রিপোর্টটি রাজনৈতিক মহলে আলোড়ন তুলল। সিবিআই থেকে *তেহেলকা*'র দপ্তরে বারবার ফোন করে বলা হলো কলরেকর্ডগুলো তাদের হাতে তুলে দেওয়া হোক। পরে সুপ্রিম কোর্টের সামনে রেকর্ডগুলো পেশ করা হয়েছিল। আহমেদাবাদের হোটেল এ্যাম্বাসাডরেই তখনও থাকছিলাম আমি। হোটেলটা ততদিনে আমার দ্বিতীয় বাড়ি হয়ে উঠেছিল। মূলত মুসলিম অধ্যুষিত এলাকা খানপুরে অবস্থিত এই

হোটেলটা আমার পক্ষে যথেষ্ঠ সুবিধাজনক ছিল। পরে জেনেছিলাম ওখান থেকে মাত্র কয়েকটা ব্লক পরেই ছিল রাজ্য বিজেপি-র সদর দপ্তর। রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ার পর হঠাৎই সবার নজর এসে পড়ল আমার ওপর। বিজেপি নেতারা বলতে লাগলেন, আইয়ূব নামে একজন অল্পবয়সী ছোকরাই এইসব তথ্য ফাঁস করেছে। যে-কোন কারণেই হোক তাঁদের মাথায় আসেনি যে, অনুসন্ধানী সাংবাদিকটি কোনো মেয়েও হতে পারে। এতে আমার আরো সুবিধা হলো, এর ফলে নির্বিঘ্নে কাজ করতে পারছিলাম। তবে এই সুবিধাটা বেশিদিন রইল না। রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ার কয়েকদিন পরে অজানা নম্বর থেকে একটা মেসেজ এল আমার ফোনে, 'আমরা জানি তুমি কোথায় আছ।'

এবার জীবন সত্যিই পাল্টে গেল। সেইদিন থেকে শুরু করে তিনদিন পরপর বাসস্থান পাল্টাতে লাগলাম; আহমেদাবাদের আইআইএম ক্যাম্পাস থেকে শুরু করে বিভিন্ন গেস্টহাউস, হোস্টেল আর জিমখানায়। পলাতকের মতো জীবন। এই সময় মোবাইল ফোনের বদলে ল্যান্ডলাইন ব্যবহার করতে শুরু করি। অবশেষে সিবিআই-কে যা কিছু তথ্যপ্রমাণ জোগানো সম্ভব সবটুকু দিয়ে এবং আমার ফলো-আপ রিপোর্ট লেখা শেষ করে মুম্বাইতে এসে পৌঁছোলাম। ঠিক করলাম জীবনযাপনকে একটা রুটিনের মধ্যে আনতে হবে।

কিন্তু ভাগ্য আমার জন্য অন্য কিছু নির্ধারন করে রেখেছিল। আমার রিপোর্টটি প্রকাশিত হওয়ার কয়েক সপ্তাহের মধ্যে অমিত শাহকে গ্রেপ্তার করল সিবিআই। স্বাধীন ভারতে এই প্রথম কোন কর্মরত স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী গ্রেপ্তার হলেন। চারদিকে আলোড়ন পড়ে গেল। অধিকাংশ জাতীয় সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিরাই গান্ধীনগরে সিবিআই সদরদপ্তরের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে শুরু করলেন। এই চাঞ্চল্যকর গ্রেপ্তারির পরবর্তী ঘটনাস্রোতের রিপোর্ট করার জন্য গুজরাটে ফিরতে হল আমাকে।

অনেক পুলিশ অফিসার বৈষম্যমূলক আচরণের শিকার হয়েছিলেন অমিত শাহের আমলে, শাহের গ্রেপ্তারি তাঁদের যেন নতুন জীবন দিল। এই সময় বিভিন্ন অফিসার আমাকে কৌশলে জানাতেন যে তাঁরা আমার সঙ্গে কথা

বলতে চান। আগে যাঁরা সাংবাদিকদের এড়িয়ে চলতেন, এখন যেন তাঁরা কথা বলার শক্তি অর্জন করেছেন। অধিকাংশ কথোপকথনই ছিল ব্যক্তিগত, অফ দ্য রেকর্ড, কিন্তু সেটুকু থেকেই বোঝা যাচ্ছিল সংঘর্ষের ঘটনাগুলো হিমশৈলের চূড়ামাত্র। গুজরাটের বিভিন্ন ঘটনার ফাইলে আরও ভয়াবহ কিছু লুকিয়ে আছে। আমরা কেউই সত্যের কাছাকাছি পৌঁছাতে পারিনি। বোঝা যাচ্ছিল বিগত এক দশকে বিচার ব্যবস্থাকে প্রায় ধ্বংস করে ফেলা হয়েছে। মানুষের জীবনের নিরাপত্তার জিম্মাদাররা বিক্রি হয়ে গেছেন। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, সাজানো বন্দুকযুদ্ধ থেকে শুরু করে রাজনৈতিক হত্যা পর্যন্ত বহু বিষয়ে বহু বেয়াড়া সত্য সামনে আসার জন্য অপেক্ষা করছিল। কিন্তু এগুলোকে প্রমান করার উপায় কি?

সাংবাদিকতার প্রথম কথাই হল প্রমাণ কিন্তু আমার হাতে শুধু কথোপকথন আর কিছু ঘটনার বিবরণ, অফ দ্য রেকর্ড স্বীকারোক্তি ছাড়া কোনো প্রমাণই ছিল না। এসব প্রমাণ করব কিভাবে? তখনই আমার জীবনকে পেশাগত ও ব্যক্তিগতভাবে পাল্টে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিই। রানা আইয়ুবের বদলে দেখা দেবে মৈথিলী ত্যাগী নামে কানপুরের এক কায়স্থ মেয়েকে যে 'আমেরিকান ফিল্ম ইনস্টিটিউট কনজারভেটরি'র ছাত্রী। মৈথিলী দেশে ফিরে এসেছে গুজরাটের উন্নয়ন এবং সারা পৃথিবীতে নরেন্দ্র মোদীর জনপ্রিয়তা বিষয়ক সিনেমা বানানোর জন্য।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বিস্তারিত জানিয়ে সিনিয়রদের কাছে মেইল পাঠালাম। তাঁরা আমাকে উৎসাহ দিয়ে উত্তর দিলেন আরও গভীরে যাওয়ার। ভাবনা চিন্তা শুরু করার পক্ষে এই উৎসাহটুকুই যথেষ্ট ছিল। গুজরাটে আমার প্রায় মাস তিনেক কেটে গেছে। তথ্য দিয়ে সাহায্য করতে যাঁরা ইচ্ছুক তাঁদের সঙ্গে যে-পরিস্থিতিতে দেখা হয়েছে, তা থেকে বুঝতে পেরেছি সামনের পথ রীতিমতো কঠিন। ক্ষমতায় থাকা যে-সব ব্যক্তি সত্য গোপন করে রাখতে চান, তাঁদের কাছ থেকে সত্যটা আদায় করা অনেক কঠিন হবে। আমার সহকর্মী আশিস খেতান একটা রোমহর্ষক কাহিনী উদঘাটন করেছিলেন বাবু বজরঙ্গী এবং স্থানীয় অন্যান্য বিজেপি ও বিশ্ব হিন্দু পরিষদ নেতাদের ওপর স্টিং অপারেশন চালিয়ে। সেখানে এইসব নেতারা ২০০২ সালের দাঙ্গার হাড়-হিম-করা বিবরণ শুনিয়েছিলেন। কিন্তু আমি সেইসব দাঙ্গাবাজদের নিয়ে কাজ করছি না যাদের একটু উস্‌কে দিলেই গড়গড় করে নিজেদের বীরত্বের গান গাইতে শুরু করবে। আমার কাজ ছিল দক্ষ আইপিএস অফিসারদের সাথে, যাঁদের মধ্যে অনেকেই 'র' এবং 'আই এন্ড বি'তেও সাফল্যের সঙ্গে কাজ করেছেন।

এই অফিসাররা একেবারে মোটা চামড়ার কূটনীতিবিদ। এদের দিয়ে কথা বলানোর জন্য দরকার ক্ষমতা ও কর্তৃত্বসম্পন্ন একজন দক্ষ ও সুকৌশলী তদন্তকারী। এগুলোর মধ্যে কোনো গুণটাই আমার নেই। কিন্তু এটার পরিকল্পনা ও কাজ এই দু'টো আমাকে একাই করতে হবে। জানতাম অফিস থেকে কোনো জুনিয়রকে নিতে পারব না, কেননা সেটা বাড়তি ঝুঁকি হয়ে যাবে। আমাকে পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছিল– সম্পাদকরা আমার কাজের ওপর নজর রাখবেন, কিন্তু বাকি সবকিছুর দায়িত্ব আমার একার। কোনো লেখা পাঠালেই সম্পাদক সোমা আর তরুণ উৎসাহব্যঞ্জক উত্তর দিত, যেমন, 'অসাধারণ, চালিয়ে যাও' বা 'তাক-লাগানো উদঘাটন'। এগুলো আমাকে আরও এগিয়ে যেতে উৎসাহ যোগাত ঠিকই, কিন্তু বাস্তব সত্যটি ছিল– রণক্ষেত্রে আমি সম্পূর্ণ একা। নিজের

খেয়ালও রাখতে হবে, আবার এই অনুসন্ধান থেকে যেন সৎ, সত্যভিত্তিক ফলাফল বেরিয়ে আসে সেটাও নিশ্চিত করতে হবে।

অনেকেই সত্যটি জানতেন কিন্তু তাঁরা স্থির করেছিলেন কখনো সেটি প্রকাশ করবেন না। এমনভাবে জীবনটি কাটিয়ে দিবেন যেন ২০০২ সালের ঠান্ডা মাথায় ঘটানো রাজনৈতিক রক্তস্নানের ঘটনাটি কখনোই তাঁদের জীবনের সাথে জড়িত ছিল না। *তেহেলকা*-র মতো একটি অনুসন্ধানী প্রতিষ্ঠানের সাংবাদিক হিসেবে আমি জানতাম, সাহায্য পাওয়ার প্রতিটি দরজাই আমার জন্য বন্ধ। আমার সামনে একটিই পথ খোলা ছিল, যে পথটি সত্যসন্ধানী যেকোন সাংবাদিকের শেষ অবলম্বন; সেটি হলো ছদ্মপরিচয়ে কাজ করা। আমার বয়স ২৬ বছর, আমি একজন মেয়ে, তা-ও আবার মুসলিম মেয়ে। এর আগে কখনো নিজের পরিচয় নিয়ে মাথা ঘামাইনি, কিন্তু ধর্মীয় ভিত্তিতে মেরুকরণ করা একটি রাজ্যে কাজ করতে গেলে এগুলো নিয়ে ঠান্ডা মাথায় ভাবতেই হবে। আমার বাড়ির লোকেদের ব্যাপারটি জানাতে হবে, জানাতে হবে আমি কী হতে চলেছি। কারও সাহায্য ছাড়া কি কাজটি নিখুঁতভাবে করতে পারব?

একসময় একটি সুপরিচিত গণযোগাযোগ কোর্স করেছিলাম। সেটি এখন কাজে লাগল। আমার সহপাঠীদের মধ্যে এমন অনেক উচ্চাকাঙ্ক্ষী অভিনেতা ছিল যারা চলচ্চিত্র জগতে নিজেদের একটা জায়গা তৈরী করে নিতে পেরেছিল। অভিনেত্রী রিচা চাড্ডা আমার সহপাঠী ছিল, এখন সে প্রতিষ্ঠিত নায়িকা। সম্প্রতি একটি সাক্ষাৎকারে রিচা বলেছিল সে একটি ছবির জন্য আমার সাংবাদিকতার জীবন ও অভিজ্ঞতা জানতে চায়। সেই ছবিতে রিপোর্টারের ভূমিকায় অভিনয় করতে হবে তাকে। যে অভিনেতা বন্ধুটিকে সবথেকে ঘনিষ্ঠ মনে করতাম তাকে 'অনেকদিন খোঁজখবর নেই' জাতীয় একটা ফোন করলাম। এই বন্ধুটির সাহায্যে রিচার মেকআপ ম্যানের সঙ্গে একটা এ্যাপয়েন্টমেন্ট করা গেল। পরের দিন মুম্বাই শহরতলির একটা স্টুডিওতে বসে চা খেতে-খেতে মানানসই পরচুলা পরার কলাকৌশল শিখছিলাম। প্রবীণ মেক-আপ আর্টিস্টটি তাঁর সংগ্রহের কয়েকটা পরচুলা দিয়ে সাহায্য করেন আমাকে। পরচুলা পরলে আমাকে

কিছুটা যেন কৃত্রিম আর বেমানান লাগছিল। তাই পরচুলার ব্যাপারটা খুব সুবিধের হল না। তখন মনে হল নিজের পরিচিতিটাও পাল্টে ফেললে ভালো হয়। আমার প্রাক্তন সহপাঠীদের একটা গ্রুপের সদস্য ছিলাম আমি। হয়তো ভাগ্যক্রমেই সেই গ্রুপের একজন সহকর্মীর একটা ই-মেইল পেলাম যে লস অ্যাঞ্জেলেসের বিখ্যাত আমেরিকান ফিল্ম ইনস্টিটিউট কনজারভেটরিতে যোগ দিয়েছিল। এ যেন এক 'সব পেয়েছি'র মুহূর্ত। হ্যাঁ, এটিই হবে আমার পরিচয়। চলচ্চিত্র বানানোর জন্য আমেরিকা থেকে গুজরাটে আসা একজন চলচ্চিত্রকার। ভাবনাটি খুবই উচ্চাকাঙ্ক্ষী, তবে সেটি কাজে লাগার সম্ভাবনা যথেষ্টই ছিল।

কয়েক দিন পড়াশোনা নিয়ে ব্যস্ত থাকলাম কারন আমার জানার প্রয়োজন এই কনজারভেটরির কাজকর্ম, প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের বিবরণ এবং গুজরাট নিয়ে কী কী চলচ্চিত্র বানানো হয়েছে সে সম্পর্কে। সিদ্ধান্ত নিলাম সেগুলোর বিষয়বস্তুর দুয়ার উন্মুক্তই থাক, চিত্রনাট্যহীন এই কাহিনিতে যে-সব চরিত্র আসবে, তাদের কাছ থেকে কেমন আচরণ চাই তাঁর ওপরেই নির্ভর করবে চলচ্চিত্রের বিষয়বস্তু। আমাকে একটা নাম নিতে হবে। নামটি হবে সুন্দর, রক্ষণশীল অথচ ব্যঞ্জনাময়।

আমি ছিলাম সিনেমার পোকা। আর এটিই আমাকে আমার কাজে প্রচুর সাহায্য করেছিল। হিন্দি সিনেমা দেখতে খুব ভালোবাসতাম। সেইসময় রাজকুমার সন্তোষীর 'লজ্জা' সিনেমাটার কথা মনে পড়ল। দিল্লি থেকে মুম্বাই যাওয়ার সময় বিমানে ছবিটা দেখেছিলাম। বলিষ্ঠ নারী চরিত্রগুলোই ছিল ছবিটার প্রধান আকর্ষণ, সেইসঙ্গে মাধুরী দীক্ষিত ও মণীষা কৈরালা-সহ মুখ্য চরিত্রগুলির প্রাণবন্ত অভিনয়। ছবিতে মণীষী কৈরালা 'মৈথিলী' নামক চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। 'মৈথিলী' ভারতীয় নারীদের জীবন এবং লিঙ্গভিত্তিক অত্যাচারের স্বরূপ উন্মোচন করছে। তাছাড়া রামচন্দ্রের স্ত্রী সীতারও অন্য নাম ছিল মৈথিলী। নামটার ব্যঞ্জনা আমাকে আকৃষ্ট করেছিল। নিজের জন্য যখন অন্য একটা নাম খুঁজছিলাম, খুব সাধারণত অথচ কোনো বিশেষ পদবীর উন্নাসিকতাহীন একটা নাম, এমন নাম যা ব্রাহ্মণও নয়, দলিতও নয়। তখনই 'মৈথিলী ত্যাগী' জন্ম নিল। ভিজিটিং

কার্ডে লেখা রইলঃ মৈথিলী ত্যাগী, ইনডিপেন্ডেন্ট ফিল্মমেকার, আমেরিকান ফিল্ম ইনস্টিটিউট কনজারভেটরি।

কিন্তু আবার গুজরাট যাওয়ার আগে আমার একজন দক্ষ সহকারীর প্রয়োজন ছিল। খুব দ্রুতই তাঁর দেখাও পেলাম, যে আমার জীবনে এক গভীর ছাপ রেখে যাবে। মাইক (ছদ্ম নাম) ছিল ফ্রান্সে বিজ্ঞানের ছাত্র। একটা ছাত্র-বিনিময় কর্মসূচির অংশ হিসেবে ভারতে এসেছিল সে। ভারতীয় সাংবাদিকদের সঙ্গে ভারতে কাজ করতে খুবই আগ্রহী ছিল মাইক। ঠিক কী বিষয়ে অনুসন্ধান করতে চাইছি তাঁর খুঁটিনাটি না-জানিয়ে একটা মেইল করলাম ওকে। তবে সব না-জানালেও চেষ্টা করেছিলাম যতটা সম্ভব সৎ থাকার।

মাইককে জানালাম আমি একজন অ-ভারতীয় সহকারী চাইছি, যে একটা ফিল্মে আমার সঙ্গে কাজ করার ভান করবে। আরও জানালাম, এটা একটা অনেক বড় চাঞ্চল্যকর অনুসন্ধানের অংশ। খুঁটিনাটি সবকিছু যে ওকে জানানো যাবে না, সেটাও বলে দিলাম। আমার পরিচিতিকে বেশি প্রামাণ্য করে তোলার জন্য একজন 'ফিরিঙ্গি, গোরা' মুখ হিসেবে কাজ করতে হবে তাকে।

আহমেদাবাদে পৌঁছলাম ভিজিটিং কার্ড, ছাই-ধূসর চশমা, হেয়ার স্ট্রেটনার, গলা বাঁধার কয়েকটা রংচঙে ব্যান্ডানা আর রেকর্ডিং করার কিছু যন্ত্রপাতি নিয়ে । মাইক আসবে দু'দিন পরে। মৈথিলী ত্যাগীর নামে ঝটপট একটা সিম কার্ড জোগাড় করে নিলাম। আহমেদাবাদে আমার কথিত 'অভিভাবক পরিবার'- এর দেওয়া নথিপত্রের সাহায্যে এত সহজে সিম কার্ডটা পেয়ে গেলাম দেখে বেশ অবাকই লাগল। অনুসন্ধান দীর্ঘ সময় ধরে চলবে। কোনো দামি হোটেলে থাকা এবং বিলাসিতা করা আমার বা আমার সংস্থার পক্ষে সম্ভব নয়। তাছাড়া আমি এমন একজন উঠতি চলচ্চিত্রকারের ভূমিকায় অভিনয় করছি যার আর্থিক সামর্থ্য সীমিত। এরকম একজন মানুষের থাকার বন্দোবস্ত একমাত্র স্থানীয় কেউই করতে পারে। এবার সাহায্য পেলাম এক শিল্পী বন্ধুর কাছ থেকে। আমাদেবাদের সাহিত্য ও সংস্কৃতি মহলে যার ভালো যোগাযোগ আছে।

বেশি প্রশ্ন করে আমাকে অস্বস্তিতে ফেলেনি সে। আমি একজন সাংবাদিক, যার অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের জেরে গুজরাটের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে জেলে যেতে হয়েছিল-এটুকুই তাঁর কাছে যথেষ্ট ছিল। নিজের প্রভাব খাটিয়ে সে আমার থাকার ব্যবস্থা করে দিল 'নেহরু ফাউন্ডেশন' নামক একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে।

শিল্পী বন্ধুটি ফাউন্ডেশনের হোস্টেলের তত্ত্বাবধায়কের কাছে একজন চলচ্চিত্রকার হিসেবে আমার পরিচয় দিল। তত্ত্বাবধায়ক আমার দিকে প্রায় তাকালেনই না, হাত-পা নেড়ে বন্ধুটির সঙ্গেই কথা বলতে লাগলেন। এটাচ বাথরুম-সহ ২৫০ বর্গফুটের একটা ঘর জুটল। ভাড়া প্রতিদিন ২৫০ টাকা। পরে হোস্টেলের অন্য বাসিন্দারা আমার অনুসন্ধানের কাজে অনেক সাহায্য করেছিল। এরা ছিল জার্মানি, গ্রিনল্যান্ড আর লন্ডনসহ ইউরোপের বিভিন্ন দেশের শিক্ষার্থী।

হোস্টেলে উঠেই প্রথম পরিচয় হল ম্যানেজার মানিক ভাই (ছদ্ম নাম)-এর সঙ্গে। আমার বন্ধুটি তাঁর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন, 'গুজরাট নিয়ে একটা সিনেমা বানানোর জন্য ম্যাডাম এখানে এসেছেন।' মানিকভাই বললেন, 'বাহ! দারুন। সিনেমায় আমাদের শহর আর মুখ্যমন্ত্রীর সম্পর্কে ভালো ভালো কথা বলুন। আমাদের এই আহমেদাবাদ শহরটা কিন্তু বেশ চমৎকার।' সেই সঙ্গেই জানালেন শহরটা আমাকে ঘুরিয়ে দেখাবেন। আমার ঘরে একটা একশয্যার খাট, একটা লেখার টেবিল আর একটা বুক স্ট্যান্ড রাখার পর বেশি জায়গা ছিল না। কিন্তু হোস্টেলের অবস্থানটা জায়গার অভাব পূরণ করে দিল। গুজরাটের সবথেকে অভিজাত এবং মধ্যবর্তী এলাকায় অবস্থিত এই হোস্টেলটা পরবর্তী ছ'মাসে আমার বাড়ির বাইরে আরেকটা বাড়ি হয়ে উঠেছিল।

পরের দিন সকালে মাইক এসে পৌছাল। মাত্র ১৯ বছর বয়সী উজ্জ্বল, লম্বা ফরাসি তরুণ, একমাথা এলোমেলো চুল। আমার বন্ধুর বাড়িতে তাঁর সঙ্গে দেখা করলাম। আমার সঙ্গে হোস্টেলে যাওয়ার আগে অল্পকথায় বুঝিয়ে দিলাম, তাকে ঠিক কী করতে হবে।

মানিক ভাই আমার ঘরের লাগোয়া একটা ঘর পরবর্তী এক মাসের জন্য মাইককে ছেড়ে দিলেন। এর পিছনে মাইকের তাঁকে 'কেমোছো' বলার অবশ্যই একটা ভূমিকা ছিল। মাইকের শেখার ইচ্ছে ছিল। বিভিন্ন সংস্কৃতিকে জানতে-বুঝতে চাইত, তবে তাঁর সবথেকে প্রিয় জিনিস ছিল খাবার। সেদিন রাতে আমাদের প্রথম যৌথ নৈশভোজনে ছিল আহমেদাবাদের 'পাকওয়ান' নামে পরিচিত জনপ্রিয় থালি। সে রাতে অন্তত দু'ডজন পুরি আর ছ'বাটি হালুয়া খেয়ে ফেলেছিল মাইক, যা দেখে হাঁ হয়ে গিয়েছিলাম আমি।

হোস্টেলের সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে মাইক জিজ্ঞেস করল, 'যখন শুধু আমরা দু'জনই থাকব, তখন কি আমি তোমাকে রানা বলে ডাকতে পারি?'

আমি মাইকের প্রশ্নের জবাবে বললাম, 'না। তুমি এদেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার আগ পর্যন্ত তোমার কাছে আমি মৈথিলী হয়েই থাকব।' মাইক কথা রেখেছিল। প্যারিস রওনা হওয়ার আগে আমাকে পাঠানো বিদায়ী কার্ডে সে লিখেছিল, 'প্রিয় মৈথিলী, নিজের খেয়াল রেখো-মাইক'।

হোস্টেলে ওঠার পর প্রথম কয়েকটা দিন নিজেদের নতুন জীবন গুছিয়ে নিতেই কেটে গেল। নিজের ঘরে ফরাসি-হিন্দি অভিধান হাতে নিয়ে বসে আমাকে নানান প্রশ্ন করত মাইক, সেইসঙ্গেই মার্ক টুলি-র লেখা একটা বই পড়া চলত। বয়সের অনুপাতে যথেষ্ট পড়াশোনা ছিল মাইকের। নিজস্ব মতামত ছিল, আর ছিল তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণাত্মক মন। যে-কোন বিষয় চট করে ধরে নিতে পারত। ফাউন্ডেশনে একটা ক্যান্টিন ছিল, সেখানে ২৫ টাকায় দুপুরের খাবার পাওয়া যেত। ক্যান্টিনের সামনে একটা ঘোড়ানো সিঁড়ি আর সংস্থার চত্বর, তাঁর ওপারে একটা মনোরম বনভূমি। রোজ বিকেলে মাইক আর আমি ল্যাপটপ নিয়ে চত্বরে বসে খেতে খেতে কাজ করতাম। মাইক বলত, 'তাহলে মৈথিলী, পরিকল্পনাটা কী? কার সঙ্গে দেখা করব আমরা?' প্রতিবার একই উত্তর দিতাম, 'সময় হলেই জানতে পারবে।'

মাইক আর আমি সন্ধ্যের সময় ক্যামেরা নিয়ে পুরোনো শহরে ছবি তুলতে বের হতাম। দু'জনেরই ফটোগ্রাফিতে আগ্রহ ছিল এবং দু'জনেরই ডিজিটাল এসএলআর ক্যামেরা ছিল। অবশ্য এর সঙ্গে আমাদের ফটোগ্রাফি ভালোবাসার কোনো সম্পর্ক ছিল না। আসলে এটা ছিল আমাদের নিজেদের কাছে এবং যদি কেউ আমাদের ওপর নজর রেখে থাকে তাঁর কাছে নিজেদের কাজের প্রামাণ্যতা প্রতিষ্ঠা করার একটা চেষ্টা। আমরা যদি উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের কাছাকাছি পৌঁছুতে চাই, তাহলে অবশ্যই আমাদের কাজকর্মের গতিবিধি, বিশেষত যেখানে আমরা থাকছি সেই জায়গাও যাচাই করা হবে। আহমেদাবাদে আমাদের একটা সামাজিক পরিমণ্ডল দরকার ছিল, যা আমাদের বানোনো পরিচিতির স্বাক্ষ্য দেবে।

'আমদাবাদ নি গুফা' নামক মিউজিয়ামটি আমাদের অনেক সাহায্য করেছিল যা প্রখ্যাত শিল্পী এম.এফ. হুসেন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। মিউজিয়ামটির পাশে একটা বিশাল পার্ক আর একটা ক্যাফে। সেখানে সারাক্ষণ তরুণদের, বিশেষত শিল্পী আর ফটোগ্রাফারদের ভিড় লেগেই আছে। কেউ গিটার বাজাচ্ছে, কেউ-বা নিজেদের কাজ সম্বন্ধে প্রচার করছে। তাছাড়া হবু চিত্রপরিচালক, আলোকচিত্রী বা থিয়েটারের অভিনেতারাও থাকত। এখানে সন্ধ্যে কাটানোর সময় মৈথিলী হিসেবে নিজের জীবনটাকে চুটিয়ে উপভোগ করতাম আমি, মাইক-ও খুব উপভোগ করত।

মাইক পুরাতন গুজরাটের লাল দরওয়াজা স্থানটা খুব পছন্দ করত। প্রতি বৃহস্পতিবার সেখানে একটা খোলা বাজার বসত। সেখানে ছিল ঘুড়িনির্মাতা ও কুমাররা। ছবি তুলে সন্ধ্যের সময় ফিরে এসে মাইক তাঁর একান্ত প্রিয় প্রশ্নটা করত, 'আজ রাতে কোথায় খাব আমরা?' ও খেতে খুব ভালোবাসত। আর তাঁর জন্য গুজরাট হচ্ছে একবারে আদর্শ জায়গা।

অফিসারদের সঙ্গে যোগাযোগ করা খুবই দরকার ছিল আমার। এরই মধ্যে জনৈক অ্যাকটিভিস্ট বন্ধুর পাঠানো ই-মেইলে সাহায্য এসে পৌছাল। তালিকায় প্রথম নাম ছিল জি.এল. সিংঘল-এর, যিনি তখন গুজরাটের

এন্টি টেররিস্ট স্কোয়াডের প্রধান ছিলেন। সে সময় সাজানো সংঘর্ষে ইশরাত জাহানের মৃত্যুর ঘটনায় তাঁর ভূমিকা নিয়ে তদন্ত চলছিল। আমার অফিসার বন্ধুবান্ধব ও অন্য সাংবাদিকদের থেকে জেনেছিলাম, তিনি নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখছেন। মাত্র কয়েকজন বন্ধু আছে এবং তিনি সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কোনোরকম সম্পর্ক রাখতে চান না। শুনেছিলাম প্রায় সবাইকেই তিনি সন্দেহ করেন। তাহলে কীভাবে পৌঁছানো যাবে তাঁর কাছে?

গুজরাট ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির দু'জন জনপ্রিয় অভিনেতা নরেশ ও হিতু কানোরিয়া সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য দেওয়া ছিল বন্ধুর ই-মেইলে। বস্তুত নরেশ কনোরিয়া ছিলেন গুজরাটি সিনেমার অমিতাভ বচ্চন। হিতু তাঁর পুত্র, দক্ষিণ মুম্বাইতে পড়াশোনা করেছেন এবং ঠিক করেছেন হিন্দি সিনেমার বিরতির অপেক্ষায় বসে না থেকে বাবার দেখানো পথে পা বাড়ানোই বুদ্ধিমানের কাজ।

ই-মেইল থেকে জেনেছিলাম কানোরিয়ারা দলিত শ্রেণির মানুষ এবং অনেক বড় বড় অফিসারের সঙ্গে তাঁদের ভালো যোগাযোগ আছে। সিংঘলের সঙ্গেও যোগাযোগ আছে তাঁদের এবং সিংঘল নিজেও একজন দলিত। উতলা হয়ে নরেশ কানোরিয়াকে ফোন করলাম। তিনি আমাকে পরেরদিন সকালে আহমেদাবাদের জিমখানায় তাঁর সঙ্গে দেখা করতে বললেন। দেখা হওয়ার পর তাঁর মধ্যে কোন অভিব্যাক্তি দেখলাম না। ভালোভাবে মকশো করার বিশেষ উচ্চারণভঙ্গির ইংরেজিতে তাঁর সঙ্গে কথা বলার সময় সম্পূর্ণ নির্বিকার রইলেন তিনি। আয়নার দিকে তাকালেন, চিরুনি দিয়ে চুলটা একটু ঠিক করে নিয়ে উদাসীন ভঙ্গিতে বললেন, 'বোন, একটু ধীরে সুস্থে হিন্দিতে বল, তুমি খুব দ্রুত কথা বল।'

আমার প্রস্তুতিতে যে গলদ আছে সেটা উপলব্ধি করলাম। পরের এক ঘন্টা ধরে তাঁকে আমার ফিল্মের বিষয়বস্তু নিয়ে বোঝালাম। বললাম, গুজরাটের যেসব বিষয় তেমন পরিচিত নয়, সেগুলোই আমার ফিল্মে দেখাতে চাই। যেমন - গুজরাটের চলচিত্রশিল্প, দলিত শ্রেণির মানুষরা কীভাবে গুজরাটে উন্নতি করেছে। এবার তাঁর চোখে কৌতূহলের ঝলক দেখা গেল।

নিজেকে 'নায়ক' ভাবা একজন মানুষ, কিন্তু হিন্দি সিনেমার দাপটে নিজের রাজ্যেই যাঁর সাফল্য ম্লান হয়ে গেছে। একজন 'বিলেতি' চলচ্চিত্রকারের কাছে তিনি নিজের কাজের স্বীকৃতি পাচ্ছেন- অবশেষে এতেই প্রত্যাশিত ফল পাওয়া গেল।

সাক্ষাৎকারের জন্য পরেরদিন আমাকে গাড়িতে করে ১০০ কিলোমিটার দূরে একটা গ্রামে যেতে হবে। কানোরিয়া চান সেখানেই আমি তাঁর সাক্ষাৎকার নিই এবং একটা ফিল্মের সেটে তাঁর স্টান্ট দেখি। তাঁর সঙ্গে কথা বলে ঘরে ফিরে বিছানায় বসে মনে হল, পুরো বেকার একটা কাজ করতে হবে। কাজটায় বিস্তর ঝুঁকি আছে, কিন্তু এটাই একমাত্র পথ। পরের দিন সকালে ডিএসএলআর ক্যামেরা আর বিভিন্ন তথ্য লেখা কাগজপত্র নিয়ে রুম থেকে বের হলাম। মাইক বলল, তোমার চশমা নাও নি। আসলে নিজের নতুন ছদ্মবেশে তখনও ঠিক অভ্যস্ত হয়ে উঠতে পারিনি।

ফিল্মের সেট বানানো হয়েছে শহরের উপকণ্ঠে একটা গ্রামে। হাজার হাজার লোক জড়ো হয়েছে শুটিং দেখার জন্য। কনোরিয়ার ছেলে হিতু যথেষ্ট প্রতিভাবান, দক্ষিণ মুম্বাই থেকে স্নাতক সম্পন্ন করেছে। বন্দির পোষাক পরে আছে সে আর তাঁর বাবা অভিনয় করছেন পুলিশ অফিসারের ভূমিকায়।

বসে বসে শুটিং দেখার জন্য একটা চেয়ার দেওয়া হল আমাকে। মন দিয়ে নোট নিতে আর শুটিংয়ের ছবি তুলতে লাগলাম। লক্ষ করলাম আমি একা নই, অন্য একজন যুবকও ট্রাইপড আর লেন্স-টেন্স নিয়ে স্টান্টের ছবি তুলছে। যুবকটির বয়স তিরিশের কোঠার গোড়ার দিকে। কানোরিয়া যখন তাঁর সঙ্গে আমার আর মাইকের পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন আমরা হচ্ছি ডকুমেন্টারি ফটোগ্রাফার, তখন সে আমাদের দিকে একবার নির্লিপ্তভাবে তাকিয়ে নিজের কাজ করে চলল। ফটোগ্রাফারটির নাম অজয় পাঞ্জোয়ানি (নাম পরিবর্তিত)। পরবর্তী কয়েক মাসে তাঁর সঙ্গে এক বিচিত্র অন্তরঙ্গতা গড়ে উঠেছিল আমার। আমার আসল পরিচয়ে এই বন্ধুত্ব কখনোই গড়ে উঠতে পারত না। প্রতারণার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা বন্ধুত্ব, কিন্তু মৈথিলীর

কাজের জন্যে সেটা একান্তই দরকার ছিল। পরের ক'টা দিন কানোরিয়াদের সেটে যাওয়া, কথাবার্তা বলা, সিনেমাটার এটা-সেটা নিয়ে আলোচনা করা এবং ইউনিটের চা পান করেই কেটে গেল।

ফটোগ্রাফার অজয় গুজরাটি চলচ্চিত্র নিয়ে তথ্যচিত্র নির্মাণের জন্য নিয়মিত সেটে আসত। অবশেষে সে নরম হয় এবং প্রয়োজনে সাহায্য করতেও রাজি হয়। এভাবেই একবার ফিল্মের সেটে গিয়ে আমি জানাই গুজরাটের কয়েকজন সুপরিচিত পুলিশ অফিসারের সঙ্গে দেখা করতে চাই, বিশেষত দলিত সম্প্রদায় থেকে আসা অফিসারদের সঙ্গে। কানোরিয়াকে বললাম এইসব অফিসাররা যদি গুরুত্বপূর্ণ পদে থাকেন, যেসব পদে প্রচুর সাহসিকতা দরকার হয় এবং গুজরাটের নিরাপত্তা অর্থাৎ সন্ত্রাসবাদ-বিরোধী কাজকর্মের সঙ্গে যদি তাঁরা যুক্ত থাকেন, তাহলে খুবই ভালো হয়।

শেষ কথাটায় প্রয়োজনীয় জবাবটা পাওয়া গেল। 'আপনি মি. সিংঘলের সঙ্গে দেখা করতে পারেন। আমাদের একজন সেরা অফিসার, অনেক সন্ত্রাসবাদীকে হত্যা করেছেন।' নিজের উত্তেজনা চেপে রেখে তাঁর নামটা লিখে নিতে লাগলাম, যেন এই প্রথম শুনছি নামটা।

আমি অজ্ঞতার ভান করে জানতে চাইলাম, 'অফিসার সিংঘল কী করেন, স্যার? কোথায় কাজ করেন?'। সিনেমা জগতের বন্ধুদের থেকে এটুকুই আমার দরকার ছিল: একটা প্রবেশপথ। এমন একজনের সুপারিশ যাতে অফিসারদের কোনো সন্দেহ হবে না। সর্বোচ্চ মাপের একজন আঞ্চলিক চলচ্চিত্রকারের সুপারিশে আসা একজন চলচ্চিত্র নির্মাতাকে সন্দেহ করার কথা সিংঘল ভাবতেই পারবেন না।

এই সময় আমার কাছে আর একটা ই-মেইল এল। আহমেদাবাদেও একজনকে জানিয়ে রেখেছিলাম আমার ঠিক কেমন সাহায্য চাই। মেইলে শহরের সবথেকে বিখ্যাত একজন গায়নোকলজিস্টের সঙ্গে কীভাবে যোগাযোগ করতে হবে তাঁর নিখুঁত বিবরণ দেওয়া ছিল। এই গায়নোকলজিস্টের নামটা গোপনই থাক।

রুমের ভেতর আমার ইউনিনর (মোবাইল) নেটওয়ার্ক ঠিকমতো কাজ না করায় প্রায়ই আমাকে চত্বর যেতে হত। সেখানে হোস্টেলের বাসিন্দারা দাঁড়িয়ে চা খেত বা সিগারেট টানত। এদের মধ্যে মাইক-ও থাকত। সেদিনই চত্বরে দাঁড়িয়ে সেই গায়নোকলজিস্টকে ফোন করে বললাম, আমি একজন চলচ্চিত্রকার। গুজরাট নিয়ে একটা ছবি বানাতে চাই, তাতে রাজ্যের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয়টাও রাখতে চাই। ডাক্তার ভদ্রলোক বেশ অমায়িক। সম্ভব হলে সেদিনই সন্ধ্যায় তাঁর হাসপতালে যেতে বললেন আমাকে। আমি যেন হাতে আকাশের চাঁদ পেয়ে গেলাম। রওনা দিতে যাব, এমন সময় মাইক ছুটে এসে বললো, 'মৈথিলী, আমি কি কিছু জিজ্ঞেস করতে পারি?' তারপর বলল, 'শোনো মৈথিলী, আমি এভাবে কাজ করতে পারব না। যার সঙ্গেই দেখা হচ্ছে তাকেই বলছ তুমি একটা ফিল্ম বানাচ্ছ, কিন্তু আমি তোমার সঙ্গে কাজ করছি, আমাকে সত্যি বলা উচিত তোমার।' আবারো মাইকের কৌতুহল এড়ানোর চেষ্টা করলাম, কিন্তু ও একেবারে নাছোড়বান্দা, এমনকি আহতও হল। 'আমি বাচ্চা ছেলে নই। বিস্তর পড়াশোনা করি। জীবনে কিছু অর্জন করেছি বলেই এই বিনিময় প্রোগ্রামে সুযোগ পেয়েছি। আমাকে তোমার সব বলা উচিত। আমাকে কি তুমি বিশ্বাস করো? নাকি তোমার কাছে আমি স্রেফ একটা উপকরণ, লোকজনকে দেখানোর জন্য একটা বিদেশি মুখ মাত্র?।' মনে হল আগে থেকে ভালোভাবে মকশো করেই কথাগুলো বলেছে মাইক। তবু ওর এই আবেগময় বিস্ফোরণটার মধ্যে এমন কিছু ছিল যা থেকে মনে হল আমার প্রকৃত অনুসন্ধানের বিষয়টা ওকে জানানো উচিত। রওনা দেয়ার আগে আমার আগেরকার কিছু রিপোর্টের কয়েকটি লিঙ্ক ওকে দিয়ে সেগুলো পড়তে বললাম, যাতে আমি ফিরে আসার আগেই আমার বর্তমান অনুসন্ধানের পুরো পটভূমিটা সে জেনে নিতে পারে।

ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করাটা অত্যন্ত ফলপ্রসূ হল। সাহায্য করতে তিনি খুবই আগ্রহী। ভদ্রলোককে বললাম আমি একজন মহিলা চিকিৎসকের সঙ্গে দেখা করতে চাই, এমন কোন চিকিৎসক, যিনি গুজরাটে খুবই জনপ্রিয়, আমার ফিল্মে যাঁর ছবি তুলতে পারব। উত্তরটা কী হতে পারে তাঁর একটা আন্দাজ আমার ছিল। গায়নোকলজিস্টদের সঙ্গে দেখা করার

পিছনে বিশেষ একটা উদ্দেশ্য ছিল আমার। ২০০২ সালের গুজরাট দাঙ্গা দেশের ধর্মনিরপেক্ষতার চাদরে একটা কালো দাগ হয়ে রয়েছে। এর পিছনে উস্কানিদাতার অভাব ছিল না। আহমেদাবাদের জনৈক বিধায়ক মায়া কোদনানি এদেরই একজন। নিজের বিধানসভা এলাকায় দাঙ্গার অন্যতম প্রধান উস্কানিদাতা হিসেবে অনেক প্রত্যক্ষদর্শীই তাঁর নাম বলেছিলেন। কোদনানির কাছে পৌঁছানো আমার খুবই দরকার, কারণ আমার বিশ্বাস তাঁকে ধরে ঘটনার আরও গভীরে যেতে পারব আমি।

ওই ডাক্তারটি সেদিন সন্ধ্যায় আমার সামনেই কোদনানিকে ফোন করে বললেন, আমেরিকা থেকে আসা জনৈক কৃতী চলচ্চিত্রকার তাঁর সাক্ষাৎকার নিতে চায় এবং আমার বিশ্বাসযোগ্যতা সম্বন্ধে তিনি নিজে গ্যারান্টি দিচ্ছেন। কাজ চালিয়ে যাওয়া এবং সন্দেহ এড়ানোর জন্য এর পরও সপ্তাহে একবার করে ওই ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করতাম, যেন এটা আমার গবেষণার অঙ্গ।

হোস্টেলে ফিরে দেখলাম একটা কাগজে আমার জন্য বেশ কিছু প্রশ্ন লিখে রেখেছে মাইক। তাঁর মধ্যে এমন কায়েকটা নামও আছে, যাদের সে 'ক্রিমিনাল' মনে করে। মাইকের কথাই ঠিক, বিনিময় কর্মসূচিতে ওকে এমনি-এমনি নির্বাচন করা হয়নি। আমার কথা মন দিয়ে শুনে বেশ কিছু প্রশ্ন করল এবং সূক্ষ্ম বিষয়গুলো ধরতে পারল। আমার পরিকল্পনার কথা ওকে বললাম। সবকিছু ঠিকঠাক না-চললে তাৎক্ষণিকভাবে পরিকল্পনা বদলাতে হতে পারে, সেটাও জানালাম। ও জানতে চাইল কিভাবে অগ্রসর হবো আমরা। বললাম, 'আগামীকাল আমাদের প্রথম পরীক্ষায় বসতে হবে।'

পরের দিন মায়া কোদনানির সঙ্গে দেখা করার কথা। অনুসন্ধানী সাংবাদিক হিসেবে আমার জানা ছিল শুরুতেই খবর হু-হু করে আসে না, যদিও আসে তাতে বেশি কৌতূহল দেখানো উচত নয়। সেভাবেই বুঝিয়ে দিলাম মাইককে। 'আজ আমাদের ফিল্মমেকার হয়েই থাকতে হবে, স্রেফ ফিল্মমেকার।' মায়াবেনের ক্লিনিক নারোডার বড় রাস্তার ওপর। নারোডা পাটিয়া গণহত্যার ঘটনা এই তিনবারের বিধায়কের ক্লিনিক থেকে

ঢিলছোঁড়া দূরত্বে ঘটেছিল, যে গণহত্যায় শতাধিক মানুষকে হত্যা করা হয়েছিল নির্মমভাবে। শোনা যায় তাঁর উস্কানিতেই একদল লোক উত্তেজক স্লোগান দিতে দিতে মুসলিমদের আক্রমণ করেছিল।

মাইক আর আমি মায়া কোদনানির ক্লিনিকে ঢুকলাম। তাঁর কেবিনের বাইরে সরু টেবিলে স্থানীয় কিছু মহিলা বসে আছেন। দরজার সামনে দু'জন লম্বাচওড়া, সুগঠিত চেহারার লোক দাঁড়িয়ে আছে, তাদের একজনের হাতে একটা বন্দুক। মাইক আর আমাকে দেখে থামাল সে, ফোনে বসের সঙ্গে কথা বলে ভেতরে যেতে দিল আমাদের। লোকটি কোদনানির বডিগার্ড। কোদনানি স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন টিম (সিট) এর তদন্তের মুখে পড়ার পর থেকেই তাঁর ক্লিনিক পাহারা দিত সে। দোতলা বাড়ি। অন্য আরেক ডাক্তারেরও ক্লিনিক আছে সেখানে। ক্লিনিকের পাশেই একটা অপারেশন থিয়েটার। প্রতি বৃহস্পতিবার ক্লিনিকে রোগীর সংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে যেত, যাদের অধিকাংশই নিম্নবিত্ত পরিবারের সদস্য। সামনে একটা প্লেটে লেখা আছে, 'প্রতি বৃহস্পতিবার ভিজিট মাত্র ৫০ টাকা।' আমাদের দিকে সন্দিহান দৃষ্টিতে তাকিয়ে কম্পউন্ডারটি জানাল এখানে শুধুমাত্র স্থানীয় মানুষদেরই চিকিৎসা করা হয়। মহিলাকে জানালাম, আমি একজন চলচ্চিত্র নির্মাতা, ম্যাডামের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।

আমি নোটবুকে কিছু লেখার চেষ্টা করছিলাম। আর মাইক টিভিতে সংস্কার চ্যানেল দেখছিল। একজন বয়স্কা মহিলা তাঁর পুত্রবধূকে নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন। 'বাবা'কে সম্মান জানানোর জন্য টিভির সামনে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়লেন মহিলা। সেটি দেখে বিস্মিত দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাল মাইক। একটু হেসে নোটবুকে মন দিলাম।

এসময় কোদনানির কেবিন থেকে বাইরে এসে তাঁর সহকারিণী বললেন, 'মৈথিলী কে?' এরপর আমাকে আর মাইককে ভেতরে যেতে ইঙ্গিত করলেন। কায়দা-করা উচ্চারণে আমার আর মাইকের পরিচয় দিলাম। তারপর উষ্ণ করমর্দন।

'আপনার নামটা খুব সুন্দর। এটা সীতাজির নাম', বললেন কোদনানি। দৃশ্যত তিনি খুবই খুশি। 'হ্যাঁ ম্যাম, আমার বাবা সংস্কৃতের শিক্ষক, তাই আমাদের বাড়িতে সকলেরই সুন্দর-সুন্দর নাম।' কথাটা শুনে আরও খুশি হলেন কোদনানি, কিন্তু মাইকের দিকে আর ফিরেও তাকালেন না। মাইক খুবই বিরক্ত হয়েছিল এই আচারণে। কোদনানির ডেস্কে মেডিসিন ও গায়নোকলজির বইপত্র, বিজেপির কিছু প্যামফ্লেট এবং গুজরাট সিন্ধি সম্প্রদায়ের মানুষদের সম্বন্ধে কিছু প্যামফ্লেট রাখা ছিল। পাশেই তাঁর পুত্র ও পুত্রবধুর একটা ছবি, তাঁরা আমেরিকায় থাকে। প্রায় এক ঘণ্টা ধরে তাঁর কর্মজীবন নিয়ে আলোচনা করলাম আমরা। নিজের পরিবারের কথা বললেন তিনি। আপ্যায়ন করলেন ঠান্ডা পানীয় দিয়ে।

মায়াবেন গুজরাটের শিশুকল্যাণ ও স্বাস্থ্য বিষয়ক মন্ত্রী। সেই সূত্রে গুজরাটে নারীদের কল্যাণের জন্য তাঁর দায়বদ্ধতার প্রশংসা করলাম আমি। 'আমার কাছে কী চান আপনি?' অবশেষে প্রশ্ন করলেন তিনি। 'আমি শুধু আপনার কথা আরও বেশি করে জানতে চাই ম্যাম, গুজরাটের কৃতী মানুষ হিসেবে ছবিতে ফুটিয়ে তুলতে চাই আপনাকে।' প্রত্যেক ব্যক্তি, বিশেষত রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত প্রত্যেকে তোষামুদে কথা শুনতে ভালোবাসে। যা তাদের গৌরবান্বিত করবে সেটার অংশীদার হতে চায়। তৎক্ষণাৎ ঘাড় নাড়লেন তিনি এবং পরের রবিবার তাঁর এ্যাপার্টমেন্টে লাঞ্চ করার আমন্ত্রণ জানালেন। নিজের উল্লাস আড়াল করার চেষ্টা করতে করতে বললাম, তাহলে তো বেশ হয়।

কোদনানির শাড়ি আর অন্যান্য সাজসজ্জার প্রশংসা করলাম আমি বের হওয়ার আগে। বাইরে বের হবার সময় নিরাপত্তা রক্ষীটিকে অখুশি মনে হল। একটা অটো ধরে সোজা পাকওয়ানের দিকে চললাম। দৃশ্যতই অখুশি মাইক বলল, 'তুমি নিশ্চয়ই দেখেছ আমার সঙ্গে কথা বলার আদৌ ইচ্ছে ছিল না কোদনানির।' আমি কোনো উত্তর দেওয়ার আগেই হালুয়া আর রাবড়ি এসে গেল। গুজরাটে থালি পরিবেশনের সময় প্রথমে মিষ্টি দেওয়া হয়। মাইকের মনোযোগ প্রিয় খাবারের দিকে ঘুরে গেল,

কোদনানির কথা তখন আর মাথায় নেই। মহারাজ তাকে প্রতিটা পদের নাম সঠিকভাবে শেখানোর চেষ্টা করছে। ভাবলাম যাক, বাঁচা গেল।

হোস্টেলে ফিরলাম রাত দশটা নাগাদ। নিজের ঘরে পা দিতেই কেমন যেন একটা অস্বস্তিকর অনুভূতি হল। মনে হচ্ছে কিছু যেন ঘটেছে। বেরোনোর আগে বিছানাটা ঠিকভাবে পেতে রেখে গিয়েছিলাম, এখন বিছানার চাদরটা দোমড়ানো এবং ল্যাপটপের সুইচ অন করা। সুটকেস আর ড্রয়ারে হাত দেয়নি, কিন্তু বুঝতে পারছি ঘরে কেউ ঢুকেছিল। না, অবাক হইনি। এ-রকম কিছু যে ঘটতে পারে, সেটা আগেই আন্দাজ করেছিলাম। গুজরাটে ঢোকার আগেই আমার ল্যাপটপটা রি-ফর্ম্যাট করে রেখেছিলাম এবং এডমিনের নাম ছিল মৈথিলী ত্যাগী। ডেস্কটপে ছিল চলচ্চিত্রনির্মাণ সংক্রান্ত এবং গুজরাট মিউজিয়াম, ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি ও বনভূমি সম্বন্ধে গবেষণার ফাইলপত্র। স্ক্রিণে ছিল শ্রীকৃষ্ণের একটা ওয়ালপেপার। বিছানার পাশের তাকে চলচ্চিত্রনির্মাণ ও ফটোগ্রাফি সংক্রান্ত বইপত্র রাখা ছিল। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে কেউ আমার ঘরে তল্লাশি করতে ঢুকেছিল এবং প্রয়োজনীয় কিছুই পায়নি। খেলা তো সবে শুরু হলো।

জি.এল. সিংঘলের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলতে হবে পরেরদিন সকালে। ফটোগ্রাফার বন্ধু অজয় আমার ফোনে একটা মেসেজ পাঠিয়ে জানতে চাইল, 'আহমেদাবাদ নি গুফা'য় একটা আলোকচিত্র প্রদর্শনীতে যেতে আমি ইচ্ছুক কিনা। ফোনটা একপাশে সরিয়ে রাখলাম। দরজায় কড়া নাড়ল মাইক। ফাউন্ডেশনের চারপাশে হাঁটতে যাচ্ছে সে তাই জানতে এসেছে আমিও যাবো কিনা। গুজরাটে ডিসেম্বর মাসের সন্ধ্যা খুব সুন্দর আর কনকনে ঠান্ডা হয়। ২০১০ সালের শীতকালটা অবশ্য খুব কষ্টকর ছিল। উপরন্তু হোস্টেলটা ছিল একটা খোলা, অনুন্নত জঙ্গলময় এলাকায়।

হোস্টেলে গায়ে দেওয়ার জন্য মাত্র একটা করে কম্বল দেওয়া হত। রাতের বেলায় আমাদের মধ্যে বেশির ভাগ জন সুটকেস হাঁটকে সবকিছু বার করে গায়ে চাপানোর চেষ্টা করতাম: টি-শার্ট, শার্ট, সোয়েটার, জিনস্, যা-কিছু থেকে একটু উষ্ণতা পাওয়া যায়, তেমন সবকিছুই।

সেদিন সন্ধ্যে বেলায় মাইক আর আমি ঠিক করলাম একজোড়া বাড়তি জ্যাকেট গায়ে চাপিয়ে ফাউন্ডেশন বিল্ডিংয়ের অরণ্যের পাশ দিয়ে হাঁটতে যাব। মাইক যথারীতি চিন্তায় ডুবে আছে। ওর দিকে তাকাতে ও বলল, 'মৈথিলী, আমি কি ঠিকঠাক কাজ করছি?' আশ্বাস দিয়ে বললাম, 'তুমি খুব আত্মবিশ্বাস নিয়ে কাজ করছ। মিসেস কোদনানিকে নিয়ে মাথা ঘামিয়ো না। উনি কথাবার্তায় বড্ড ব্যস্ত ছিলেন আর শুধু নিজের প্রশংসার কথাই শুনতে চাইছিলেন।' সেই রাতে ঘুমুতে যাওয়ার আগে অজয়কে একটা মেসেজ পাঠালাম, 'এক্সিবিশনে তোমার সঙ্গে দেখা হবে।'

পরের দিন সকালে ক্যান্টিনে উপমা খেতে খেতে শেষ পর্যন্ত জি.এল. সিংঘলকে ফোন করলাম। সেইসময় সবার নজর রয়েছে তাঁর দিকে। হাইকোর্ট নিযুক্ত স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন টিম (সিট) ইশরাত জাহান হত্যার তদন্ত শুরু করায় সিংঘলের কথা সবার মুখে মুখে। 'সংঘর্ষের পরের দিন গুজরাটের উচ্চপদস্থ পুলিশকর্তা এবং এন্টি টেররিস্ট স্কোয়াডের প্রধান ডি.জি. বানজারা একটা সাংবাদিক সম্মেলন ডাকেন। সে এক চাঞ্চল্যকর দৃশ্য। আরও তিনজনের সঙ্গে ইশরাতের রক্তাক্ত দেহ শোয়ানো আছে রাস্তায়। দাবি করা হয়েছিল সে একজন নারী আত্মঘাতী। ভারতে এই প্রথম নারী আত্মঘাতী দেখা গেল। বলা হল সে লশকর-ই-তয়্যিবা-র কর্মী, গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে হত্যার চেষ্টা করেছিল।

ইশরাত হত্যাকাণ্ড 'টক অব দ্য টাউন' হয়ে উঠেছিল। মৌলবাদী এবং জঙ্গি মুসলিম সংগঠনগুলি কীভাবে ২০০২ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বদলা নিতে চাইছে তা নিয়ে কাগজে নানান কথা লেখা হচ্ছিল। ডি.জি. বানজারাকে মহান বীর বলে মনে করছিল সবাই। রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে উঠেছেন তিনি। তাঁর গৌরবের অংশীদার ছিলেন আরও কয়েকজন অফিসার: এন. কে. আমিন, তরুণ বারোত এবং গিরিশ সিংঘল, যাঁর সম্বন্ধে আমার বিশেষ কৌতূহল ছিল।

এদিকে ইশরাতের পরিবার তাদের কন্যা 'হত্যা'র তদন্ত চেয়ে সুপ্রিম কোর্টে পিটিশন দাখিল করেছিল। গুজরাটের হাইকোর্ট একটা বিচার বিভাগীয় কমিটি নিয়োগ করে। জাস্টিস তামাং কমিটি, যার প্রধান ছিলেন গুজরাটে হাইকোর্টের জনৈক প্রাক্তন বিচারপতি। ২০০৮ সালে সেই বিচার বিভাগীয় কমিটি যে রায় দেয় তাতে সারা দেশ চমকে ওঠে। রায়ে বলা হয়, সাজানো বন্দুকযুদ্ধে হত্যা করা হয়েছে ইশরাত জাহানকে। এ ব্যাপারে আরও অনুসন্ধান করা দরকার।'

বিচার বিভাগীয় কমিটির এই রায়ের পর নিরপরাধ ব্যক্তিদের হত্যার জন্য কর্মকর্তাদের ক্ষমতার অপব্যবহারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে পথে নামেন মানবাধিকার কর্মী ও আইনজীবীরা। কোন অদৃশ্য শক্তির ইশারায় মামলাটা আর অগ্রসর হচ্ছিল না। এরপর আরও অনুসন্ধানের জন্য গুজরাট হাইকোর্টে আবেদন করে ইশরাতের পরিবার। আবেদনের প্রেক্ষিতে সংঘর্ষের তদন্তের জন্য তিন সদস্যবিশিষ্ট একটা বেঞ্চ গঠন করা হয়। পরে ২০১৩ সালে, গুজরাট হাইকোর্ট কর্তৃক সিবিআই-এর তদন্তকারী দল একে সাজানো বন্দুকযুদ্ধ বলে ঘোষনা দেয়। তদন্তে গুজরাটের উচ্চপদস্থ কিছু পুলিশ কর্মকর্তার নাম উঠে আসে যারা অভিযুক্ত।

২০১০ সালে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন টিম মামলাটির তদন্ত করছিল। সে সময়ই আমি প্রথম সিংঘলের অ্যাপয়েন্টমেন্ট চাই। ফোন বাজল। কায়দাদুরস্ত ইংরেজি উচ্চারণে নিজের পরিচয় দিলাম। তখনই কোন উত্তর মিলল না। পরে ফোন করতে বললেন সিংঘল। এই লোকটাই আমার একমাত্র আশা। একে দিয়েই আমার অনুসন্ধান শুরু করতে হবে। মনে মনে ভাবলাম, কীভাবে অগ্রসর হওয়া যায়। সেদিনের খবরের কাগজে দেখলাম সিংঘলকে অবিলম্বে গ্রেপ্তার করবে স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন টিম। এরকম অবস্থায় একজন বিদেশফেরত চলচ্চিত্রকারের সঙ্গে কথা বলার থেকে আইনি পথ খোঁজার কাজে ব্যস্ত থাকাটাই সিংঘলের পক্ষে স্বাভাবিক। মাইককে জানালাম আজ আর তাকে দরকার নেই। হোস্টেলের অন্য বাসিন্দাদের সঙ্গে পরিচিতি

হয়ে গিয়েছিল মাইকের। এদের মধ্যে ছিল পারনানগুয়াক লিন্‌জে নামক গ্রিনল্যান্ডের একটি মিষ্টি মেয়ে, যাকে আমরা পানি বলে ডাকতাম। আমার মনে হচ্ছিল মেয়েটির প্রতি দূর্বল হয়ে পড়েছে মাইক। আজ তাঁর কোনো কাজ নেই শুনে পানিকে নিয়ে ছবি তোলার জন্য বের হতে চাইল মাইক। পানিও এককথায় রাজি হয়ে গেল।

হঠাৎ মনে পড়ল, সন্ধ্যা সময় আমাকেও ছবির প্রদর্শনীতে যেতে হবে। আপাতত তেমন কিছু করার নেই দেখে ঘরে ফিরে গত কয়েকদিনের ঘটনাগুলো নোট করতে লাগলাম। সন্ধ্যার দিকে ছবির প্রদর্শনীতে গিয়ে দেখি অজয় তার বন্ধুর প্রদর্শনীতে সবাইকে আপ্যায়ন করতে ব্যস্ত। সবার সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিল আমেরিকা থেকে আসা একজন চলচ্চিত্রনির্মাতা হিসেবে। এটুকুই যথেষ্ট ছিল নানান টেকনিক্যাল প্রশ্ন ধেয়ে আসার জন্য। 'আপনার ক্যামেরার কাজটা কে দেখছে? কী ক্যামেরা ব্যবহার করছেন? শুট শুরু হবে কবে?' এই ধরনের প্রশ্ন আসতে পারে অনুমান করে উত্তরগুলো আগে থেকেই ভেবে রেখেছিলাম। ঠান্ডা মাথায় প্রশ্নগুলোর উত্তর দিলাম। অজয় দৃশ্যতই আপ্লুত। 'আমদাবাদ নি গুফা' টা আমাকে ঘুরিয়ে দেখাল সে। কফির কাপ আর সামুচা নিয়ে বসার আগে জায়গাটার ইতিহাসও অল্পকথায় জানিয়ে দিল আমাকে।

আমাদের পাশেই একদল কলেজপড়ুয়া বসে ছিল, তাদের মধ্যে একজন গিটার বাজাচ্ছে। দূরের কোণে একজন তাঁর বান্ধবীকে নিয়ে বসে আছে। এক মুহূর্তের জন্য মনে হল সবকিছু ভুলে গেলে বেশ হয়। পুলিশ কর্মকর্তা, আমার ছদ্মপরিচয়, আসন্ন কাজের ব্যাপারে নার্ভাস হয়ে থাকা, সবকিছু। আমি যেন ওদের মতোই একজন ছাত্রী। বাড়ির কথা মনে পড়ল। অনেকদিন মা-বাবার সঙ্গে কথা বলিনি, আমার আচরণের এই আকস্মিক পরিবর্তনে উদ্বিগ্ন হয়ে আছেন তাঁরা। আমার সেলফোন সুইচ অফ করে রেখেছি। মাঝে মাঝে স্থানীয় সাইবার ক্যাফে থেকে মেইল করি মা-বাবাকে। অমিত শাহ সংক্রান্ত রিপোর্টটা প্রকাশ করার পর থেকেই আমার নিরাপত্তা নিয়ে দুশ্চিন্তায় থাকেন তাঁরা।

এসব ভাবতে ভাবতে অজয়কে বললাম, আমার হোস্টেলের কাছে একটা বাজারে সে আমাকে নামিয়ে দিতে পারবে কি না। বললাম, আমার কিছু টুকটাক কাজ আছে। স্যাটেলাইট রোডের বাজার এলাকায় আমাকে নামিয়ে দিল অজয়। টুকটাক কাজের বাহানাটা যে বানানো নয় তা বোঝানোর জন্য একটা সুপার মার্কেটে গেলাম। টয়লেটের কিছু জিনিসপত্র কিনে দোকানের পাশের পাবলিক বুথে ঢুকলাম। এটাই হচ্ছে যোগাযোগের সবথেকে নিরাপদ উপায়। বাড়ির ল্যান্ডলাইনে ফোন করলাম। আমার শক্তির উৎস এবং নিজেকে সারাক্ষণ শক্ত মানুষ হিসেবে দেখানোর চেষ্টা করে চলা আমার মা ফোন ধরলেন। আম্মা চাইছিলেন এসব বাদ দিয়ে আমি ফিরে যাই। বাড়ির সঙ্গে কোনো যোগাযোগ রাখা যাবে না, এ আবার কেমন সাংবাদিকতা! মাকে যতটা সম্ভব আশ্বস্ত করে ফোন রেখে দিলাম। বুকের ভেতরটা যেন ফাঁকা ফাঁকা লাগছে।

পরদিন সকালে আবার ফোন করলাম সিংঘলকে। এবার আমার সঙ্গে দেখা করতে রাজি হলেন তিনি। আমার অনুসন্ধানের যন্ত্রণাময় দীর্ঘযাত্রা অবশেষে শুরু হতে চলেছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

জি.এল.সিংঘল

গিরিশ সিংঘলের বড় ছেলে হার্দিক ২০১২ সালে আত্মহত্যা করে। ঘনিষ্ঠরা বলেন এই ঘটনায় তাঁর বাবা একেবারে ভেঙ্গে পড়েছিলেন। আমি সিংঘলের সঙ্গে দেখা করি ২০১০ সালের সেই সকালে টেলিফোনে কথা বলার পর। যাওয়ার আগে মাইককে বুঝিয়ে বলেছিলাম পরিস্থিতি কতটা স্পর্শকাতর। সিংঘল কোন যেনতেন লোক নন, গুজরাট এটিএস-এর প্রধান তিনি।

সেসময় স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন টিম (সিট) এর তদন্তের কারনে সিংঘলের চলাফেরার ওপর সতর্ক নজর রাখা হচ্ছিল। কাদের সঙ্গে দেখা করছেন সে ব্যাপারে তিনি নিজেও সতর্ক থাকতেন। তাঁর গ্রেপ্তার হওয়াটা ছিল সময়ের ব্যাপার। সিট দ্রুত তদন্ত করছিল। ততদিনে সিংঘলের দু'জন জুনিয়র অফিসার গ্রেপ্তার হয়েছেন। এরপরই হয়তো সিংঘলকে গ্রেপ্তার করা হবে। তাঁর ও অন্য অফিসারদের বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগের সঙ্গে ছিল সন্ত্রাসের নামে একটি নিরপরাধ মেয়ের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে তাকে হত্যা করার।

এঘটনা গুজরাটে নতুন কিছু ছিল না। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পর বৈরিতার একটা বাড়াবাড়ি সেখানে ছিলই। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল, দুই সম্প্রদায়ের মধ্যকার সম্পর্ক খুব একটা বন্ধুত্বপূর্ণ নয়, বরং আরও খারাপের দিকে যাচ্ছে। নরেন্দ্র মোদিকে সেই হিন্দু নেতা হিসেবে দেখা হচ্ছিল যিনি গুজরাটকে 'সন্ত্রাসী' আক্রমনের হাত থেকে রক্ষা করেছেন। গোধরায় ট্রেনে আগুন লাগানো এবং তাঁর পরবর্তী হত্যাকাণ্ডে উভয় সম্প্রদায়ই ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল। অভিযোগের তীর ছিল বিভিন্ন আমলা ও অফিসারদের দিকে, কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে কিছুই প্রমাণ করা সম্ভব ছিল না। সেইসময় কর্তৃপক্ষের কার্যকলাপ অথবা নিষ্ক্রিয়তাকে কঠোরতম ভাষায় সমালোচনা করেছে তদন্ত কমিশন। তা সত্ত্বেও হাতে গোনা কয়েকজন কর্মী ছাড়া বাকিরা ক্ষমতায়

রয়েই গেছে। সম্ভবত এই দৃষ্টান্তে উদ্দীপ্ত হয়েই গুজরাটে বেশ কিছু সংঘর্ষে মৃত্যুর ঘটনা ঘটে। পরবর্তীতে যেগুলোকে ভারতের সুপ্রিম কোর্ট স্বয়ং সাজানো বন্দুকযুদ্ধ হিসেবে অভিহিত করেন। গুজরাটের বিপদকে দৃশ্যমান করার একটা অংশ ছিল এইসব সাজানো বন্দুকযুদ্ধ।

গুজরাটের সাজানো বন্দুকযুদ্ধের ঘটনাবলি একটা নোংরা নকশা অনুযায়ী এগিয়েছে। সমির খান পাঠান, সাদিক জামাল, ইশরাত জাহান, জাভেদ ওরফে প্রাণেশ পিল্লাই, সোহরাব উদ্দিন, তুলসীরাম প্রজাপতি। এগুলো গুজরাটের কয়েকটা মাত্র সাজানো বন্দুকযুদ্ধের ঘটনা যেগুলোর তদন্ত দেশের সর্বোচ্চ বিচারক সংস্থা করছে। ঘটনাগুলোর দিকে এক নজর তাকালেই ঠান্ডা মাথায় পরিকল্পিত ও সংঘটিত হত্যাস্রোতের স্বরূপ বোঝা যায়। ২০১১ সালের ডিসেম্বর মাসে *তেহেলকা*'য় আমার সবথেকে পূর্ণাঙ্গ রিপোর্টগুলোর একটায় আমি লিখেছিলাম,

"গুজরাটের সাজানো বন্দুকযুদ্ধগুলিকে কেন্দ্র করে যে নিন্দাজনক ও মিথ্যা প্রচারের স্রোত বইছে, সেটাই বিষয়টিকে আরও উদ্বেগজনক করে তুলেছে। সাজানো বন্দুকযুদ্ধে নিহত প্রত্যেককে খোলাখুলিভাবে লশকর-ই-তয়্যিবার সন্ত্রাসবাদী হিসেবে অভিহিত করে বলা হয়েছে এদের উদ্দেশ্য ছিল মুখ্যমন্ত্রী মোদি, তৎকালীন উপ-প্রধানমন্ত্রী এল. কে. আদবানি এবং উগ্র-হিন্দুত্ববাদী প্রবীণ তোগাড়িয়া ও জয়দীপ প্যাটেলের মতো নেতাদের হত্যা করা।

২০০২ সালের পরবর্তী সময়ে ধর্মের ভিত্তিতে দুই মেরুতে বিভক্ত গুজরাটে এই ধরনের প্রচার শুকনো কাঠে আগুন ছোঁয়ানোর মতো কাজ করত। কেউই লক্ষ করল না যে কোন মুসলিম ছেলেই দেশের মধ্যে কোনো সন্ত্রাসবাদী বোমা বিস্ফোরণের সঙ্গে জড়িত ছিল না। কিছু বানানো বিপদের কথা বলে এবং ছোটখাটো অপরাধীদের 'সন্ত্রাসবাদী' হিসেবে চিহ্নিত করে সমগ্র মুসলিম সম্প্রদায়কেই জাতীয়তাবিরোধী হিসেবে সিল মেরে দেওয়া হল। এর ফলে মোদিকে 'হিন্দু হৃদয়সম্রাট' রূপে প্রতিষ্ঠিত করতে সুবিধা হল যে মানুষটি 'হিন্দুর শত্রুদের' উচিত শিক্ষা দিতে দক্ষ।

সেইসাথে জিহাদি গ্রুপগুলোর থেকে যেকোনো সময় তাঁর প্রাণনাশের আশঙ্কাও আছে।[২]

এর আগে *তেহেলকা*'র একটা রিপোর্টে[৩] বলা হয়েছিল, ছিঁচকে অপরাধী ও চাঁদাবাজ সোহরাব উদ্দিন নিহত হওয়ার আগে অমিত শাহ তাকে ভালোভাবেই চিনতেন। কেন সোহরাব উদ্দিনকে মেরে সন্ত্রাসবাদের তকমা দেওয়া হল, সেই অস্বস্তিকর প্রশ্নটিও তোলা হয়েছিল ওই রিপোর্টে। মনে রাখা দরকার, অমিত শাহ তখন কেবলমাত্র স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং পুলিশের কার্যকলাপের জন্য প্রত্যক্ষভাবে দায়িত্বশীলই ছিলেন না, সেসঙ্গে মোদির সাথে অতি-ঘনিষ্ঠতা থাকায় এক ডজনেরও বেশি মন্ত্রীর ভারও ছিল তাঁর হাতে। আবার কলঙ্কিত পুলিশ অফিসার বানজারা ছিলেন অমিত শাহের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ।

তবে সিংঘলকে তোপের মুখে ফেলেছিল ১৯ বছরের তরুণী ইশরাত জাহানের ঠান্ডা মাথায় হত্যাকাণ্ডই। অন্যান্য সাজানো বন্দুকযুদ্ধে তাঁর ভূমিকার ব্যাপারটা সংশ্লিষ্ট সংস্থা কর্তৃক তদন্ত চলার সময় তাঁর ভবিষ্যতকে আরও অন্ধকারাচ্ছন্ন করে তুলতে সাহায্য করেছিল মাত্র।

সেদিন সকালে আহমেদাবাদের শাহিবাগ এলাকায় নিরাপত্তার চাদরে আবৃত অফিসে মাইককে নিয়ে পৌঁছানোর পর গিরিশ সিংঘলকে প্রথমবার দেখলাম আমি। তাঁর অতীতের সম্মানজনক কাজের অন্যতম একটি ছিল অক্ষরধাম আক্রমণের সফলভাবে মোকাবিলা করা, যে কাজের জন্য সাহসিকতা পুরস্কার পান তিনি। যে ধরনের স্বীকৃতি তিনি অর্জন করেছিলেন, তা তাঁর বয়সী কোন অফিসারের পক্ষে অর্জন করা খুব স্বাভাবিক নয়। তাঁর বিভাগের বেশিরভাগ কর্মীই এই কথার পক্ষে সাক্ষ্য দেন। এটিএস অফিসের নিরাপত্তারক্ষীটি একটু বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিল। স্কার্ট আর গলায় রঙিন বান্ডানা বাঁধা এক মহিলা এবং একজন লোক এটিএস প্রধানের সঙ্গে দেখা করতে চান? সিংঘলের কাছে খবর পাঠানো হল।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই একজন কনস্টেবল এলেন। রক্ষীটিকে গুজরাটি ভাষায় ফিসফিস করে জানালেন, আমরা হচ্ছি বিদেশী চলচ্চিত্রকার, সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। মাইক আর আমাকে যখন ভেতরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তখন রক্ষীটি বিস্ময়ে হাঁ করে তাকিয়ে ছিল। মাইক যথারীতি আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব হিসেবে চলাফেরা করেছে। অন্য কোনো ১৯ বছর বয়সী ছেলে হলে এই অবস্থায় ভয়ে কাঁপত, কিন্তু মাইক ভয় পাওয়ার বান্দাই নয়। তবে ওকে নিয়ে আমার কিছুটা দুশ্চিন্তা ছিল। পরিস্থিতির গুরুত্ব এবং তাঁর সঙ্গে ঝুঁকির ব্যাপারটা কি ও পুরোপুরি বুঝেছে? ওয়েটিং রুমে ঢোকার পর মন থেকে যাবতীয় সংশয় মুছে গেল। কয়েকজন কনস্টেবল এবং সাদা পোশাকের উচ্চপদস্থ পুলিশকর্তাদের সঙ্গে বসে অপেক্ষা করছিলাম আমরা। তাদেরও পায়ের সাদা ও মজবুত স্পোর্টস শু দেখেই সাধারণ লোকেদের সঙ্গে তাঁদের পার্থক্য বোঝা যাচ্ছিল। টিভিতে একটা বলিউড সিনেমা চলছিল, মাইক সেটা দেখতে লাগলো। গোবিন্দার ছবি। কয়েকজন পুলিশ অফিসার মন দিয়ে ছবিটা দেখছেন, অন্যরা নিজেদের কাজ করে চলেছেন। বেশি কৌতূহলী একজন পুলিশ অফিসার মাইকের পাশে এসে বসে খুব ভদ্র সুরে তাকে 'নমস্তে' জানালেন। ভাঙা-ভাঙা ইংরেজিতে কথাবার্তা চলতে লাগল। মাইকের এদেশি খাদ্যপ্রীতি থেকে শুরু করে তাঁর নিজের দেশের নানান কথা–বহু বিষয় নিয়েই কথা হচ্ছিল। মাইক সম্পূর্ণ সুস্থ, কোনো মানসিক চাপে ভুগছে না, আবার অতি-উৎসাহীও হয়ে পড়ছে না।

কিছুক্ষন পর আর্দালি এসে বলল, 'মৈথিলী ত্যাগী, আপকো সাহিব বুলাতে হ্যায়।' নাটকের প্রথম অঙ্ক শুরু হল।

গিরিশ সিংঘলের বয়স চল্লিশের কোঠায়। আচারণে ভদ্র, সুবেশধারী ও কেতাদুরস্ত। আমাদের ভেতরে ডাকলেন। আধ-খাওয়া সিগারেট দু'আঙুলের ফাঁকে ধরে ল্যাপটপে একটা ভিডিও দেখছিলেন। টেবিলে ওশো সংক্রান্ত গোটা দু'য়েক বই রাখা। 'আপনি কি ওশোর অনুগামী?' বসতে বসতে প্রশ্ন করলাম। ডায়েরিটা খুব সন্তর্পণে ঢেকে রাখলাম। এই ডায়েরিতেই লাগানো ছিল আমার ভিডিও রেকর্ডার। প্রথমে ভেবেছিলাম

গোপনে কথাবার্তা রেকর্ড করার আগে পরিচয়পর্বটা সেরে নেব। কিন্তু সবাই জানে সিংঘলের মন মেজাজ ঘন ঘন পালটায়। তিনি যদি হঠাৎ গুরুত্বপূর্ণ কিছু বলে বসেন আর আমার সঙ্গে তখন যদি রেকর্ডার না থাকে, তাহলে কী হবে? কিংবা এরপর তিনি যদি আমাকে আর অ্যাপয়েন্টমেন্ট না দেন, তাহলে?

সিংঘলের সঙ্গে মাইকের পরিচয় করিয়ে দিলাম। সিংঘল ঘাড় নাড়লেন। একবার কৃত্রিম উচ্চারণে আমাদের আসার কারণ জানালাম। খুব মন দিয়ে শুনলেন। যেন প্রতিটা শব্দই গুরুত্ব দিয়ে অনুধাবন করছেন, মাঝেমাঝে ঘাড় নাড়তে লাগলেন। তাঁর মনোযোগ আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছি বুঝতে পেরে আলগাভাবে কয়েকটা পরিচিত নাম সামনে আনলাম। 'আসলে মায়াবেন তো আপনার প্রশংসায় পঞ্চমুখ, তাঁর ধারণা আপনি এই রাজ্যের একজন সেরা অফিসার। আমাদের ফিল্মে মায়াবেনের কথাও থাকছে।' প্রত্যাশিত ফলই পাওয়া গেল। সিংঘলের মুখের গুরুগম্ভীর ভাবটা কেটে গিয়ে উৎফুল্ল হয়ে উঠল। বললেন, 'ভদ্রমহিলা খুবই ভালো, খুব আধ্যাত্মিক মনোভাবাপন্ন।'

সিংঘলকে ঘিরে যেসব বিতর্ক দানা বেঁধে উঠেছে সে বিষয়ের দিকে না যাওয়াই ভালো মনে হল। বরফ গলানোর জন্য অজ্ঞতার ভান আর সম্ভ্রম দেখানোই মনে হয় সহজ পথ হবে। নিজের ছোটবেলার কথা, উঁচু শ্রেণির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ইচ্ছের কথা, তাঁদের দলিত পরিবারকে প্রতিবেশী ব্রাহ্মণরা কী চোখে দেখত সেই কথা এবং পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী হয়ে ওঠার কথা বললেন তিনি। প্রশ্ন করলাম, আপনার পুলিশে যোগ দেওয়াটা কি সম্মান পুনরুদ্ধারের একটা উপায় হিসেবে কাজ করেছে? তিনি উত্তর দিলেন, 'অসাম্য সর্বত্রই বিদ্যমান, এমনকী এই যে ব্যবস্থার মধ্যে আমি আছি, সেখানেও অসাম্যের অভাব নেই।'

সাক্ষাৎকার ছিল ১৫ মিনিটের জন্য নির্ধারিত কিন্তু কথা বলতে বলতে তা এক ঘণ্টায় গড়ালো। আমি যখনই কিছু লিখে নিতে বললাম, মাইক খুব মনোযোগ দিয়ে লিখে নিল। ওদিকে কীভাবে তিনি আজকের এই ব্যক্তিত্ব হয়ে উঠেছেন, সেই কাহিনি বলে চললেন গিরিশ সিংঘল।

তাঁর নীচু জাতের জন্য একটা দোকানের কোন জিনিসে হাত দেওয়ার জন্য দোকানদার কীভাবে তাঁকে লাঠি দিয়ে মেরেছিল থেকে শুরু করে নিজের সাহসিকতার কাহিনি–অক্ষরধাম মন্দিরের ভিতরে ঢুকে পড়া সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে লড়াই... বলে গেলেন সিংঘল। বলার সময় মুখে গর্ব ফুটে উঠছিল। তাঁর সাফল্যের জন্য তাঁকে অভিনন্দন জানালাম, লজ্জায় রাঙিয়ে উঠলেন সিংঘল। যখন চারপাশের সবকিছুই তাঁকে চাপে ফেলে দিচ্ছে, যখন তাঁর ক্যারিয়ার বিপন্ন, তখন একজন বহিরাগতের এই স্বীকৃতি হয়তো তাঁকে কিছুটা স্বস্তি দিয়েছিল। আদা-চা খেতে খেতে তাঁর কথা শুনে চললাম আমরা।

এই সাক্ষাৎকারটা আমাদের সামনে দু'য়ার খুলে দিল। পরের সপ্তাহে আর একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট পেলাম। তবে কথাবার্তার সূত্রে একটা বিষয় উঠে এল যার সূত্রে আরও কিছু জানার সুযোগ পাব বলে মনে হল। জাত নিয়ে, বিশেষত দলিত শ্রেণির মানুষ হওয়া সত্ত্বেও যাঁরা উঁচু পদে উঠতে পেরেছেন তাঁদের নিয়ে কথা বলতে গিয়ে নিজের উপদেষ্টা হিসেবে একজনের নাম বললেন সিংঘল। তাঁর নাম রাজন প্রিয়দর্শী, গুজরাট এটিএস-এর প্রাক্তন প্রধান। তাঁকে গভীর শ্রদ্ধা করেন সিংঘল। তিনি বললেন, প্রিয়দর্শীও ওবিসি শ্রেণির মানুষ, আমাদের তথ্যচিত্র নির্মাণের কাজে অনেক সাহায্য করতে পারেন তিনি। একবছর আগে রিটায়ার করে এখন সপরিবারে আহমেদাবাদ থাকেন। সম্ভবত আমাদের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সিংঘলের আর কোনো সংশয় ছিল না, তাই বললেন আমাদের সুবিধের জন্য তিনিই 'স্যার' কে আমাদের কথা জানাবেন।

সিংঘলের সঙ্গে এক ঘণ্টা কথা বলার পর নিরাপত্তার চাদরে আবৃত এটিএস সদরদপ্তর থেকে বেরিয়ে এলাম মাইক আর আমি। দু'জনেই চুপচাপ। নিরাপত্তারক্ষীর দিকে তাকিয়ে ঘাড় নাড়ালাম আমরা। এবার সে আমাদের দিকে তাকিয়ে হাসল এবং একটা অটো ডেকে দিল। অটোয় করে এক কিলোমিটার যাওয়ার পর পরস্পরের দিকে তাকিয়ে হাসলাম আমরা। মাইক বলল, 'ব্যাপারটা তাহলে ঠিকঠাক এগুচ্ছে, কী বলো?' আমি মাথা নাড়লাম।

ঠিক করলাম পরের কয়েকটা দিন সিংঘলকে একটু রেহাই দিব। বারবার ফোন করলে মনে হবে আমরা বোধহয় খুব মরিয়া হয়ে উঠেছি। মনে সন্দেহ দেখা দিবে। এর মধ্যে কয়েকটা মেসেজ পাঠিয়ে তাঁকে জানালাম তাঁর সম্বন্ধে কতটা গবেষণা করেছি। রাষ্ট্রের প্রতি তাঁর দায়বদ্ধতায় আমরা মুগ্ধ এটাও জানালাম। আমাদের পরবর্তী সাক্ষাতের দিনটা এসে পড়ল।

ঠিক করলাম এবার একা যাব। রাজনৈতিক নেতাদের সাক্ষাৎকার ও বিভিন্ন কর্মকর্তাদের সঙ্গে অফ-দ্য-রেকর্ড কথা বলার সময় এই শিক্ষাটা পেয়েছিলাম। কম লোক এবং হাতে লিখে নোট নিলেই তাঁরা স্বস্তি পান। কথাবার্তা রেকর্ড করার ব্যাপারে আগের দিনের থেকে বেশি তৈরি হয়ে গিয়েছিলাম। আগের দিন সিংঘলের মনোভাব দেখে মনে হয়েছিল পরবর্তী সাক্ষাতে গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য পাওয়া যেতে পারে। না, সিংঘল আমাকে হতাশ করেনি।

সেদিন বিকেলে বিশেষভাবে তৈরি সবুজ রঙের কুর্তাটা চার্জার পয়েন্ট থেকে সাবধানে খুলে নিলাম। কুর্তাটার ওপরদিকে গাঢ় রঙে কাশ্মীরি এমব্রয়ডারির কাজ। সেখানে একটা ছোট্ট ফুটো আছে যেটার ভেতরে ক্যামেরা লাগানো। একটা সরু তাঁর আরও নীচে নেমে গেছে যেটার সঙ্গে লাগানো আছে ছোট্ট একটা বোতাম। কোনো কিছু রেকর্ড করার সময় এই বোতামটা টিপে অন-অফ করতে হয়। রীতিমত কৌশলী ব্যাপার। বোতাম টিপে ক্যামেরা চালু করলেই একটা লাল আলো জ্বলে ওঠে। ব্যাপারটা আয়ত্ব করার জন্য বিস্তর মকশো করেছিলাম, তবু সারাক্ষণই মনে হত আলো বোধহয় জ্বলেনি। নিশ্চিত হওয়ার জন্য আমার কলমটা কায়দা করে ডেস্ক থেকে ফেলে দিতাম। ঝুঁকে সেটা তোলার সময় চট করে কুর্তার ভেতরে তাকিয়ে দেখে নিতাম লাল আলোটা জ্বলছে কিনা।

সেদিন সদরদপ্তরে পৌঁছাতেই পূর্বে পরিচিতের ভঙ্গিতে ঘাড় নাড়ল নিরাপত্তারক্ষীটি। সে ধরে নিয়েছিল আমি একজন অনাবাসী ভারতীয় চলচ্চিত্রকার। অধিকাংশ অফিসারের কাছে আমার এই পরিচয়ই দিয়েছিল আর্দালিটি। তারপর রক্ষীটি বলল, 'ম্যাডাম, শুটিং নেহি করোগে ক্যা?' ঘাড় নেড়ে বোঝালাম শিগগিরই কাজ শুরু করব।

সিংঘলের কেবিনে ঢোকার সময় ভেবেছিলাম খুশি মনে স্বাগত জানাবেন তিনি। কিন্তু তাঁর মুখ দেখে বুঝলাম কিছু-একটা গণ্ডগোল হয়েছে। তাঁর বসবাসের এলাকার কিছু দুষ্কৃতীর স্টিং ফুটেজ দেখছিলেন তিনি। এটিএস প্রধানের মতো উচ্চপদস্থ অফিসারের কাছে এটা সাধারণ ব্যাপার। কিন্তু না, গণ্ডগোলের ব্যাপারটা ঠিক তা নয়। পুলিশের কিছু কর্মকর্তা তাঁকে ঝামেলায় ফেলার চেষ্টা করছেন।

তবে সেসব বাদ দিয়ে খুব দ্রুতই মূল প্রসঙ্গে চলে এলেন তিনি, হাসিখুশি হয়ে উঠলেন। তাঁর বিষয়ে আমি কী গবেষণা করেছি তা জানতে খুব আগ্রহ দেখালেন। জানতে চাইলেন অন্যদের কাছে তাঁর সম্বন্ধে খোঁজখবর নিয়েছি কিনা এবং তাঁর ব্যাপারে ইতিবাচক মতামত পেয়েছি না। এখন আমাকে লস এ্যাঞ্জেলেস থেকে আসা সরল মেয়েটির অভিনয় শুরু করতে হবে। যার দেশের খবরাখবর সম্বন্ধে কোনো ধারণাই নেই, সামনে বসে থাকা মানুষটির প্রতি সম্ভ্রমে যে অভিভূত, যিনি দেশের সবথেকে মারাত্মক সন্ত্রাসবাদী আক্রমণের হোতাদের শেষ করেছেন। বললাম, 'আপনি দারুণ সাহসী। গুগল সার্চ করে অক্ষরধাম আক্রমণের ব্যাপারটা জানলাম। ওহ্, গায়ে যেন কাঁটা দিয়ে উঠেছিল।' একটা সিগারেট ধরিয়ে আমাকে প্রশ্ন করতে বললেন সিংঘল। কথাবার্তার সূত্রে তাঁর সমস্যাময় জীবন সম্বন্ধে কিছুটা আঁচ পেলাম। বেশিরভাগ উত্তরই একটু রেখে-ঢেকে দিচ্ছিলেন, কিন্তু কথার মাঝে দীর্ঘ নীরবতা, চিন্তান্বিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকা, চিন্তিত ভঙ্গিতে ডেস্কে আঙুল ঠোকা, এসব থেকে অনেক কিছুই আঁচ করা যাচ্ছিল। আমি ভেবেছিলাম খুব সতর্ক হয়ে উত্তর দিবেন তিনি, কিন্তু সম্ভবত একজন নিরীহ সাক্ষাৎকারিণীকে পেয়ে মন খুলে অনেক কথাই বলেছিলেন তিনি।

তাঁর বাড়িতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাইলাম, যেখানে তাঁর পরিবার থাকেন। 'না, না, ওটা করবেন না। ওরা এমনিতেই বেশ বিরক্ত হয়ে আছে। আমি যেকাজ করি, তা ওদের পছন্দ নয়। আমার কাজটাকে ঘৃণা করতে শুরু করেছে ওরা। বাড়িতে পুলিশ ভ্যান এলে একটু দূরে দাঁড় করাতে বলে দিই। দরজার সামনে যেন না আসে।' তিনি এনকাউন্টারের

কথা উল্লেখ করার পর এই বিষয়ে তাঁকে প্রশ্ন করা সহজ হয়ে গেল আমার পক্ষে। তাঁর গ্রেপ্তারির পর এই বই লেখার সময় সিবিআই-এর কাছে নিজের ভূমিকার কথা স্বীকার করেছেন সিংঘল। শুধু তাই নয়, নিজের বিবৃতিতে এবং একটি টেপ করা কথোপকথনে[৪] সাজানো বন্দুকযুদ্ধে ইশরাত জাহানকে হত্যা করার ব্যাপারে রাজ্য সরকারের অনেক কর্মকর্তারা জড়িত থাকারও প্রমাণ দিয়েছেন তিনি। গুজরাট হাইকোর্ট কর্তৃক নিযুক্ত সিবিআই তদন্তের চার্জশিটে বলা হয়েছে, ইশরাত আদৌ লশকর-ই-তয়্যিবার সদস্য ছিলনা এবং সাজানো বন্দুকযুদ্ধের নামে তাকে হত্যা করা হয়েছে।

আদালতে উপস্থাপিত চার্জশিটে[৫] সিবিআই-এর কাছে সিংঘলের দেওয়া যাবতীয় তথ্যপ্রমাণ পেশ করা হয়েছে। লক্ষণীয় বিষয় হল, বড় ছেলে হার্দিকের অকালমৃত্যুর ঠিক পর পরই সিংঘল স্বীকারোক্তি দেন এবং তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। আমার সঙ্গে প্রথমবার দেখা হওয়ার সময় এই ছেলের সম্বন্ধে গভীর স্নেহের সুরে কথা বলেছিলেন তিনি। সংবাদমাধ্যমে বাবার সম্বন্ধে অবিরাম বাজে বাজে কথা শোনার প্রতিক্রিয়ায় ২০১৩ সালে আত্মহত্যা করে হার্দিক। সিংঘলের ঘনিষ্ঠজনদের ভাষায়, এর পরেই তাঁর মনের পরিবর্তন ঘটে। সর্বশেষ খবর হল, পুলিশ বিভাগ থেকে তিনি পদত্যাগ করেছেন। সরকারের তরফ থেকে অনুরোধ আসা সত্ত্বেও পদত্যাগপত্র ফিরিয়ে নিতে রাজি হননি।

এটাও উল্লেখযোগ্য যে সিবিআইকে সিংঘল জানিয়েছিলেন, তিনি রাজসাক্ষী হবেন না। ক্ষমা চেয়ে আবেদনও করবেন না। অধিকাংশ অভিযুক্তের মতো তাঁরও বিচার করা হোক এটাই চান তিনি। অন্যের মনের কথা বোঝা কঠিন। তাঁর সম্বন্ধে যেটুকু জানার আছে, তাঁর ভিত্তিতে শুধুমাত্র অনুমানই করা চলে। সিবিআই-এর কাছে সিংঘলের বিচিত্র অনুরোধের কথা শুনে আমার মন ফিরে গিয়েছিল ২০১০ সালের ডিসেম্বর মাসে আমাদের দু'জনের সেই কথোপকথনে।

জি.এল. সিংঘলের সঙ্গে রেকর্ড-করা কথোপকথনের কিছু অংশ এখানে তুলে ধরলাম:

প্র: গুজরাটে আপনাদের, মানে পুলিশের লোকদের অনেক ঝামেলায় পড়তে হচ্ছে, বিশেষ করে নানান বিতর্কিত বিষয়ে, তাইনা?

উ: এ এক অদ্ভুত অবস্থা। কেউ যদি আমাদের কাছে কোনও অভিযোগ দায়ের করতে আসে আর আমরা যদি সে ব্যাপারে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিই, তাহলে সরকার চটে যায়। আবার সরকারকে সন্তুষ্ট করলে অভিযোগকারী চটে যায়। ফলে আমাদের কিছুই করার থাকে না, সব দায় পুলিশের ওপরেই এসে পড়ে।

প্র: এনকাউন্টারের সঙ্গে জড়িত অধিকাংশ অফিসাররাই দলিত জাতের মানুষ। তাদের বেশিরভাগকেই কি ব্যবহার করার পর ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে রাজনৈতিক ব্যবস্থা?

উ: হ্যাঁ, সবাইকেই, পুলিশ ডিপার্টমেন্টে। এটা একটা পাওয়ারফুল ডিপার্টমেন্ট।

প্র: সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় রাজ্য কিভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে? আর পুলিশ?

উ: দেখুন, গুজরাটে বিভিন্ন দাঙ্গার সময় আমি কাজ করেছি। ১৯৯১ সাল থেকে এখানে আছি আমি। ফলে অনেক দাঙ্গা দেখেছি। ৮২, ৮৩, ৮৫, ৮৭ আর ৯২ সাথে অযোধ্যা পরবর্তী দাঙ্গা দেখেছি আমরা। আমার মতে মুসলিমরাই বেশি আগ্রাসী। ২০০২ সালে বহু মুসলিম খুন হয়েছিল। মুসলিমদের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা ভিন্নরকম। বিশেষত ২০০২-তে ব্যাপারটা এরকমই ছিল। মুসলিমরা বহু বছর ধরে হিন্দুদের খুন করছিল, ফলে ২০০২ এর ব্যাপারটা ছিল মুসলিমদের হাতে এতদিন ধরে মার খাওয়ার প্রতিশোধ। যখনি মুসলিমরা খুন হল অমনি সারা দুনিয়ায় হৈচৈ বেধে গেল। কিন্তু যে পরিস্থিতিতে হিন্দুদের খুন হতে হচ্ছিল, সেটা কেউ দেখলো না।

প্র: রাজন প্রিয়দর্শীর সঙ্গে দেখা করেছি আমি– দলিত হিসেবে যার সঙ্গে আমাকে দেখা করতে বলেছিলেন আপনি।

উ: আমি অনেক পদে কাজ করেছি, এ রাজ্যের প্রায় সব অফিসারকেই চিনি। গোটা একটা ব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দুতে আছি, ফলে সম্ভবত সবার সঙ্গেই কাজ করেছি, কিন্তু তাঁর মতো মানুষ

আর দেখিনি। অত্যন্ত নীতিনিষ্ঠ অফিসার। পুলিশের কাজটা খুব ভালো বোঝেন তিনি।

প্র: উনি বলছিলেন সরকার তাকে অনৈতিক কিছু কাজ করতে বলেছিল, কিন্তু উনি রাজি হননি।

উ: একদম ঠিক। ওসব কখনো করেননি তিনি। তাকে আমি জানি।

প্র: কোনো সমঝোতা না করেও এই ব্যবস্থার অংশীদার থাকাটা কি সত্যিই খুব কঠিন?

উ: একবার সমঝোতা করলে সবকিছুরই সমঝোতা করতে হবে নিজের সঙ্গে, নিজের চিন্তাভাবনার সঙ্গে, বিবেকের সঙ্গে।

প্র: গুজরাটে একজন অফিসারের পক্ষে নিজের বিবেকবোধ নিয়ে টিকে থাকাটা কি খুব কঠিন?

উ: খুব, খুব কঠিন। আর আইন জানা কোনো সিনিয়র অফিসার সমঝোতা করতে শুরু করলে ব্যাপারটা খুব কঠিন হয়ে পড়ে।

প্র: আপনার ক্ষেত্রে কি সেটাই ঘটেছে? কতটা লড়াই করতে হয়েছে আপনাকে?

উ: কেউ কেউ লড়ার চেষ্টা করে। কেউ কেউ আমৃত্যু লড়াই করে যায়। প্রিয়দর্শী এরকমই একজন লোক।

প্র: আপনার ব্যাপারটা বলুন।

উ: আমাকেও লড়তে হয়েছে।

প্র: কিন্তু এই ব্যবস্থা কি আপনাকে সাহায্য করেছে?

উ: না, এতটুকুও নয়। আমি দলিত হলেও যেকোনো ব্রাহ্মণের মতো সব কাজই করতে পারি। আমার ধর্মকে আমি ওদের থেকে বেশি করে জানি, কিন্তু লোকে সেটা বুঝতে চায় না। আমি যে দলিত পরিবারে জন্মেছি, সেটা কি আমার দোষ?

প্র: আচ্ছা, কখনো কি এমন হয় যে, আপনি প্রোমোশনের যোগ্য সত্ত্বেও দলিত বলে আপনাকে প্রোমোশন দেওয়া হয়নি?

উ: বহুবার এমন হয়েছে। অনেক রাজ্যেই এটা হওয়ার কারনে গুজরাটেও এমন হয়। ওইসব ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয়রা কোনো দলিত কিংবা ওবিসিকে জুনিয়র হিসেবে চায় না।

প্র: আপনার সিনিয়রও কি একজন দলিত?

উ: না, তবে আমি চালিয়ে যাচ্ছি, আমাকে ছাড়া ওদের চলবে না। ওদের হয়ে বহু সন্ত্রাসী ঘটনার মোকাবিলা করেছি আমি। তবে হ্যাঁ, ওরাও একেবারে ছেড়ে দেয় না, অনেক সময় এমন অনেক কাজে আমাকে পাঠায় যেটা কনস্টেবলরাই করতে পারে।

প্র: উষা (রাডা; পঞ্চম পরিচ্ছেদে এঁর সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে জানা যাবে) আমাকে বলেছিলেন আপনি নাকি কিছু বিতর্কিত ব্যাপারেও জড়িয়ে পড়েছিলেন?

উ: ২০০৪ সালে চারজনকে এনকাউন্টারে মেরে ফেলি আমরা। দু'জন ছিল পাকিস্তানি, দু'জন মুম্বাইয়ের। এদের মধ্যে একজন ছিল মেয়ে, নাম ইশরাত জাহান। ঘটনাটা খুব চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল। হাইকোর্ট তদন্ত করে দেখতে বলেছিল কী ধরনের এনকাউন্টার ছিল ওরা সাজানো না আসল।

প্র: তাঁর মানে ওটা কি সাজানো এনকাউন্টার ছিল? তাহলে এর মধ্যে আপনার নাম জড়াল কেন?

উ: কারণ ওই এনকাউন্টারে আমি ছিলাম।

প্র: কিন্তু এখানে আপনার নামটা জড়াচ্ছে কেন?

উ: দেখুন, মানবাধিকার কমিশনগুলোর কাজই হল এই। কিছু ঘটনার মোকাবিলা করা কঠিন হয়, অন্যভাবে মোকাবিলা করতে হয় সেগুলোর। ৯/১১ এর পরে আমেরিকা কী করেছে ভাবুন। গুয়ান্তানামো বলে একটা জায়গা ছিল। সেখানে ওদের আটকে রেখে টর্চার করত। সবার ওপর অবশ্য টর্চার করা হয়নি। ১০ শতাংশ লোকের ওপর টর্চার করা হয়েছে, এমনকী তাঁরা যদি না-ও করে থাকে, ১ শতাংশ হয়তো ভুল করেছে। জাতিকে বাঁচানোর জন্য, দেশকে বাঁচানোর জন্য এমনটাই করতে হয়।

প্র: ওরা কারা ছিল? লশকর জঙ্গি?

উ: হ্যাঁ।

প্র: মেয়েটাও ? মানে ইশরাত জাহান?

উ: ও তা ছিল না, কিন্তু ওই ঘটনাতেই ও মারা যায়। মানে ও জঙ্গি হতেও পারে, নাও হতে পারে। কিংবা ওকে হয়তো একটা কভার হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছিল।

প্র: আপনারা সবাই, বানজারা, পান্ডিয়ান, আমিন, পারমান আর অন্য প্রায় সবাই দলিত জাতির মানুষ। রাজ্যের নির্দেশেই আপনারা সবকিছু করেছেন। তাঁর মানে এটা কি ব্যবহার করার পর ছুঁড়ে ফেলে দেওয়ার ব্যাপার?

উ: ঠিক, আমাদের সবার সঙ্গে এটাই ঘটেছে। সরকার অবশ্য তা ভাবে না। ওরা ভাবে আমরা ওদের কথা শুনতে বাধ্য এবং ওদের প্রয়োজন মেটাতে প্রস্তুত। প্রতিটি সরকারি কর্মচারী, যেকাজই সে করুক না কেন, সরকারের জন্যেই কাজ করে।

তারপর সমাজ বা সরকার কেউই তাকে চিনতে পারে না। বানজারা সেটিই করেছে, (কিন্তু) কেউ তাঁর পাশে দাঁড়ায়নি।

প্র: কিন্তু স্যার, আপনারা যা করেছেন তা সবই তো সরকারের নির্দেশে, রাজনৈতিক শক্তিগুলোর নির্দেশে, তাহলে তাঁরা কেন...??

উ: সিস্টেম কে সাথ রহেনা হ্যা তো লোগোঁ কো কম্প্রোমাইজ করনা পড়তা হ্যায়।

প্র: কিন্তু প্রিয়দর্শী কি সরকারের কাছের মানুষ ছিলেন না?

উ: তিনি সরকারের কাছের মানুষ ছিলেন, কিন্তু তাকে অন্যায় কিছু করতে বললে কখনোই রাজি হতেন না।

প্র: তিনি আমাকে বলছিলেন তাকে একটা এনকাউন্টার করতে বলা হয়েছিল, যাঁদের মধ্যে পি. পান্ডিয়ানও ছিলেন। কিন্তু উনি (প্রিয়দর্শী) তাতে রাজি হননি।

উ: পান্ডিয়ানও এখন জেলে, তবে তাঁর সম্বন্ধে তেমন কিছু জানি না।

প্র: উনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর এত কাছের লোক হলেন কীভাবে?

উ: এটিএসএ আসার আগে ইনটেলিজেন্স ডিপার্টমেন্টে ছিলেন উনি।

প্র: দেখুন, আমি জানি মুখ্যমন্ত্রী আর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দু'জনেই চেষ্টা করছেন। তাহলে এখন কি আপনাদের কিছুটা সুবিধে হয়েছে?

উ: কিছু কিছু জিনিস আমাদের হাতে নেই। আমরা এই ব্যবস্থার জন্যে কাজ করছি।

প্র: আপনি কি ওদের নজরে আছেন, নাকি কেস মিটে গেছে?

উ: কেস এখনও চলছে। জোরেসোরেই চলছে।

প্র: রাজ্য কি আপনাকে সাহায্য করছে?

উ: দেখুন, কংগ্রেসই হোক কি বিজেপি-ই হোক, রাজনৈতিক দল মানে রাজনৈতিক দলই। ওরা প্রথমে নিজেদের লাভটা দেখে। কীভাবে কিছু আদায় করে নেওয়া যায়, সেটাই ভাবে। আমাদের কেসে ওরা আমাদের সাহায্য করছে ঠিকই, কিন্তু সেইসঙ্গেই বুঝতে চেষ্টা করছে এ থেকে কী পাবে না-পাবে। হিসাব করছে ফলাফল উল্টে গেলে এ থেকে কী কী ফায়দা তুলতে পারবে। আমাদের এনকাউন্টারে তদন্ত করছে যারা তাদের কথা একবার ভাবুন। কার্নেইল সিং, যিনি দিল্লি পুলিশের জয়েন্ট কমিশনার ছিলেন, তাঁকে স্পেশাল সেলের দায়িত্ব দিয়ে মিজোরামে বদলি করে দেওয়া হয়েছিল। ওঁর আমলে ৪৪ টি এনকাউন্টার হয়েছিল। আর এখন উনি আমাদের সিট-এর চেয়ারম্যান।

তারপর সতীশ ভার্মা নামে একজন অফিসার আছেন, তিনি আবার মানবাধিকারের অনুগামী বলে দাবী করেন, (কিন্তু তিনি) প্রায় ১০ টা এনকাউন্টার করেছেন। এমন ভাব দেখান যেন উনি একেবারে ধোয়া তুলসীপাতা।

প্র: ফলাফল কী হবে?

উ: দেখা যাক। কিছুই বের হবে না।

প্র: কিন্তু আপনি আর অন্য বেশ কিছু অফিসার তো সোহরাব উদ্দিনের ঘটনাতেও যুক্ত ছিলেন, তাই না?

উ: হ্যাঁ।

প্র: আমি গীতা জোহরির সঙ্গে দেখা করেছি।

উ: হ্যাঁ, উনি একটা চমৎকার অনুসন্ধান করেছিলেন, পরে রজনীশ রাইও করেছেন। খুব ভালো কাজ করেছেন ওঁরা। নিজেরাই প্রায় ১৩ জন লোককে গ্রেপ্তার করেছিলেন।

প্র: কিন্তু এই অমিত শাহের ব্যাপারটা কী? আপনার অফিসারদের সম্বন্ধেও শুনেছি...: মানে, অফিসার আর রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে একটা যোগসাজশ আছে, বিশেষত এনকাউন্টারের ব্যাপারে। অন্য বেশ কিছু মন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলার সময় এমনটাই মনে হয়েছে আমার।

উ: দেখুন, এমনকী মুখ্যমন্ত্রীও এর মধ্যে আছে। সমস্ত সরকারি আধিকারিকরা আর মন্ত্রীরাও আছেন। এরা হচ্ছে স্রেফ রাবার স্ট্যাম্প। সব সিদ্ধান্ত মুখ্যমন্ত্রীই নেন। অন্য সব মন্ত্রীরা যে সিদ্ধান্তই নিক না কেন, মুখ্যমন্ত্রীর অনুমতি নিতেই হবে।

প্র: তাহলে ওঁর গায়ে কোনো আঁচড় লাগল না কেন? আপনাদের কেসের ক্ষেত্রেও তো তাই। এই একই কেসে তাকেও অভিযুক্ত করা হল না কেন?

উ: উনি তো সরাসরি মাঠে নামেন না, আমলাদের নির্দেশ দেন।

প্র: আপনাদের কেসে অমিত শাহ যদি গ্রেপ্তার হতে পারেন, তাহলে সেই বিচারে মুখ্যমন্ত্রীকেও তো গ্রেপ্তার করা উচিত ছিল।

উ: হ্যাঁ।

২০০৭ সালে, সোহরাব উদ্দিনের এনকাউন্টারের সঙ্গে জড়িত অফিসাররা গ্রেপ্তার হওয়ার ঠিক পরেই, সোনিয়া গান্ধী এখানে আসেন এবং ওই অফিসারদের 'মউত কে সওদাগর' নামে অভিহিত করেন তিনি। তারপর থেকে প্রতিটা মিটিংয়ে মোদি চিৎকার করে বলতেন, 'মউত কে সওদাগর? সোহরাব উদ্দিন

কে? তাকে মারা ভালো ছিল না খারাপ ছিল?' তারপর তো উনি বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করলেন। মানে উনি যা চাইছিলেন তাই পেয়ে গেলেন।

প্র: আর যেসব অফিসারদের দিয়ে কাজটা করিয়েছিলেন, এখন কি তাঁদের তিনি সাহায্য করছেন?

উ: না, তাঁরা এখন জেলে আছে।

প্র: উনি কি আপনাকে কখনও আপনার এনকাউন্টারগুলো নিয়ে কোনো প্রশ্ন করেছেন?

উ: না, কখনো না। দেখো ইনকো সবকা বেনিফিট লেনা হোতা হ্যায়, রায়টস হুয়ে মুসলিমস কো মারা, বেনিফিট লিয়া, ইসপার ভি কিয়া।

প্র: অমিত শাহ কি এখন আবার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রনালয়ে ফিরে আসবেন?

উ: না, সেটা পারবেন না, কারণ সিএম কো উসসে ডর লাগতা হ্যায়, কিঁউকি উয়ো হোম ডিপার্টমেন্ট মেঁ বহুত পপুলার হো গয়া থা। সরকারের দুর্বলতাগুলো উনি জানেন। মুখ্যমন্ত্রী কখনোই চাইবেন না স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সবকিছু জেনে ফেলার পরও মন্ত্রীত্বে থাকুক।

প্র: তাঁর মানে মুখ্যমন্ত্রী আর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর মধ্যে এখন আর কোন সম্পর্কই নেই?

উ: না। এই মুখ্যমন্ত্রী, মোদি, জৈসে আভি আপ বেলা রহে থে, উয়ো অপরচুনিস্ট হ্যা। আপনা কাম নিকাল লিয়া, নিজের কাজটা করিয়ে নিয়েছেন।

প্র: নিজের নোংরা কাজটা?

উ: হ্যাঁ।

প্র: আচ্ছা, এই এনকাউন্টারটা বাদে আর ক'টা এনকাউন্টার করেছেন আপনি?

উ: উঁ.... প্রায় ১০টা....

প্র: সবগুলোই কি দারুণ ঘটনা? আমি জানতে পারি?

উ: না না।

সমস্ত দৈনিক সংবাদপত্রের গুজরাট সংস্করণে সাজানো বন্দুকযুদ্ধের তদন্তের ব্যাপারটা হেডলাইন হয়ে গিয়েছিল। ফলে সিংঘলের মনে কোনো সন্দেহ না জাগিয়ে প্রশ্ন করা সহজ হয়েছিল আমার পক্ষে। বারবার

সিংঘলের সঙ্গে দেখা করতে করতে আমার মনে একটা অপরাধবোধ দেখা দিল। ওঁর প্রতি একটা সহানুভূতি অনুভব করতে শুরু করলাম। আমাকে তিনি যেমনটা বিশ্বাস করাতে চাইছেন, সত্যিই কি তিনি তাই? অর্থাৎ তিনি কি সত্যিই নিরপরাধ, যাঁকে এই ব্যবস্থা ভুলভাবে কাজে লাগিয়ে নিয়েছে? নিজের অবস্থা বোঝানোর জন্য নানান উদাহরণ দিতেন তিনি, সিনেমার বিভিন্ন চরিত্রের কথা বলতেন। কথোপকথন চলতে চলতে ভগবদ গীতার শ্লোক থেকে শুরু করে তাঁর ধর্মনির্ভরতার প্রসঙ্গও এসে পড়ত। ওশোকে নিয়ে, এমনকী আমার সিগারেট খাওয়া নিয়েও আলোচনা হত। তিনি বলতেন, 'পারলে ওটা ছেড়ে দিন। অভ্যেসটা মোটেই ভালো নয়।' আমার সঙ্গে একটা বন্ধুত্বের সম্পর্ক তৈরি হচ্ছিল। আমি একজন বাইরের লোক। ভিতরের লোকের দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁকে বিচার করতে তো যাইনি আমি।

মানুষটা ঠিক কেমন বুঝে উঠতে কষ্ট হচ্ছিল। একদিন ওঁর কাছ থেকে হোস্টেলে ফিরে সোজা পাবলিক বুথে গেলাম। নিজেকে ভীষণ বিভ্রান্ত লাগছিল। ঠিক করলাম আম্মার সঙ্গে এ নিয়ে কথা বলব। সিংঘলের প্রতি সহানুভূতি অনুভব করছি আমি। এটা আমি করতে পারি না। আগে যেসব অফিসারদের দেখেছি, তাদের মতো নির্লজ্জ নন সিংঘল। ঠান্ডা মাথায় খুন করা আর এনকাউন্টারের কথা বড়াই করে বলেন ওইসব অফিসাররা। কিন্তু কেউ যদি ঠান্ডা মাথায় খুনের অংশীদার হয়ে থাকেন, অথবা যদি সত্যটা এড়িয়ে যেতে চান, তাহলে তো আর তাঁর কাজের ন্যায্যতা প্রতিপন্ন হয় না। মা সেদিন বলেছিলেন লোকে তাদের আচরণের, তাদের কাজকর্মের বহু কারণ দেখাতে পারে। তোমাকে খুঁজে দেখতে হবে তাঁরা ঠিক কী করেছিল, তাহলেই বুঝতে পারবে এইসব কাজের জন্য তাঁরা যে যুক্তি দেখাচ্ছে তাঁর আদৌ কোনো মূল্য আছে কি না।

এত বছর ধরে এ ব্যাপারে চুপ থাকার দরুন এই অপরাধে সিংঘলও অন্যদের মতোই অপরাধী এটা স্পষ্ট বুঝতে পারছিলাম। একই সঙ্গে বোঝা যায়, এই ধরনের পুলিশ অফিসারদের কতটা নির্লজ্জভাবে ব্যবহার করেছে রাজ্য প্রশাসন। আমার গোপন ক্যামেরায় সিংঘলের বলা 'ব্যবহার

করো এবং ছুঁড়ে ফেলো' নীতির কথা কয়েক বছর পর আর একজন উচ্চপদস্থ অফিসার ডি.জি. বানজারার বক্তব্যেও ফুটে উঠেছিল। মোদির আমলের একজন উচ্চপদস্থ অফিসার বানজারাকে চারটি সাজানো বন্দুকযুদ্ধে তাঁর ভূমিকার কারণে জেলে যেতে হয়েছে। এইসব ঘটনা সম্পর্কে সিংঘল যা বলেছিলেন, হুবহু সেই একই কথা বলে গুজরাট রাজ্য সরকারের কাছে একটা চিঠি[৬] লিখেছিলেন বানজারা। চিঠিতে তিনি বলেছিলেন, অমিত শাহের মতো মন্ত্রীদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য তাঁদের মতো অফিসারদের ব্যবহার করা হয়েছে। যে মানুষটিকে তিনি ঈশ্বর বলে মনে করতেন, সেই মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি তাঁর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। বানজারার (তিনি ততদিনে রাজ্য আইপিএস থেকে পদত্যাগ করেছিলেন) বিবৃতির পিছনে কোনো রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল কিনা, তা নিয়ে ধোঁয়াশা আছে। তবে মূল সত্যটা হল, যে রাজ্যকে এখন সন্ত্রাসমুক্ত রাজ্য হিসেবে দাবি করা হচ্ছে, তাঁর বেদিমূলে বানজারা ও সিংঘলের মতো বহু অফিসারকে ব্যবহার করা হয়েছে।

সিংঘল কোনো ব্যতিক্রম নন, বরং সেই নিয়মেরই অঙ্গ। পরবর্তী সময়ে এই সত্যটা আমি জানতে পারি তাঁর সিনিয়র রাজন প্রিয়দর্শী, রাজ্যের একজন সাবেক পুলিশ কমিশনার এবং অন্যান্য আমলাদের কাছ থেকে।

সত্যের সন্ধান সবেমাত্র শুরু হয়েছে....

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

রাজন প্রিয়দর্শী

কর্পোরেট জগতে 'টেকঅ্যাওয়ে' একটা শব্দ আছে, যার অর্থ হল কোনো কনফারেন্স, মিটিং বা আলোচনার পর লাভজনক কিছু নিয়ে আসা। রাজন প্রিয়দর্শী আমার কাছে হঠাৎ পাওয়া একজন 'টেকঅ্যাওয়ে'ই ছিলেন। এই অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসারটির কাছ থেকে আমার অনুসন্ধানের ব্যাপারে যে বিপুল সাহায্য পেয়েছিলাম তাকে দৈবী অবদানও বলা যেতে পারে। তাঁর জুনিয়র গিরিশ সিংঘলের সঙ্গে কথা বলার সময় তিনি রাজন প্রিয়দর্শীর নাম না বলা পর্যন্ত এই নামের কোনো পুলিশ অফিসারের কথা যে আমি জানতাম না, তা অস্বীকার করার উপায় নেই। গুজরাট থেকে প্রচুর রিপোর্ট পাঠিয়েছি আমি, সেখানকার অধিকাংশ পুলিশ অফিসারকেই জানতাম, অথবা জানি বলে ভাবতাম। না, খুব বেশি পুলিশ অফিসারের সঙ্গে আমার দেখা হয়নি। তবে বিভিন্ন খবরের রিপোর্ট আর পুলিশের অনেকের সাক্ষাৎকার নেওয়ার ফলে মনে হত সংশ্লিষ্ট সকলের সম্বন্ধেই যথেষ্ট তথ্য আমার জানা আছে।

সিংঘল যখন আমার সম্পূর্ণ অজানা এই নামটা উচ্চারণ করেছিলেন, তখন অবাক না হয়ে পারিনি। সিংঘলের সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার আগে তাঁর সম্পর্কে কোনো গবেষণাই করা হয়নি। সিংঘলের মনে যাতে কোনো সন্দেহ দেখা না দেয়, এজন্যই এমনটা করেছিলাম, তাঁর উপদেশ অনুসারেই চলব এমনটা দেখিয়ে তাঁকে হাতে রাখতে চেয়েছিলাম। সিংঘল শুনে স্বস্তি পেয়েছিলেন যে, অন্য পুলিশ অফিসারদের সঙ্গেও দেখা করছি আমি। বিশেষত যাঁরা বিতর্কিত নন, খবরের কাগজে যাঁদের নাম ওঠেনি তাঁদের সঙ্গেও দেখা করেছি। রাজন প্রিয়দর্শীর ব্যাপারে আর একটা তথ্যও খুব উল্লেখযোগ্য। ২০০৪ সালের জুন মাসে টাইমস অফ ইন্ডিয়াকে দেওয়া একটা সাক্ষাৎকারে ১৯৮০-র ব্যাচের আইপিএস অফিসার প্রিয়দর্শী বলেছিলেন, রাজ্যের এত উচ্চপদস্থ একজন অফিসার হওয়া সত্ত্বেও গ্রামে

আজও তাঁকে অচ্ছুত হিসেবেই গণ্য করা হয়। টাইমস্ অফ ইন্ডিয়ার রিপোর্টে লেখা হয়েছিল:

বিভিন্ন পেশার বহু মানুষ হামেশাই নানান সমস্যা নিয়ে করজোড়ে হাজির হয় তাঁর কাছে। কিন্তু এই প্রিয়দর্শীই যখন দেহগাম তালুকে তাঁর নিজের গ্রাম কাদাগ্রা-য় যান, সমীকরণটা তখন আমূল পাল্টে যায়। গ্রামের উচ্চ বর্ণের লোকেরা যে এলাকায় থাকে, সেখানে আজও এই সিনিয়র পুলিশ অফিসার কোনো বাড়ি কিনতে পারেন না। আজও তাঁর বাড়ি কাদাগ্রা-র 'দলিত বাস' এ। প্রিয়দর্শী নিজে এ বিষয়ে কিছু বলতে না চাইলেও, বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যায় যে, গত বছর অবধি গ্রামের নাপিতও কোনো দলিত খরিদ্দারের চুল দাড়ি কাটতে রাজি হত না।

চলচ্চিত্র নির্মাণের দৃষ্টিকোণ থেকে এই বিষয়টা আমার কাজকে অনেক সহজ করে দিয়েছিল। তাছাড়া অনুসন্ধানের শেষে এমন বিস্তর তথ্য পাওয়া গিয়েছিল, যা থেকে বোঝা যায় যে-সব অফিসারদের প্রশাসন কাজে লাগিয়েছে এবং পরে দুর্ব্যবহার করেছে, তাঁরা সকলেই দলিত শ্রেণির মানুষ। ওহো, একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বলা হয়নি। ২০০৭ সালে গুজরাটের সিআইডি যখন সাজানো বন্দুকযুদ্ধগুলি তদন্তের ভার নেয়, রাজন প্রিয়দর্শী তখন গুজরাট এটিএস-এর ডিরেক্টর জেনারেল ছিলেন। শুধু তাই নয়, ২০০২ সালে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় রাজকোটের আইজি ছিলেন তিনি, যেটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদ।

আমি আর মাইক রাজন প্রিয়দর্শীর সঙ্গে দেখা করলাম। এই ষাটোর্ধ্ব ব্যক্তিটির সঙ্গে প্রথম দেখা হওয়ার দিনটা আমরা দু'জনেই বোধহয় কোনোদিনই ভুলতে পারব না। আহমেদাবাদ-নারোডা পটিয়ার মধ্যবিত্ত এলাকায় একটি দোতলা বাংলো ছিল তাঁর। ওই বিধানসভা ক্ষেত্রেরই বিধায়ক ছিলেন আমাদের আর একজন উদ্দিষ্ট ব্যক্তি মায়া কোদনানি। আবার ওই এলাকাতেই সবথেকে ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ঘটেছিল এবং সবথেকে বেশি ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল।

প্রিয়দর্শীর বাড়ি খুঁজে বের করতে বেশ বেগ পেতে হল আমাদের। এটিএস-এর প্রাক্তন প্রধান, ৩০ বছরেরও বেশি সময় ধরে গুজরাটের নানান জায়গায় বিভিন্ন পদে থেকেছেন যিনি, তিনি এমন একটা জায়গায় বাস করবেন সেটা ভাবাই যায় না। ওই এলাকায় একটা সরকারী স্কুল আছে, বেশ কয়েকটা পাড়া ও নালা পেরোতে হয়। এলাকার অনেকেই তাঁকে চেনেই না। তবে তাঁর প্রতিবেশীরা বলল, হ্যাঁ, উনিই সেই পুলিশ অফিসার যিনি বাড়ির দরজার সামনে নিজের একটা বাঁধানো ছবি টাঙিয়ে রাখেন।

আমাদের জন্য উৎকণ্ঠিতভাবে অপেক্ষা করছিলেন তিনি। তাঁর বাড়ির গলিতে আমাদের ট্যাক্সি ঢুকতেই হাত নাড়লেন। বাড়ির দোতলা থেকে বলে উঠলেন, 'আসুন, আসুন'। দু'জন ভেতরে ঢুকে চারপাশে তাকালাম। দরজার সামনেই একটা ফলকে লেখা আছে সারা জীবনে যেসব পদে কাজ করেছেন প্রিয়দর্শী। আমরা ঢোকার পর গ্রাম্য পালোয়ানোর মোত গোঁফ আর ধূসর দাড়িওয়ালা একজন বিশালদেহী ভদ্রলোক আমাদের সঙ্গে করমর্দন করলেন। দুটো সুতির শাল, কলম আর নোটবুক দেওয়া হল আমাদের।

পরবর্তী কয়েক মিনিটে যা ঘটল তা প্রায় অভাবনীয়। দেখামাত্রই মাইককে পছন্দ হল প্রিয়দর্শীর। লেবুর শরবত এল। এত সৌজন্যের ধাক্কা সামলে ওঠার আগেই ১০ বছর বয়সী একটি ছেলেকে নিয়ে ঘরে ঢুকলেন ত্রিশ বছর বয়সী একজন ভদ্রলোক। এঁরা হচ্ছেন প্রিয়দর্শীর ছেলে আর নাতি, নাতিটির হাতে একটা ডিজিটাল ক্যামেরা। 'রোজ রোজ তো আর বিদেশী ফিল্মমেকাররা আমাদের বাড়িতে আসেন না। এটা আমাদের বিরাট সম্মানের ব্যাপার। প্লিজ, একটা ছবি'—ওঁরা বললেন।

ছদ্ম পরিচয়ে থাকাবস্থায় সবার নজরে পড়া কিংবা নিজের ছদ্ম পরিচয়ের কোনো চিহ্ন রেখা যাওয়া একবারেই অনুচিত। তাছাড়া ফলকে প্রিয়দর্শীর ক্যারিয়ারের সালতামামি দেখে মনে হল ভদ্রলোক আমাদের কাজে লাগবেন। ওঁর নাতির ইচ্ছেয় সম্মতি জানালাম মাইক আর আমি, বসার ঘরে যাওয়ার আগে দুটো ছবি তোলা হল আমাদের। বসার ঘরে রাজ্যের

ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের সঙ্গে এবং সাবেক প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর সঙ্গে প্রিয়দর্শীর একটা ছবি রাখা আছে।

মজা করার ছলে বললাম, 'তাহলে আমাদের ছবিও বাঁধিয়ে রাখবেন নাকি, স্যার?' আসলে জানতে চাইছিলাম ঠিক কী উদ্দেশ্যে আমাদের ছবি তোলা হল। উত্তরে জানা গেল উনি একটা স্থানীয় মাসিক সংবাদপত্র বের করে চেনাজানা লোকদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণ করেন। শুনে স্বস্তি পেলাম। আমি বললাম, আমাদের গুজরাট সংক্রান্ত চলচ্চিত্রে সবার ছবি তোলা হয়ে যাওয়ার পর যেন আমাদের ছবি কাগজে ছাপানো হয়। বললাম, 'আসলে স্যার, আমরা চাইনা অপ্রয়োজনে আমাদের দিকে লোকের নজর পড়ুক। নিজেদের একটু আড়ালেই রাখতে চাই আমরা।' খুশিমনেই কথাটা মেনে নিলেন উনি।

কথোপকথন যা হল সেটা আসলে তিনি একাই বলে গেলেন।

ঘন্টাখানেকের মধ্যেই উপলব্ধি করলাম, তাঁর জীবনী লেখার পক্ষে যথেষ্ট তথ্য জুগিয়েছেন প্রিয়দর্শী। সব দিক থেকেই তিনি এক বিশিষ্ট চরিত্র, যে ধরনের চরিত্র সিনেমা বা উপন্যাসে দেখা যায়। তবে গুজরাটে রাষ্ট্রযন্ত্র কীভাবে কাজ করে সে বিষয়েও খুব প্রাসঙ্গিক তথ্য জানা গেল তাঁর কাছে। গুজরাটের সীমান্তবর্তী এলাকায় বাড়ি করতে হয়েছিল তাঁকে। শুনে রীতিমতো চমকে উঠলাম। নিজের দলিত পরিচিতিটা সারাক্ষণই তাড়া করে বেরিয়েছে প্রিয়দর্শীকে। গুজরাট পুলিশে চাকরি করার সময় সিনিয়রদের নোংরা কাজগুলো করানো হত তাঁকে দিয়ে। কিন্তু তিনি হুকুম মানতে অস্বীকার করেন। 'বড়ো অদ্ভুত ব্যাপার, বুঝলেন। আপনি যদি দলিত হন, তাহলে অফিসে যে কেউ আপনাকে যা খুশি বলতে পারে। কোথাও এতটুকু সম্মান নেই। অর্থাৎ, কোনো দলিত অফিসারকে ঠাণ্ডা মাথায় খুন করতে বলাই যায়, কেননা তাঁর কোনো আত্মসম্মানবোধ নেই, কোনো আদর্শ নেই। গুজরাট পুলিশে উঁচু জাতের লোকেরাই (সবার) নেকনজরে থাকে।'

আমাদের দেখাসাক্ষাৎ যতই এগোতে লাগল, প্রিয়দর্শী যেন ততই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠতে লাগলেন। কিন্তু ততদিনে তিনি অনেক কিছু বলে ফেলেছেন। আমাদের সাক্ষাতের তৃতীয় দিন তাঁর কাছে আমি একাই গেলাম। আসলে মাইককে সেদিনটা রেহাই দিয়েছিলাম যাতে সে মায়া কোদনানির অফিসে গিয়ে আমাদের শুটিংয়ের আগে একটু দেখেশুনে আসতে পারে। প্রস্তাবটা মাইক নিজেই দিয়েছিল। 'আমরা যে সত্যিই ফিল্মমেকার সেটা ওদের বিশ্বাস করানোর জন্য কিছু করলে ভালো হয় না?' কোদনানির অফিসের কর্মচারীরা সাগ্রহে ওকে চারপাশ ঘুরিয়ে দেখিয়েছিল। সন্ধ্যের সময় কোদনানির কাছ থেকে একটা মেসেজ পেলাম: বাড়ির কোনো বিশেষ জায়গায় আমি শুটিং করতে চাই কিনা এবং একটা রবিবার তাঁর সঙ্গে লাঞ্চ করতে আগ্রহী কিনা। তৎক্ষণাৎ 'হ্যা' লিখে উত্তর পাঠিয়ে দিলাম।

সেদিন প্রিয়দর্শীর বাড়িতে পৌঁছে দেখলাম তিনি তাঁর নিজের সংবাদপত্রের বিভিন্ন সংখ্যা উল্টে পাল্টে দেখছেন। আমাকে বললেন, 'আপনার প্রয়োজন মতো যে কোনো কাগজ এখান থেকে নিতে পারেন। আমার ব্যাপারে সব কথা তো এতদিনে জেনেই গেছেন। শুটিং শুরু করবেন কবে থেকে?' তাঁর হাবভাব থেকেই বোঝা যাচ্ছিল বেশ উৎকণ্ঠিত হয়ে আছেন। একটু বেশিই বলে ফেলেছেন তিনি। রাজ্য এটিএসের প্রধানের পদে থাকার সময়কার নানান খুঁটিনাটি বিষয়, তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের বাংলোয় গভীর রাতে গোপন মিটিং, এই অমিত শাহ-ই একবার তাকে পুলিশ হেফাজতে থাকা একজন আসামিকে হত্যা করতে বলেছিলেন– অনেক কথা বলে ফেলেছেন তিনি। রাজন প্রিয়দর্শীর সঙ্গে প্রতিবার দেখা হওয়ার পর আরও বেশি তথ্য নিয়ে ফিরতাম।

প্র: মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি তো গুজরাটে খুব জনপ্রিয়, তাই না?

উ: হ্যাঁ, উনি সবাইকে বোকা বানান আর লোকেও বোকা বনে।

প্র: তাই যদি হয়, তাহলে তাঁর অধীনে এডিশনাল ডিজি হিসেবে কাজ করতে গিয়ে আপনাকে নিশ্চয়ই অনেক ঝামেলায় পড়তে হয়েছে?

উ: আমাকে দিয়ে বেআইনি কোনো কাজ করানোর সাহস ওদের ছিল না।

প্র: এখানে একেবারে অরাজক অবস্থা চলছে, না? ন্যায়পরায়ণ অফিসার কি একেবারেই নেই?

উ: খুব কমই আছে। এই নরেন্দ্র মোদিই সারাটা (রাজ্য) জুড়ে মুসলিমদের হত্যার জন্য দায়ী।

প্র: আচ্ছা, আমি শুনেছিলাম পুলিশরাও নাকি সরকারের ধামাধরা?

উ: প্রত্যেকেই। যেমন ওই পি.সি. পান্ডে। সবকিছু তো ওদের চোখের সামনেই ঘটেছে।

প্র: অধিকাংশ অফিসারই দাবি করছেন তাদের নাকি ভুলভাবে ব্যবহার করা হয়েছে?

উ: কীসের ভুলভাবে! ওরা ওইসব কাজ করেছে বলেই তো আজ জেলখানায় পচছে। এনকাউন্টারের নামে একটি অল্পবয়সী মেয়েকে খুন করেছিল ওরা।

প্র: তাই নাকি?

উ: হ্যাঁ। ওরা বলেছিল মেয়েটি নাকি লশকর জঙ্গি। মুম্বাইয়ের মেয়ে ছিল। সে নাকি সন্ত্রাসবাদী, মোদিকে হত্যা করার জন্য গুজরাটে এসেছিল।

প্র: কথাটা মিথ্যে?

উ: হ্যাঁ, মিথ্যে।

প্র: এখানে আসার পর থেকেই শুনছি সবাই সোহরাব উদ্দিনের এনকাউন্টার নিয়ে নানান কথা বলছে।

উ: সারা দেশেই এনকাউন্টারটা দিয়ে আলোচনা চলছে। মন্ত্রীর নির্দেশেই সোহরাব উদ্দিন আর তুলসী প্রজাপতিকে হত্যা করেছিল ওরা। ওই মন্ত্রী অমিত শাহ্, মানবাধিকার ব্যাপারটা বিশ্বাসই করেন না। উনি আমাদের বলতেন এইসব মানবাধিকার কমিশন-টমিশনে কোনো বিশ্বাস নেই আমার। আর এখন দেখুন, কোর্ট তাকেও জামিন দিয়ে দিয়েছে।

প্র: আপনি কখনো তাঁর অধীনে কাজ করেন নি?

উ: এটিএস প্রধান থাকার সময় করেছি। বানজারাকে বদলি করে দিয়ে আমাকে নিয়ে আসেন উনি। আর আমি মানবাধিকারে বিশ্বাস করি। তাই ওই শাহ আমাকে তাঁর বাংলোয় ডেকে পাঠান। আমি কখনো কারো বাংলোয় কিংবা বাড়িতে বা অফিসে যাই না। তাই তাকে বললাম - স্যার, আপনার বাংলো আমি চিনি না। একটু চমকে গিয়ে বললেন, কেন আমার বাংলো চেনেন না? তারপর বললেন, ঠিক আছে গাড়ি পাঠিয়ে দিচ্ছি

চলে আসুন। আমি বললাম, বেশ, গাড়ি পাঠিয়ে দিন। আমি ওখানে পৌঁছানোর পর উনি বললেন, 'আচ্ছা আপনি একজনকে গ্রেপ্তার করেছেন, যে বর্তমানে এটিএস এর কাছে আছে, তাকে মেরে ফেলুন।' আমি কোনো উত্তর দিলাম না। তখন উনি বললেন, 'দেখুন, তাকে মেরে ফেলুন। তাঁর মতো লোকের বাচাঁর অধিকার নেই।'

তৎক্ষণাৎ নিজের অফিসে ফিরে গিয়ে জুনিয়রদের নিয়ে একটা মিটিং ডাকলাম। আমার মনে হয়েছিল অমিত শাহ নিজেই ওদের নির্দেশ দিয়ে মানুষটাকে খুন করাবেন। তাই ওদের বললাম, দ্যাখো, ওকে মেরে ফেলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে আমাকে, কিন্তু কেউ ওর গায়ে হাত তুলবে না, শুধু জেরা করো। আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, আমি কাজটা করব না, তাই তোমাদেরও করা উচিত নয়।

প্রঃ কী সাহস আপনার!

উঃ আমি যেদিন রিটায়ার করি, ওই নরেন্দ্র মোদি সেদিন আমাকে ডেকে পাঠিয়ে, 'এবার আপনি কী করতে চান', এই জাতীয় নানা প্রশ্ন করেন,। তাকে জানালাম, কীভাবে আমরা উপর চাপ সৃষ্টি করা হয়েছিল। তারপর উনি বললেন, 'আচ্ছা ইয়ে বাতাও, সরকার কে খিলাফ কৌন কৌন লোগ হ্যায়, মতলব কিতনে অফসর সরকার কে খিলাফ হ্যায়।'

আমি মোদিকে বললাম, 'আপনাকে কিছু জিজ্ঞেস করতে পারি?' উনি বললেন, 'বলো'।

আমি বললাম, 'গত কুড়ি বছরে বিভিন্ন পদে কাজ করেছি আমি, কখনো আমার বিরুদ্ধে কিছু শুনেছেন আপনি?' উনি বললেন, আমি চমৎকার কাজ করেছি। তখন আমি বললাম, 'স্যার, তাহলে বলি, গত চার বছরে আমার সিনিয়ররা আর হোম সেক্রেটারিরা আমার এসিআর-দের 'এক্সিলেন্ট' আর 'আউটস্ট্যান্ডিং' হিসেবে চিহ্নিত করেছেন, তাহলে কেন তাদের নীচু পদে নামিয়ে দিলেন আপনি? আমার কাজকর্মকে কেন হেয় করে দিলেন?' ওঁকে বললাম, সব খবর আরটিআই–এর মাধ্যমে পেয়েছি আমি। উনি স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। বললেন, 'আমার অফিসারদের আর হোম সেক্রেটারিকে ডেকে পাঠাইনি আমি?' আমি বললাম, 'স্যার, হোম সেক্রেটারিকে ডেকে পাঠানোর কোন

দরকার আপনার ছিল না, ফাইলটা আপনার কাছে এসেছিল, আপনি সবই জানতেন।'

প্র: আচ্ছা, আপনাদের রাজ্যে কোনো ডিজি নেই কেন?

উ: কারণ কুলদীপ শর্মা নামে একজন অফিসারের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিলেন মোদি।

প্র: আমি শুনেছি মোদির নাকি নিজস্ব অফিসারদের টিম আছে।

উ: আমি রাজকোটের আইজিপি থাকাবস্থায় জুনাগড়ের কাছে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়েছিল। কয়েকজনের নামে এফআইআর লিখি আমি। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আমাকে ফোন করে বললেন, 'রাজনজি, আপনি কোথায় আছেন?' বললাম, 'স্যার, আমি জুনাগড়ে আছি।' তখন তিনি বললেন, 'আচ্ছা, তিনজনের নাম লিখে নিন, তিনজনকেই অ্যারেস্ট করবেন।' আমি বললাম, 'স্যার, ওই তিনজন আমার সামনেই বসে আছেন। আর শুনুন স্যার, এরা সকলেই মুসলিম আর এদের জন্যেই পরিস্থিতি স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে এসেছে। এরাই চেষ্টা করে হিন্দু-মুসলিমদের একত্রিত করে দাঙ্গার অবসান ঘটিয়েছেন।' তখন তিনি বললেন, 'দেখো, সিএম সাহিব নে কহা হ্যায়', তখন এই নরেন্দ্র মোদিই সিএম ছিলেন। (তারপর তিনি বললেন) এটা মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ। আমি বললাম, 'স্যার, সিএম-এর নির্দেশ হলেও এ-কাজ আমি করতে পারব না, কারণ তিনজনই নিরপরাধ।'

প্র: ফোনে আপনার সঙ্গে কে কথা বলেছিলেন?

উ: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী গোরধন জাদাফিয়া।

প্র: এটা কোন সময়ের কথা?

উ: ২০০২ সালের জুলাই মাস নাগাদ। তখন জাদাফিয়া বললেন, তিনি নিজেই আসবেন।

প্র: ওই লোকগুলো কারা ছিল?

উ: আরে ওরা ভালো লোক, মুসলিম, দাঙ্গা থামানোর কাজে সাহায্য করছিল। আমার জায়গায় অন্য যে কেউ থাকলে ওদের অ্যারেস্ট করত।

প্র: আচ্ছা, এই সিংঘলের ব্যাপারটা কী? উনিই আমাকে আপনার সঙ্গে দেখা করতে বলেছিলেন।

উ: আমি ওর বস ছিলাম। এখন ও এটিএস-এ আছে। ও আমার প্রোবেশনার ছিল, ডেপুটি সুপারিনটেডেন্ট।

প্র: সিংঘলের অধীনে কারা কাজ করতেন?

উ: যারা জেলে গেছে, যেমন বানজারা ওর অধীনে কাজ করত। আমি তখন বর্ডার রেঞ্জের আইজি, ওরা আমাকে বদলি করে দিল যাতে বানজারাকে নিয়ে আসা যায়। ওকে আনার জন্যে আমাকে নীচু পদে পাঠিয়ে দিল ওরা।

প্র: আচ্ছা, এখনকার পুলিশ কি মুসলিমবিরোধী?

উ: না, আসলে এই পলিটিশিয়ানগুলোই মুসলিমবিরোধী। কোনো অফিসার ওদের কথা না শুনলে তাকে সাইড পোস্টিং দেওয়া হয়, এরপর আর তাঁরা কী করতে পারে।

প্র: যে-লোকটিকে হত্যা করতে বলেছিলেন আপনাকে অমিত শাহ, সে কি মুসলিম ছিল?

উ: না, আসলে ব্যবসায়ী মহলের চাপে লোকটাকে সরাতে চাইছিলেন তিনি।

প্র: আমি শুনেছি ইশরাত জাহানকে এনকাউন্টারের নামে হত্যা করার জন্য কয়েকজন অফিসারকে বাধ্য করা হয়েছিল!

উ: দেখুন, শুধু আপনাকেই বলছি, একসময় এই বানজারা আর তাঁর দলবল পাঁচজন সর্দারকে অ্যারেস্ট করেছিল, তাদের মধ্যে একজন ছিল কনস্টেবল। বানজারা বলেছিল এদের এনকাউন্টারের নামে মেরে দেওয়া হোক, কারণ এরা হচ্ছে সন্ত্রাসবাদী। ভাগ্যক্রমে তখন এসপি ছিলেন পান্ডিয়ান, তিনি বেঁকে বসায় পাঁচজন (নিপরাধ) বেঁচে যায়।

প্র: কিন্তু অফিসাররা কি সত্যিই মুসলিম বিরোধী নন?

উ: না, তাঁরা তা নয়, রাজনতিক নেতারাই তাদের এমন কাজ করতে বাধ্য করে। আপনি নীতিপরায়ণ হলে ওরা কখনোই আপনাকে উপযুক্ত পোস্টিং দেবে না। রজনীশ রাই আর রাহুল শর্মার সঙ্গে ওরা কী করেছে একবার ভেবে দেখুন। এই সরকার সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন আর দুর্নীতিগ্রস্থ। যেমন ওই অমিত শাহ আমার কাছে বড়াই করে বলেছিলেন, ১৯৮৫ সালে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধানোর জন্য কীভাবে উস্‌কানি দিয়েছিলেন তিনি। সবাইকে নিজের বাড়িতে ডেকে পাঠান উনি। যেমন একটা মিটিংয়ে হোম সেক্রেটারি, চিফ সেক্রেটারি আর একজন সাংসদকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন, আমাকেও ডাকা হয়েছিল। আমি (তখন) আইজি পদে আছি। তো সাংসদটি অমিত শাহকে বলেছিলেন যে, একজন কনস্টেবলকেও বদলি করতে পারেননি আপনি। অমিত শাহ তখন আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এটা

করা হয়নি কেন?' আমি উত্তর দিলাম কনস্টেবলটি কোনো অন্যায় করেনি, সে শুধু বিজেপি সাংসদের ছেলেকে থামিয়েছিল।

প্র: উনি আপনাকে বলেছিলেন শুনে কিন্তু বেশ অবাক লাগছে।

উ: উনি আমাকে বিশ্বাস করে অনেক কথাই বলতেন। ইশরাতের ঘটনাটির কথা উনিই বলেছিলেন আমাকে। বলেছিলেন ইশরাতকে ওরা খুন করার আগে উনি তাকে হেফাজতে রেখেছিলেন। পাঁচজনকেই খুন করা হয়েছে এবং আদৌ কোনো এনকাউন্টার হয়নি। উনি আমাকে বলেছিলেন ইশরাত সন্ত্রাসবাদী ছিল না।

প্র: এটিএস-এর মতো একটা গুরুত্বপূর্ণ পদে উনি আপনাকে থাকতে দিয়েছিলেন ভেবেও খুব অবাক লাগছে।

উ: হ্যাঁ, আসলে ওরা ভাবত আমি ওদেরই লোক, যা বলবে তা-ই করব। অমিত শাহ আমাকে বললেন, 'দেখুন, দুটো গুরুত্বপূর্ণ পদ ফাঁকা আছে—এটিএস আর পুলিশ কমিশনার পদ। দুটো পদেই নিজেদের লোককে রাখতে চাই আমরা। তাই আমরা আশিষ ভাটিয়াকে পুলিশ কমিশনার আর আপনাকে এটিএস প্রধান করছি। উনি আরও বললেন, 'দেখুন, আপনার ওপর আমাদের এই আস্থা আছে যে আপনাকে রাজ্য সরকার যা বলবে আপনি তা-ই করবেন।' তখন আমি বললাম, সত্যিই যদি আপনাদের এত বিশ্বাস থাকে, তাহলে আমাকে পুলিশ কমিশনার করলেন না কেন?

পি.সি. পান্ডের কথাই ভাবুন। দাঙ্গাবাজদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থাই গ্রহন করেননি উনি। উনার শাস্তি হওয়া উচিত ছিল। মুখ্যমন্ত্রীর নেকনজরে আছেন উনি, মুখ্যমন্ত্রীর পেয়ারের পাত্র। মুসলিমদের হত্যার জন্য উনিই দায়ী। অথচ দেখুন, রিটায়ারের পরেও উনাকে একটা পদ দেওয়া হয়েছে। উনার সঙ্গে আমার খুব ভালো একটা বোঝাপড়া ছিল ঠিকই, কিন্তু উনি যা করেছিলেন সেটা অন্যায়।

২০১৩ সালের মে মাসে সাজানো বন্দুকযুদ্ধে ইশরাত জাহানকে হত্যা করা সংক্রান্ত অনুসন্ধানী প্রতিবেদন গুজরাট প্রশাসনের ওপর বোমার মতো ফেটে পড়েছিল। ইশরাত জাহান এবং সাদিক জামালকে সাজানো সংঘর্ষে হত্যা মামলা সংক্রান্ত একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নথি ফাঁস করে দিয়েছিলাম

আমি। প্রায় প্রতিটা নিউজ চ্যানেলে বসে অনুসন্ধানের খুঁটিনাটি ব্যাখ্যা করতে হয় আমাকে। সাজানো এনকাউন্টারের ঘটনায় সম্ভবত এই প্রথম ইনটেলিজেন্স বিভাগের কর্মকর্তাদের সরাসরি জড়িত থাকার কথা প্রমাণিত হল। এক্ষেত্রে মূল হোতা ছিলেন গুজরাটে নিযুক্ত কেন্দ্রীয় আইবি কর্মকর্তা রাজিন্দর কুমার।

এই রিপোর্ট সম্বলিত হেডলাইনগুলো এমএইচএ-কে বেকায়দায় ফেলে দেয়। আইবি অফিসারদের, বিশেষ করে স্পেশাল আইবি ডিরেক্টর রাজিন্দর কুমারকে জেরা করতে বাধ্য হয় সিবিআই। সাজানো এনকাউন্টারে ইশরাত জাহানকে হত্যা করার কাজে তাঁর জড়িত থাকার কথা প্রমাণ হয়ে গিয়েছিল।[৭] তখনকার হোম সেক্রেটারি জি.কে. পিল্লাই স্বপদে থাকার সময় বলেছিলেন, উপযুক্ত প্রমাণের অভাবে ইশরাতকে মুক্তি দেওয়া উচিত ছিল। ২০১৬ সালের গোড়ার দিকে সংবাদমাধ্যমকে বলেন, ক্ষমতাসীন কংগ্রেস সরকারের নির্দেশে তিনি এফিডেভিট পাল্টে দিয়েছিলেন। এর প্রতিক্রিয়ায় রাজিন্দর কুমারকে বেশ কিছু টিভি সাক্ষাৎকারে বলতে হয় যে, একাজ করতে বাধ্য করা হয়েছিল তাকে। পিল্লাইয়ের কর্তব্যচ্যুতি এবং তাঁর তথাকথিত 'সত্য' উন্মোচনের সময়-নির্বাচন নিয়ে প্রশ্ন ওঠে, কেননা এখন তিনি আদানি গ্রুপের বোর্ড অফ ডিরেক্টরস–এর সদস্য। আরও খারাপ ব্যাপার হল, একজন ব্যক্তির পরিচিতি যাই হোক তাকে সাজানো এনকাউন্টারে হত্যা করাটা যে সংবিধানবিরোধী, সে ব্যাপারে এদের কারও কোনো অনুশোচনাই নেই। সিংঘলের তোলা একটা গোপন টেপে গুজরাটের প্রায় সমগ্র স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক কেন ইশরাত জাহান তদন্ত সম্বন্ধে ধোঁয়াটে কথা বলেছেন, সে সম্বন্ধে এঁরা কেউ কোনো উচ্চবাচ্য করেননি।

আমার অনুসন্ধানের মূল বিষয়টা প্রবন্ধের প্রথম অনুচ্ছেদেই স্পষ্টভাবে লিখেছিলাম। লেখাটা এরকম ছিল:

"গুজরাট পুলিশ কর্তৃক নয় বছর আগে চারজন তথাকথিত সন্ত্রাসবাদীকে বেআইনিভাবে হত্যার ব্যাপারে একটা বোমা ফাটাতে যাচ্ছে সেন্ট্রাল ব্যুরো

অফ ইনভেস্টিগেশন (সিবিআই)। *তেহেলকা*'র কাছে খবর আছে, আহমেদাবাদের একজন বিচারপতির কাছে সাক্ষ্যপ্রমাণ দিয়ে সিবিআই জানাতে চলেছে, অভিযুক্ত একজন অফিসার তাঁর সাক্ষ্যে ইনটেলিজেন্স ব্যুরোর (আইবি) বর্তমান স্পেশাল ডিরেক্টর রাজেন্দ্রকুমারকে ২০০৪ সালের ১৫ জুন একজন মহিলা ও তিনজন পুরুষকে, যারা সকলেই মুসলিম, সাজানো বন্দুকযুদ্ধে হত্যা করার পিছনে মূল ষড়যন্ত্রকারী হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, অন্য একজন অফিসার জানিয়েছেন, ১৯ বছর বয়সী ইশরাত জাহানকে হত্যা করার আগে তাঁর সঙ্গে দেখা করেন কুমার। ইশরাতকে তখন বেআইনিভাবে পুলিশ হেফাজতে আটক রাখা হয়েছিল। অন্য আর একজন পুলিশ অফিসার তাঁর সাক্ষ্যে জানিয়েছেন যে, আইবি-র গুজরাট ইউনিট থেকে একটি একে-৪৭ এ্যাসল্ট রাইফেল পাঠানো হয়েছিল, যেটি নিহতদের কাছে ছিল বলে দাবি করা হয়। আসলে রাইফেলটি রেখে দেওয়া হয়েছিল চারজনের মৃতদেহের সঙ্গে। আর কুমার তখন সেখানেই কর্মরত ছিলেন। সিবিআই-এর হাতে একটি গোপন অডিও রেকর্ড-ও এসেছে, যেটি রেকর্ড করেছিলেন অন্যতম প্রধান অভিযুক্ত জি.এল. সিংঘল। তিনি ছিলেন সেই দুর্ভাগ্যময় রাতে ওই চারজনকে যেসব অফিসার গুলি করে মেরেছিলেন তাদের অন্যতম সদস্য। এই রেকর্ডিং করা হয়েছিল ২০১১ সালের নভেম্বর মাসে। এই রেকর্ডিংয়ে যাঁদের মধ্যে কথোপকথন আছে তাঁরা হলেন: প্রফুল্ল প্যাটেল, যিনি এক বছর শাহের পদের উত্তরসূরি হয়েছিলেন; এডিশনাল প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি গিরিশচন্দ্র মুর্মু, এই আইএএস অফিসারটি ২০০৮ সাল থেকে মোদির অফিসে কাজ করেছেন এবং তাকে মোদির একজন ঘনিষ্টতম উপদেষ্টা বলে মনে করা হয়; রাজ্য সরকারের সবথেকে সিনিয়র ল অফিসার অ্যাডভোকেট জেনারেল কমল ত্রিবেদী; তাঁর সহকারী, এডিশনাল অ্যাডভোকেট জেনারেল তুষার মেহতা; জনৈক নাম না জানা আইনজীবি এবং সিংঘল। (এই প্যাটেল এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্যাটেল আলাদা ব্যক্তি; এই প্যাটেল ডিসেম্বরে বিধানসভা নির্বাচনে পরাজিত হন এবং মোদির নতুন মন্ত্রীসভায় তাঁর ঠাঁই হয়নি)

মনে হচ্ছিল ধাঁধার হারানো টুকরোগুলো ভেসে উঠতে শুরু করেছে এবং সেগুলো ঠিক জায়গায় বসে যাচ্ছে। প্রিয়দর্শী ছিলেন রাজ্যের এটিএস প্রধান আর অমিত শাহ তাঁকে জানিয়েছিলেন, ঠান্ডা মাথায় হত্যা করার আগে পুলিশি হেফাজতে আটকে রাখা হয়েছিল ইশরাত জাহানকে। কিন্তু অন্য সব অনুসন্ধানের মতোই এক্ষেত্রেও আমাকে কিছু মূল্য দিতে হয়েছিল। আমার সাংবাদিকতার সঙ্গে আমার ধর্মবিশ্বাসকে জুড়ে নানান গল্প ছড়ানো হয়। কয়েকদিনের মধ্যেই বিভিন্ন চ্যানেলের সম্পাদকরা ও আইনজীবীরা আমাকে ফোন করে জানাতে থাকেন যে, সিবিআই কর্মকর্তাদের হাতে আমার অশ্লীল একটা সিডি আছে বলে দুর্নাম ছড়াচ্ছেন এমএইচএ কর্তারা।

কথাটা শুনে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম। জানতাম এটা আমাকে চুপ করানোর চেষ্টা, অর্থাৎ চারিত্রিক দুর্নামের ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে থেমে যাব। বাবার কাছে গেলাম। সৌভাগ্যবশত বাবা তখন পর্যন্ত এসব সম্বন্ধে কিছুই জানতেন না। আমার ভাই আরিফ, যে আমার সব কাজে সমর্থন জুগিয়ে এসেছে, আর আমার, যিনি আমার কৃতসংকল্পতার মেরুদণ্ড - আমার ডাকে তারাও এসে দাঁড়ালেন। বাবা বুঝলেন আমি খুব নার্ভাস হয়ে আছি। প্রশ্নার্ত দৃষ্টিতে মায়ের দিকে তাকালেন তিনি। মা-ও একইরকম বিভ্রান্ত আর নার্ভাস হয়ে পড়েছেন।

ফোনের কথা আর বাজারে যে গুজবটা ছড়াচ্ছে সে সম্বন্ধে জানালাম ওদের। বাবার কথাগুলো স্পষ্ট মনে আছে, 'দেখো বেটা, ইয়ে সব ড্রামা হ্যায়, উনকো কহো সিডি দিখায়ে, হাম সব দেখেঙ্গে।' হেসে উঠলেন বাবা। মা একটু সহজ হয়ে আমার চুলে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললেন, 'বেটা, হাম সব জব তুমকো ট্রাস্ট করতে হ্যায়, জব তুমহারি ফ্যামিলি নে এক সওয়াল নেহি পুছা, তো তুমহে কিসি আউর কে ক্যা ফিকর।'

এইরকম সমর্থনের সুরে এবং পেশাদার সাংবাদিকের ভঙ্গিতে আমার ভাই বলল, ওই জঘন্য লোকগুলোকে আক্রমণ করে একটা চিঠি লেখ-এ ছাড়া আর অন্য কিছু খুঁজে পেল না ওরা?

তবে আমাকে বিশেষ কিছু করতে হয়নি। সাংবাদিক মহলে আমার সহকর্মীরা দৃঢ়ভাবে আমার পাশে দাঁড়িয়েছিল। আমার বিরুদ্ধে কুৎসামূলক প্রচারের উত্তরে তৎকালীন ম্যানেজিং এডিটর সোমা চৌধুরী সেই সপ্তাহের সম্পাদকীয় নিবন্ধে লিখেছিলেন—

> *তেহেলকা*'র অন্যতম একজন খাঁটি ও নির্ভীক সাংবাদিক রানা গত তিন বছর ধরে গুজরাটের সাজানো সংঘর্ষগুলো নিয়ে অক্লান্তভাবে কাজ করে চলেছেন। ন্যায়বিচার ও সাংবিধানিক মূল্যবোধই তাঁর সাংবাদিকতার চালিকাশক্তি। তবুও, ইশরাত জাহান মামলা সম্বন্ধে তাঁর খবরগুলো সারা দেশের বিভিন্ন পত্রপত্রিকার শিরোনাম হতে শুরু করা মাত্রই, এক অপমানজনক অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে হচ্ছে তাঁকে, পেশাদার সাংবাদিক হিসেবে না দেখে তাকে চিহ্নিত করা হচ্ছে 'মুসলিম সাংবাদিক' হিসেবে। পাশাপাশি এক জঘন্য কুৎসামূলক প্রচারও চলছে তাঁর বিরুদ্ধে। তাঁর ও সিবিআই অফিসারদের মধ্যেকার একটা সিডি নিয়ে গুঞ্জন চলছে, বাস্তবে যার কোনো সত্যতাই নেই।

ভারতবর্ষ এক ত্রুটিপূর্ণ পরীক্ষাগার। কিন্তু এর অন্তর্নিহিত কাব্যিক ধারণাটি বাদ দিলে এই-ই জুটবে আমাদের কপালেঃ 'হিন্দু জাতীয়তাবাদী', 'মুসলিম সাংবাদিক' এবং 'পেশাদার মহিলা', অশালীন মিথ্যার সাহায্যে যাদের দুর্নাম করে বেড়াই আমরা।

সিডি সংক্রান্ত বানানো গল্পটার নিঃশব্দে মৃত্যু হল।

অন্যদিকে, রাজ্যের পুলিশ অফিসারদের ব্যাপারে অমিত শাহের প্রশ্রয়ের নানান খবর রোজই প্রকাশিত হচ্ছিল। নিরীহ নাগরিকদের ওপর নজরদারি চালানোর কাজে তাদের প্রশ্রয় দিতেন অমিত শাহ। এ-রকমই একজন সাধারণ নাগরিক ছিলেন মানসি সোনি নামক জনৈক স্থপতি। এসবের কেন্দ্রে মূল লোকদের একজন জি.এল. সিংঘল। যিনি একসময় অমিত শাহের বিশ্বস্ত লোক ছিলেন। কথোপকথনটা রেকর্ড করা হয়েছিল খুব তাৎপর্যপূর্ণ সময়ে। ইশরাত জাহানের ঘটনার তদন্ত করার জন্য নিযুক্ত

সিট তখন সবেমাত্র প্রাথমিক তদন্ত শুরু করেছে। সংশ্লিষ্ট অফিসার অর্থাৎ সিংঘল তখন বুঝতে শুরু করেছেন, দলিত অফিসারদের কীভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। এটা বুঝেই নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা শুরু করেন তিনি। এ ব্যাপারে গুজরাটে বহুল প্রচলিত সেই পদ্ধতির আশ্রয় নেওয়ার থেকে ভালো উপায় আর কী-ই বা হতে পারে, সেই পদ্ধতিটি হল বেআইনিভাবে অন্যের ফোনে আড়ি পাতা।

আহমেদাবাদে আরটিআই এর মাধ্যমে এ্যাকটিভিস্টরা যেসব তথ্য সংগ্রহ করেছেন, তা থেকে দেখা যায়, রাজ্যে ৬৫ হাজারেরও বেশি লোকের ফোনে বেআইনিভাবে আড়ি পাতা হত। এদের মধ্যে ছিলেন বিরোধী দলের সদস্যরা, নিজেদের দলের মধ্যে যাঁরা সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে চাইছিলেন তাঁরা, সাংবাদিকরা ও পুলিশ কর্মকর্তারা।

গোটা বিষয়টা কীভাবে চলে সিংঘলের তা অজানা ছিল না। অনেক নোংরা কৌশলের কথা তিনি আমাদের বলেও ছিলেন। মন্ত্রীর ফোন ও তাঁর কথাবার্তাও আড়ি পাতা শুরু হয়। এইভাবে আড়ি পেতে রেকর্ড করা কথাবার্তাগুলোর মধ্যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল মানসি নামে গুজরাটের একজন তরুণ স্থপতির কাজকর্মের দিকে নজর রাখার জন্য সিংঘলকে দেওয়া শাহের নির্দেশ। ভুজের ভয়াবহ ভূমিকম্পের পর পুনর্বাসনের সময় এই মানসির সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন প্রদীপ শর্মা নামক জনৈক আইএএস অফিসার।

মানসির ব্যাঙ্গালোরে অবস্থানের কথা আমি পরে জানতে পারি। তাঁর ওপর নজরদারি চালানোর রেকর্ড করা যাবতীয় তথ্য আমার হাতে ছিল। তবে আমি জানতাম রেকর্ডগুলো ফাঁস করে দিলে ব্যাঙ্গালোরে মানসির শান্তিপূর্ণ জীবনযাপন শেষ হয়ে যাবে।'[৮]

সময় ফুরিয়ে আসছিল। আমাদের সম্পাদক সোমাকে একটা পাবলিক বুথের নম্বর দিয়ে রেখেছিলাম। সোমা তাঁর ব্যক্তিগত সহকারীর মোবাইল থেকে সেই বুথে ফোন করে জিজ্ঞেস করতেন, 'কী কী পাওয়া গেল?

ওখানকার খবর কী?' আমি নানান তথ্যের প্রতিলিপি নেওয়ার খবর জানালে উত্তেজনায় তিনি চেঁচিয়ে বলতেন, 'দারুণ, রানা, দারুণ!'

কিন্তু আমি বুঝতে পারছিলাম এখনও অনেক ফাঁক আছে। প্রথমে সেগুলো পূরণ করতে হবে। কিছু আমলার সঙ্গে যোগাযোগ করার দরকার, যেমন হোম সেক্রেটারি, মুখ্য উপদেষ্টা, অর্থাৎ কারও সম্বন্ধে অভিযোগমূলক নথিতে সই করতেন যারা, এবং যারা সরাসরি মোদি ও শাহের কাছ থেকে নির্দেশ পেতেন। এদের মধ্যে অধিংকাংশ জনকেই নানাবতী কমিশন জিজ্ঞাসাবাদ করে, সেখানে হঠাৎই তাদের স্মৃতিভ্রংশতা দেখা দেয়। অনেকে সরাসরি জড়িত ছিলেন না, কিন্তু কোনো অন্যায়ের কথা জেনেও নীরব থাকার কারণে গুজরাটের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার শিকারদের ন্যায়বিচার দেওয়ার প্রক্রিয়ায় তাঁরা দোষী সাব্যস্ত হন। আমার সহকর্মী আশিসের পক্ষে স্থানীয় গুন্ডাদের দিয়ে কথা বলানো সহজ ছিল। গুন্ডারা বলত গুজরাট দাঙ্গার সময় কীভাবে মুসলিম মহিলাদের খুন করেছে তাঁরা। কিন্তু আমি খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম মূল লোকগুলিকে। দাঙ্গার সময় গুজরাটের হোম সেক্রেটারি, পুলিশের ডিজি, কমিশনার এবং আইবি প্রধান ছিলেন যারা। প্রতিদিনই মাথায় ঘুরত ভাবনাটা।

এই মানসিক চাপ তো ছিলই এরমধ্যেই আমাদের ঘর খালি করে দিতে বললেন মানিকভাই। কী একটা সম্মেলনের জন্য প্রতিনিধিরা এসে ফাউন্ডেশনের সব ঘর দখল করে বসবেন। আবার নিরাশ্রয় হলাম আমি।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

মাঝের সময়ের কথা

এ কাহিনির অন্যান্য চরিত্রের প্রসঙ্গে যাওয়ার আগে গুজরাটের বিখ্যাত মহিলা পুলিশ অফিসার উষা রাডার কথা একটু বলে নেওয়া দরকার। তাঁর উপর স্টিং অপারেশন চালানোর ইচ্ছে আমার ছিল না, কিন্তু তাঁর ব্যাপারে সন্দিহান হওয়ার কিছু কারণ ছিল। দলিত শ্রেণি থেকে আসা রাডার সঙ্গে দেখা হওয়ার পর বুঝেছিলাম, তাঁর কথাবার্তা গোপনে রেকর্ড করে রাখলে কোনো ক্ষতি হবে না বরং আমার প্রতিবেদনের পক্ষে তা সহায়কই হবে। রাডা ছিলেন অভয় সুদাসামার অত্যন্ত বিশ্বস্ত জুনিয়র। আমি গুজরাট ছেড়ে চলে আসার কিছুদিন পরেই স্পেশাল টাস্ক ফোর্স থেকে পদত্যাগ করেন তিনি। ২০০৩-০৬ এর মধ্যে গুজরাটে ১৬টি পুলিশ এনকাউন্টারের তদন্ত করার জন্য সুপ্রিম কোর্ট এই স্পেশাল টাস্ক ফোর্স গঠন করেছিলেন।

সোহরাব উদ্দিন শেখকে কথিত বন্দুকযুদ্ধে হত্যা করার মামলায় সিবিআই-এর হাতে গ্রেপ্তার হওয়া সুদাসামা ২০০৭-১০ সাল পর্যন্ত রাডার বস ছিলেন। তাঁরা দু'জনেই তখন ক্রাইম ব্রাঞ্চে ছিলেন। সকলে বলাবলি করত তদন্তের মোড় সুদাসামার পক্ষে ঘোরানোর জন্য প্রভাব খাটাতেন রাডা।

গুজরাট পুলিশের কন্ট্রোল রুমটা ততদিনে আমার একটা প্রিয় জায়গা হয়ে উঠেছে। কোনো পুলিশ অফিসারের সঙ্গে যোগাযোগ করার দরকার হলেই কৃত্রিম উচ্চারণে ফোন করে বলতাম, আমি একজন আমেরিকান চিত্রপরিচালক, ক্ষমতাশালী গুজরাটি মহিলাদের সম্বন্ধে একটা তথ্যচিত্র তুলছি। যে পুলিশ অফিসার ফোন ধরতেন তিনি আমাকে শুধু যে প্রার্থিত পুলিশ অফিসারের ল্যান্ডলাইন নম্বর দিতেন তাই নয়, তাঁর সেল ফোনের নম্বরও দিয়ে দিতেন। যখন আমি উষা রাডাকে ফোন করি, তখন তিনি কাউকে জিজ্ঞাসাবাদ করছিলেন। আমি তাকে একটা মেসেজ পাঠিয়ে দিই। ঘণ্টা দুয়েক পরে ফোন করে তিনি আমাকে আহমেদাবাদের সার্কিট

হাউসে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে বলেন। ডেনিম স্কার্ট, কালো টি-শার্ট আর প্রচুর গয়না পরে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। মাথায় রঙিন ওড়না বাঁধা ছিল, সঙ্গে ছিল ক্যামেরা আর একটা পিঠে-বাঁধা ব্যাগ। রিসেপশনিস্ট আমাকে বসার জায়গায় নিয়ে গেলেন।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই উষা রাড়া এলেন। বয়স তিরিশের কোঠার গোড়ার দিকে, বয়কাট চুল, লম্বা, রোগাটে চেহারা। পরনে কলারওয়ালা টি-শার্ট, জিনস আর স্পোর্টর্স শু, যা তাঁর ব্যক্তিত্বে একটা আলাদা মাত্রা যোগ করেছে। আমাকে উষ্ণভাবে আলিঙ্গন করলেন তিনি। 'বলুন মৈথিলী, কেমন আছেন?' কথাগুলো বলতে বলতে আন্তরিকভাবে আমার সাথে করমর্দন করলেন, মুখে ফুটে উঠল ঔদার্যের হাসি।

বসার পর তাঁর ব্যক্তিত্বের বিপুল প্রশংসা করলাম, তাঁর সবটা যে মিথ্যে তাও নয়। উষার সত্যিই একটা প্রসন্ন ব্যক্তিত্ব ছিল, আর তাঁর হাসি দেখে আমার সব ভয় দূর হয়ে গেল। ঘণ্টাখানেক কথাবর্তা বলার পরই তিনি কথা দিলেন আমাকে সিনেমা দেখাতে নিয়ে যাবেন, শপিংয়ে নিয়ে যাবেন এবং গুজরাটের একটা বিখ্যাত থালি খাওয়াবেন।

নিজের সরকারি জিপে করে আমাকে নেহরু ফাউন্ডেশনের সামনে নামিয়ে দেওয়ার আগে আলিঙ্গন করে উষা বললেন, 'আমাকে বন্ধু বলে ভাববেন আর যা সাহায্য দরকার স্বচ্ছন্দে জানাবেন'।

পরের দিন সন্ধ্যের সময় উষার কাছ থেকে একটা মেসেজ এল: 'মৈথিলী, রাত সাড়ে ন'টার সময় এসজি হাইওয়েতে আমার সঙ্গে দেখা করুন।' তৎক্ষনাৎ জানিয়ে দিলাম, আমি যাচ্ছি। কিন্তু ফোনটা রাখার পরই উৎকণ্ঠার স্রোত বয়ে গেল শরীর জুড়ে। রাত সাড়ে ন'টার সময় এসজি হাইওয়েতে আমার সঙ্গে কেন দেখা করতে চাইছেন উনি?

খুব নার্ভাস লাগছিল, ভয়ও পাচ্ছিলাম তবু একটা অটো ধরে চলে গেলাম এসজি হাইওয়েতে। নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছে উষাকে ফোন করতে তিনি বললেন ফোনটা ড্রাইভারকে দিতে, যাতে ঠিক কোথায় আমাকে নিয়ে

যেতে হবে সেটা তাকে বুঝিয়ে দিতে পারেন। মুখ গোঁমড়া করে ফোনটা আমাকে ফেরত দিয়ে ড্রাইভার বললেন, এত দূর যে যেতে হবে সেটা আমার তাকে আগেই জানানো উচিত ছিল। তখন রাত প্রায় দশটা বাজে। উষার কথামতো কাজ করার ছাড়া বি। ভয় পেলেও সেটা বুঝতে দেওয়া চলবে না। আরও কয়েক কিলোমিটার যাওয়ার পর রাস্তার ওপর উষার পুলিশ ভ্যানটা চোখে পড়ল। ভ্যানের পাশে আর মাত্র তিনজন পুলিশ দাঁড়িয়ে আছে। অটোচালককে বলতে যাচ্ছিলাম আমাকে ফিরিয়ে আনার জন্য, কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে। 'হ্যালো, আমার দিকে এগিয়ে আসতে আসতে উষা বললেন। আমাকে জিপে বসতে বলার পর বললেন, 'আপনাকে এমন একটা জায়গায় নিয়ে যাব যেটা আপনার ভালো লাগবে।'

চিৎকার করে কাঁদতে ইচ্ছে করছিল আমার। গুজরাটে আসার পর এই প্রথম হাতদুটো বরফের মতো ঠাণ্ডা লাগছে। উষা নানান কথা বলে চলেছেন, এদিকে আমি একেবারে চুপ, যা আমার চরিত্রবিরোধী। বাড়িতে ফোন করতে ইচ্ছে করছিল, জানাতে ইচ্ছে করছিল কার সঙ্গে শেষ দেখা হয়েছে আমার। দুর্ঘটনার নামে আমাকে মেরে ফেলা হলে খবরটা কাজে লাগবে ওদের।

কিন্তু উষাকে চিনতে ভুল করেছিলাম আমি। আহমেদাবাদের একটা সেরা রেস্তোরার সামনে গিয়ে থামলাম আমরা। উজ্জ্বল চোখে আমার দিকে তাকিয়ে উষা বোঝাতে চাইলেন- দেখুন, আমি আপনাকে দেখাতে চেয়েছিলাম আপনাদের আমেরিকার থেকে আমাদের আহমেদাবাদ মোটেই পিছিয়ে নেই। হাসলাম আমি। স্বস্তির হাসি, যে হাসির অর্থ কোনোদিনই বুঝবেন না উষা। তাঁর কাছে মাফ চেয়ে ওয়াশরুমে গেলাম। ওই টয়লেটের কিউবিক্‌লে সেদিন যত কেঁদেছিলাম, জীবনে কখনো বোধহয় এত কাঁদিনি। কাঁদতে কাঁদতে কাশছিলাম, চোখ-নাক থেকে হু-হু করে পানি ঝরছে, প্রায় বমিই করে ফেলছিলাম।

রেস্তোরায় বসে কথাবার্তা বলার পর উষা বুঝতে পারলেন তাকে কতটা শ্রদ্ধা করি আমি। সেখান থেকে বের হবার আগে ঠিক হল পরের দিন তাঁর

বাড়িতে সাক্ষাত হবে আমাদের। রেস্তোরায় বসে অনেক কিছু নিয়েই আলোচনা হয়েছিল-গুজরাটে সন্ত্রাস সৃষ্টিকারী মুসলিমদের থেকে শুরু করে তাঁর সিনিয়র অভয় সুদামাসার প্রসঙ্গ পর্যন্ত, যাকে একজন বীর বলে মনে করেন তিনি।

পরের দিন সন্ধ্যোয় উষার বাড়িতে যেতে হবে। চার্জার থেকে বিশেষ কুর্তাটা খুলে নিলাম, ক্যামেরা পরীক্ষা করলাম, তারপর কুর্তাটা গায়ে চাপিয়ে নেহরু ফাউন্ডেশন থেকে বেড়িয়ে পড়লাম। বের হওয়ার সময় ফাউন্ডেশনের এক নতুন বাসিন্দার সঙ্গে পরিচয় হল: মুম্বাই থেকে আসা একটি মেয়ে, নাম রাজি। আমার পাশের ঘরেই থাকবে। পানি আর তাঁর বন্ধুরা সবে হোস্টেলে ফিরেছে। আর একটি জার্মান মেয়ে হোস্টেলে থাকার জন্য এসেছে। স্কাইপে নিজের পরিবারের লোকদের সাথে কথা বলছিল সে। তাঁর ঘরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তাঁর মায়ের সঙ্গে একটু কথা বলে যেতে বলল আমাকে।

শাহিবাগের কাছে পুলিশ কোয়ার্টার্সে পৌঁছে দেখলাম ঘরোয়া পোষাক পরে বসে আছেন উষা। ডিনারের জন্য থালি সাজানো আছে। তাঁর মেয়েটি ল্যাপটপে কী সব করছে। মেয়ের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিয়ে মেয়েকে উষা বললেন স্কুলে পড়া শেষে আমেরিকার কোন কলেজে ভর্তি হওয়া যায় সে ব্যাপারে আমার কাছে জেনে নিতে। উষা একজন সিঙ্গল মাদার, স্বামীর সঙ্গে বিচ্ছেদ হয়ে যাওয়ার পর মা-বাবা আর সন্তানদের নিয়ে থাকেন। উষাকে বললাম, 'আজ তুমসে তুমহারি পুলিশ ফোর্স বারে মেঁ নোটস্ লেনি হ্যায়।' উষার জবাব, 'না, আজকে ফিল্ম দেখতে যাবো।' মনে মনে বেশ হতাশ হলেও আচারণে সেটা প্রকাশ করলাম না।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই আহমেবাদের একটা জনপ্রিয় সিনেমা হলে পৌঁছে গেলাম আমরা। কিন্তু ভেতরে পা দিতে গিয়েই বুকটা কেঁপে উঠল। একটা মেটাল ডিটেক্টর পার হয়ে যেতে হবে! আমার কুর্তায় একটা ক্যামেরা লাগানো আছে। মনে হল, আজই সব শেষ। আতঙ্কে মুখের ভেতরটা শুকিয়ে গেছে। লাইনে দাঁড়িয়ে আছি আমরা। উষা বকবক করে চলেছেন, আমরা সবটুকু নজর ওই ডিটেক্টরের দিকে। আর কয়েক

মিনিটের মধ্যেই আমার ক্যামেরাটার হদিশ দেবে ওই ডিটেক্টর, তৎক্ষাণাৎ ধরা পড়ে যাব। কিন্তু, অঘটনটা আজ আর ঘটেনি! তল্লাশির জায়গার কাছেই দাঁড়িয়ে থাকা একজন কনস্টেবল উষা আর আমাকে দেখে লাইন থেকে সরিয়ে নিলেন এবং অন্য দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকিয়ে দিলেন। ডিসেম্বর মাস। কনকনে ঠান্ডা রাত, অথচ আমার পিঠ থেকে টপটপ করে ঘাম ঝরছিল। বুঝতে পারছিলাম, আবারও বেঁচে গেলাম। পপকর্ন আর কোক হাতে নিয়ে 'নো ওয়ান কিল্‌ড জেসিকা' ছবিটা দেখতে গেলাম আমরা। মজার বিষয় হল, জেসিকা লাল হত্যা মামলা নিয়ে *তেহেলকা*'র অনুসন্ধানের ভিত্তিতেই বানানো হয়েছিল সিনেমাটা।

পর্দায় নানান নাম দেখানো হচ্ছে, *তেহেলকা*'র কাছেও কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা হয়েছে নামপত্রে। উষা ফিসফিস করে বললেন, '*তেহেলকা*'র নাম শুনেছেন? যত্তসব রাস্কেল। ফোনের সঙ্গে লাগানো ক্যামেরা নিয়ে ঘুরে বেড়ায় আর গোপনে লোকেদের ছবি তোলে। গুজরাটেও গোপনে আমাদের লোকেদের ছবি তুলেছিল ওরা।' কিছুটা বাড়তি অজ্ঞতার ভান করে বললাম, 'তাই নাকি? এই *তেহেলকা*টা কী? কোনো টিভি চ্যানেল?' 'না না, ওটা একটা ওয়েবসাইট, কক্ষনো দেখবেন না। ভারত সম্বন্ধে যতসব খারাপ খারাপ জিনিস দেখায়' সিনেমা দেখতে দেখতেই উষা উত্তর দিলেন।

সেই রাতে ঘরে ফিরে মনে মনে হাসলাম, ভালো একটা সার্কাসের অংশীদার হয়ে পড়েছি। পরিস্থিতির কথা ভেবে এবং একসময় যা ভেবেছিলাম আর সিনিয়রদের প্রত্যাশা পূরণ করতে পারব কি না, তা ভেবেও হাসি পেল। আমি কি সত্য আবিষ্কার করতে পারব না? থাকার অন্য জায়গা খোঁজার জন্য তখনও হাতে দু'দিন সময় ছিল। পানি আমাকে ওর ঘরে থাকতে বলেছিল, কিন্তু সে ঝুঁকি নেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। রোজ রাতে আমার কুর্তা, ডায়েরি আর ঘড়িতে চার্জ দিতে হত। তিনটে জিনিসেই ক্যামেরা লাগানো ছিল। এতটুকুও ভুল করে নিজেকে বিপন্ন করার উপায় ছিল না আমার। পানির কাছে ওর ল্যাপটপটা

চাইলাম। আমার ব্যক্তিগত ই-মেইলটা ব্যবহার করতে চাইছিলাম, কিন্তু নিজের ল্যাপটপ থেকে করতে চাচ্ছিলাম না।

সেদিন ব্যক্তিগত মেইলে লগ ইন করে দেখি অন্তত হাজারখানেক মেইল জমে আছে। আমার অন্তর্ধান সম্পর্কে জানতে চেয়েছে আমার অনেক বন্ধু। আমার ফেসবুক অ্যাকাউন্ট ডিলিট করে দিয়েছিলাম, ফলে ইন্টারনেটে আমার কোনো ছবি ছিল না। আমেরিকার বাসিন্দা এক বান্ধবীকে মেইল করলাম। তাঁর বাড়ির লোকেরা আহমেদাবাদে থাকে। তাকে জানালাম হোটেলে থাকতে থাকতে হাঁপিয়ে উঠেছি, এ শহরে তাঁর কোনো বন্ধুর বাড়িতে থাকা যায় কিনা।

দ্রুত উত্তর দিল সে যা আমার কাছে অপ্রত্যাশিত। তাঁর বাড়ির লোকেরা আর বন্ধুরা রাজকোটে থাকে। তবে তাদের এক পারিবারিক বন্ধুর একটা বাংলো আছে এসজি হাইওয়েতে। বাড়ির মালিকরা এখন দেশে থাকে না, একজন হাউসকিপার বাড়িটা দেখাশোনা করে। বাড়ির কম্পাউন্ডে একটা কাজ চলা গোছের চালা বানিয়ে থাকে সে। কীভাবে যেতে হবে জেনে নিলাম। মালপত্র বেঁধে পরের দিন সকালে মানিক ভাইয়ের ঘরে গেলাম তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্য। বকেয়া টাকাটা মিটিয়ে দিলাম। তিনি বললেন, দিন দশেক পরে এখানে ফিরে আসতে পারেন আপনি। ততদিনে প্রতিনিধিরা চলে যাবেন, একটা ঘরও পাওয়া যাবে।

বিশাল বাগান আর লনসহ বাংলোটা খুব সুন্দর। কিন্তু কোনো মেয়ের পক্ষে একা থাকার উপযুক্ত নয়। এটার ডাইনে বাঁয়ে আরও কিছু বাংলো তৈরি হচ্ছে। মজুরদের থাকার জন্য অস্থায়ী বস্তি বানানো হয়েছে এবং সূর্যাস্তের পর কোথাও কোনো আলো থাকে না। যানবাহনের কোনো ব্যবস্থা নেই। সাইকেলে করে প্রায় এক কিলোমিটার দূরে বাজারে যেতে হয় কেয়ারটেকারটিকে। বাংলোর চত্বরে ছেঁড়া তাঁর, কাঠ, ইট আর সিমেন্টের স্তূপ। কেয়ারটেকার কালুভাই আমার আসার কথা জানতেন। কালুভাই বাংলোর সদর দরজা খোলার আগেই দুটো নেড়ি কুকুর ঘেউঘেউ করে আমাকে স্বাগত জানাল। কালুভাইয়ের তিনটি মেয়ে। কুকুরগুলোও তাঁর পরিবারের সদস্য। পরে এরা আমার নিঃসঙ্গ জীবনের সঙ্গী হয়ে উঠেছিল।

এ বাড়িতে আমার জন্য আরেকটা চমক অপেক্ষা করছিল, যেটার কথা আমাকে বলা দরকার মনে করেননি কালুভাই। একদিন সন্ধের পর অটোয় করে বাংলোয় ফিরলাম। গোটা বাংলোটা অন্ধকার। দরজায় কড়া নেড়ে কোনো লাভ নেই, কারণ কালুভাই তখন নিজের ছোট্ট ঘরে দরজা বন্ধ করে রেডিও শুনছেন। তাকে ফোন করলাম, অটোচালককে বললাম জোরে হর্ন বাজাতে, যাতে ভেতরের কেউ শুনতে পায়। আমার সঙ্গে একটা ছোট টর্চ ছিল, অন্ধকার রাস্তায় পথ দেখার জন্য টর্চটা রাখতে হত।

দরজা দিয়ে আলো ফেলতেই কুকুরগুলো ঘেউঘেউ করতে শুরু করল। ভালোই হল, কুকুরের ডাক শুনে কালুভাই হয়তো এদিকে আসতে পারেন। যা ভেবেছি তাই। কালুভাই চেঁচিয়ে বললেন, 'আ রহা হুঁ, মৈথিলী বেন।' কুকুরগুলো তখনও ঘেউঘেউ করেই চলেছে।

গোসল সেরে রাতের খাবার খাওয়ার পরও দেখি কুকুরগুলো ডেকেই চলেছে। ওদের খিদে পেয়েছে ভেবে বাইরে এসে কালুভাইকে বললাম, ওদের কিছু খেতে দিতে। তিনি উত্তর দিলেন, 'আরে বেন, একবার উয়ো সাঁপ হোল মেঁ চলা জায়েগা না সব শান্ত হো জায়েঙ্গে।' সাপ? আর্তনাদ করে উঠলাম, 'কোথায়?'

পরের পনোরো মিনিট ধরে কালুভাই আর তাঁর মেয়েরা খুব আনন্দের সঙ্গে আমাকে জানালেন যে, গত এক বছর ধরে একটা কেউটে সাপ এই বাংলোয় বাসা বেঁধেছে। দেখানোর জন্য আমাকে নিয়ে গেলেন ওঁরা। দেখলাম দেয়ালে শুয়ে আছে সাপটা।

সেদিন থেকে রাতে আর ভালো ঘুম হতো না। কুকুরগুলো ডাকতে শুরু করলেই বুঝতে পারতাম সাপটা বাসা থেকে বেরিয়েছে। কেউ দেয়াল টপকে ঢুকছে ভেবে ধড়মড় করে উঠে বসতাম মাঝেমাঝে। আমার সঙ্গে এমন কিছু ঘটছিল, যার কোনো ব্যাখ্যা নেই। নাড়ির গতি হঠাৎ বেড়ে যেত, প্রতি রাতে ঠান্ডা ঘাম দেখা দিত শরীরে। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে যেত, কিছু খাওয়া কঠিন হয়ে উঠত। কোনো পুলিশ অফিসার আমার

আসল পরিচয় জেনে ফেললে কী হবে? এই বাংলোয় আমার ক্ষতি করা অনেক সহজ হবে ওদের পক্ষে।

বিকালে যখন কোনো কাজ থাকত না, কালুভাইয়ের মেয়েরা স্কুলের বইপত্র নিয়ে আমার কাছে আসত। আমি চা বানাতাম, পার্লে জি বিস্কুট দিয়ে চা খেতাম সকালে। কুকুরগুলো আমাকে খুব পছন্দ করত। একটা সময় কুকুরগুরোর সঙ্গে সাপটার খেলা দেখতেও বেশ লাগত। আমি আর কালুভাইয়ের মেয়েরা মিলে সাপটার নাম দিয়েছিলাম মুখিয়া। মেয়েগুলো মুখিয়ার দিকে ঢিল ছুঁড়ত আর দূরে বসে ফোনের ক্যামেরায় ছবি তুলতাম আমি।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

আশোক নারায়ণ

মাইক দিল্লি থেকে ফেরেনি। ওর সঙ্গে দেখা করার জন্য ভারত এসেছিল বাড়ির লোকেরা। ওকে বলে দিয়েছিলাম গুজরাটে ওর কাজ সম্বন্ধে যেন সতর্ক থাকে। এইসময় গুজরাটের আইপিএস অফিসার সঞ্জীব ভাটের বিবৃতি প্রকাশ করে *তেহেলকা*। বিবৃতিটি প্রকাশ করেছিল আমাদের সহকর্মী আশিস খেতান, যে তখন অনুসন্ধান বিষয়ক সম্পাদক ছিল। সঞ্জীব ভাট বলেছিলেন- মোদি সংশ্লিষ্ট পুলিশ অফিসার ও আমলাদের একটি মিটিংয়ে[১] তিনি উপস্থিত ছিলেন, যে মিটিংয়ে ২০০২ সালের দাঙ্গায় মুসলিমদের ইচ্ছেমত হত্যা করার জন্য পুলিশ অফিসারদের স্বাধীনতা দিয়েছিলেন মোদি। গুজরাট দাঙ্গা নিয়ে কর্মরত অধিকাংশ সাংবাদিক, এ্যাকটিভিস্ট ও আইনজীবীরা রীতিমতো বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন। কয়েক ডজন উচ্চপদস্থ আমলা আর অফিসারদের সামনে এই ধরনের নির্দেশ দিয়ে কোনো মুখ্যমন্ত্রীই নিজের রাজনৈতিক জীবনকে বিপন্ন করতে পারেন না। প্রশ্ন ছিল অনেক। এতদিন পর সঞ্জীব ভাট এই বিবৃতি দিলেন কেন? অনেক বছর ধরে গুজরাট নিয়ে রিপোর্টিং করার সময় সঞ্জীব ভাটের সঙ্গে কখনো দেখা হয়নি আমার।

সোমা ফোন করে বলল সঞ্জীব ভাট সম্বন্ধে জানার জন্য ওইসব অফিসারদের ধরা যায় কিনা। এ ব্যাপারে প্রশ্ন করা খুব অস্বস্তিকর। এত সুনির্দিষ্ট একটা বিষয় নিয়ে প্রশ্ন করলে সন্দেহ জাগবেই। আমার মনে আছে সোমাকে বলেছিলাম, নানান কারণে সঞ্জীব ভাটের বক্তব্য আমার বিশ্বাস হচ্ছে না। তবে ওকে বললাম, তাঁর বক্তব্যে কোনো সত্যতা থেকে থাকলে সেটা আমি খুঁজে বের করবই।

গুজরাট দাঙ্গার সময় যাঁরা সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তপ্রণেতা ছিলেন, আমি তাদের সঙ্গে দেখা করতে চাইছিলাম। গুজরাট দাঙ্গার সময় প্রধান ভূমিকা ছিল চারজন ব্যক্তির: হোম সেক্রেটারি আশোক নারায়ণ, পুলিশের

ডিজি চক্রবর্তী, পুলিশ কমিশনার পি.সি. পান্ডে এবং স্বর্ণকান্ত ভার্মা, ২০০২ সালের দাঙ্গার সময় মুখ্যমন্ত্রীর প্রধান উপদেষ্টা ছিলেন যিনি। ইতিমধ্যে আশোক নারায়ণের সঙ্গে দেখা করতে শুরু করেছিলাম।

তেহেলকা'র যে রিপোর্টে সঞ্জীব ভাটের বিবৃতি প্রকাশ হয়েছিল, সেই রিপোর্টেই আমি উপরে যেসব অফিসারদের নাম উল্লেখ করলাম, তাদের সম্বন্ধে বলা হয়েছিল যে নানাবতী কমিশনের জিজ্ঞাসাবাদের সময় এদের সকলের স্মৃতিভ্রংশতা দেখা দিয়েছিল।

১৯৮৮ এর ব্যাচের গুজরাটের আইপিএস অফিসার সঞ্জীব ভাটের বক্তব্য ছিল সেই মিটিংয়ে মি. মোদি উচ্চপদস্থ পুলিশ অফিসারদের বলেছিলেন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে হিন্দুদের ক্রোধ প্রকাশ করতে যেন বাধা দেওয়া না হয়।'

২০১৪ সালের অক্টোবর মাসে সঞ্জীব ভাটের আবেদন নাকচ করে দিয়ে সুপ্রিম কোর্ট জানায় যে, এটা রাজনীতি ও অন্যান্য কার্যকলাপের সাহায্যে আদালতকে প্রভাবিত করার চেষ্টা ছাড়া আর কিছুই নয়। সুপ্রিম কোর্ট বলেন:

> ন'বছর পর এই চাঞ্চল্যকর বক্তব্য প্রকাশ করছেন সঞ্জীব ভাট। কেন তিনি এতদিন এই ই-মেইলগুলি প্রকাশ না করে নীরব ছিলেন তা বুঝে ওঠা দুষ্কর। জাস্টিস নানাবতী কমিশনের সামনেও ই-মেইলগুলি সম্বন্ধে কিছু বলেননি তিনি। বিরোধী রাজনৈতিক দল তাঁর ক্ষমতাকে পুরোপুরি কাজে লাগায়নি, এই মর্মে তিনি ই-মেইল পাঠিয়ে বলছেন, অথবা এই ই-মেইলের কথা ওই কমিশনের কাছে কেন জানানানি সেটারও কোনো ব্যাখ্যা নেই। আবেদনকারীর সামগ্রিক আচরণ আদৌ বিশ্বাসযোগ্য নয়।

মোদি সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সঞ্জীব ভাটকে চাকরি থেকে অব্যাহতি দেয় ২০১৫ সালের আগস্ট মাসে। তাঁর সহকর্মীরা বলেন, সঞ্জীব ভাট বরাবরই

একজন বিতর্কিত চরিত্র, তাঁর দাবিতে স্ববিরোধিতা আছে। তখন ২০০২ সালের অন্যান্য অসমাধিত প্রশ্নের সঙ্গে এই প্রশ্নটাও আশোক নারায়ণকে জিজ্ঞেস করা সবথেকে প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে।

সাক্ষাতের সময় সস্ত্রীক গান্ধীনগরের একটা সুন্দর বাংলোয় থাকতেন আশোক। গুজরাট পুলিশের সুদক্ষ কন্ট্রোল রুমের সৌজন্যে তাঁর কাছে পৌছতে বিশেষ অসুবিধে হয়নি। ২০১০ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষদিকে তাঁর সঙ্গে দেখা করি আমি। ল্যান্ডলাইনে ফোন করে আমার তথ্যচিত্রের কথা জানাই তাকে, যে তথ্যচিত্রে গুজরাটের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের জীবন ফুটিয়ে তোলা হবে। তাকে বললাম, তাঁর কাজকর্ম রীতিমতো চিত্তাকর্ষক, আমার সহকারীকে নিয়ে তার সঙ্গে দেখা করতে চাই আমি।

আশোক নারায়ণের বাড়িতে যাওয়ার আগের রাতে দেখলাম আমার লেন্সের সলিউশন ফুরিয়ে গেছে। রাত তখন আটটা, ঠান্ডায় সাধারণ জিনিসপত্র হাতে ধরাও কষ্টকর, এই সময় বাইরে গিয়ে সলিউশন কিনতে ইচ্ছে হল না। অনলাইনে বিকল্প সলিউশন খুঁজতে লাগলাম আমি। একটা সাইটে বলা হয়েছে লেন্সটা লবন-পানিতে ডোবাতে হবে। পরের দিন সকালে পার্লে জি দিয়ে চা খাওয়ার পর লবন-পানির পাত্র থেকে লেন্সগুলো তুলে নিয়ে চোখে লাগালাম। চোখ জ্বালা করতে লাগল। বুঝলাম খারাপ পরিস্থিতিকে আরও খারাপ করে ফেলেছি আমি। কালুভাইয়ের কাছে বরফের টুকরো চাইলাম। চোখে জ্বালা করছে, লাল হয়ে গেছে। একটা ট্যাক্সি ডেকে ট্যাক্সিচালককে নারায়ণের ঠিকানা বললাম। রাস্তায় অজয়ের কাছ থেকে একটা মেসেজ পেলাম। সে গান্ধীনগরেই আছে, আমি কাছাকাছি আছি কিনা জানতে চাইছে। নারায়ণের স্ত্রী আমাকে স্বাগত জানালেন। ভদ্রমহিলা খুব মিষ্টি স্বভাবের। একটা নামকরা দোকান থেকে দু'একদিন আগে কেনা নিমকিগুলো আমাকে বসে থেকে খাওয়ালেন। বললেন মি. নারায়ণ তৈরি হচ্ছেন। মি. নারায়ণের বয়স এখন সত্তর পেরিয়েছে। দু'কাপ চা খেতে খেতে আমার পারিবারিক জীবন, কানপুরে আমাদের আদি বাড়ি এবং আমি কবে বিয়ে করছি ইত্যাদি নিয়ে গল্প হল।

নারায়ণের স্ত্রী সরল সাদাসিধে মধ্যবিত্ত একজন শিক্ষিতা মহিলা, শান্তিতে ঘরোয়া জীবন কাটাচ্ছেন। তাঁর মেয়েরা বিদেশে থাকে। দুই মেয়ের ছবি দেখালেন আমাকে, বললেন আমি পরের বার এলে তাদের বিয়ের ছবির অ্যালবাম দেখাবেন।

আন্তরিক সুরে 'হ্যালো' বলে ঘরে ঢুকে তাঁর স্ত্রী আমার সঙ্গে যথেষ্ট অতিথেয়তা করেছেন কিনা খোঁজ নিলেন আশোক নারায়ণ। অশোকজির যথেষ্ট বয়স হয়েছে, হয়তো আমার বাবার থেকেও বড়ো। আধ্যাত্মিক মনের মানুষ, 'নিজে বাঁচো, অন্যকে বাঁচতে দাও' নীতিতে বিশ্বাসী। সাহিত্য ও পুরাণে তাঁর জ্ঞান দেখে বিস্মিত হয়ে গেলাম। তিনি একজন কবিও বটে। উর্দু কবিতা ভালোবাসেন। দুটো কবিতার বইও লিখেছেন।

আমি একজন উর্দু লেখকের মেয়ে যিনি তাঁর কাজের জন্য প্রচুর সম্মান পেয়েছেন। নিজেদের বাড়িতে মাহফিল আর মুশায়ারার আসর দেখতে দেখতেই বেড়ে উঠেছি। উর্দু কবিতা আবৃত্তি করে আশোক নারায়ণের কথার উত্তর দিতে ইচ্ছে হচ্ছিল, কিন্তু নিজেকে সামলাতে হল। মৈথিলী একজন রক্ষণশীল সংস্কৃত শিক্ষকের মেয়ে, বিদেশে বড় হয়েছে। তাছাড়া সম্প্রদায় হিসেবে মুসলিমদের খুব একটা পছন্দও করে না মৈথিলী।

কিন্তু গুজরাট দাঙ্গার সঙ্গে জড়িত কর্মকর্তাদের মধ্যে যে গোঁড়ামি ছিল, নারায়ণের মধ্যে তা একেবারেই ছিল না। ধর্মের বিষয়ে অত্যন্ত উদার মনের মানুষ তিনি। আমি উনাকে বলেছিলাম যে আমি প্রায়ই উৎকণ্ঠায় ভুগি, তাই সেদিন রাতেই মেইল করে আধ্যাত্মিকতা সংক্রান্ত একটা ই-বুক আমাকে পাঠিয়ে দেন তিনি। তাঁর মধ্যে এমন একজন মানুষকে দেখেছিলাম যিনি অন্য মানুষদের, অন্য সংস্কৃতি ও ধর্মকে শ্রদ্ধা করেন। এর ফলে গুজরাট দাঙ্গা এবং কথিত বন্দুকযুদ্ধ সম্বন্ধে তাঁর কাছ থেকে আদায় করার ব্যাপারে আরও আশাবাদী হয়ে উঠেছিলাম আমি। এবং পরে তা করতেও পেরেছিলাম। তিনি আমাকে বলেছিলেন গুজরাট হোম সেক্রেটারি হিসেবে তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছিলেন কোনো রাজনৈতিক মিছিল করার অনুমতি দেওয়া হবে না, এমনকী প্রবীণ তোগাড়িয়ার পরিকল্পিত মিছিলকেও নয়। তিনি আরও বলেছিলেন, গুজরাটের অন্যতম

একজন শ্রেষ্ঠ অফিসার রাহুল শর্মাকে সাসপেন্ড করার বিরুদ্ধে ছিলেন তিনি। দাঙ্গার ঠিক পরেই যাকে সাসপেন্ড করেছিল নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বাধীন রাজ্য সরকার।

নারায়ণের সঙ্গে মোট চারদিন কথা হয়েছিল আমার, বেশিরভাগ সময় চা খেতে খেতে কথা হত। একদিন তাঁর স্ত্রীর বানানো দুপুরের খাবার খেতে খেতে কথা হয়েছিল। উনারা যেদিন আমাকে মধ্যাহ্নভোজের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন, সেদিন কিছুটা বিপর্যস্ত ছিলাম আমি। আমাকে নিজেদের মেয়ে বলেই মনে করতে শুরু করেছিলেন উনারা। প্রায়ই বলতেন বাড়িতে উনাদের মেয়েদের না থাকার অভাবটা পূরণ করে দিয়েছি আমি। গুজরাট দাঙ্গায় নীরব উৎসাহ জুগিয়েছিল নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বাধীন রাজ্য প্রশাসন। আত্মপ্রত্যয়ের অভাবে সর্বাত্মকভাবে সেটির বিরুদ্ধে দাড়াতে পারেননি আশোক নারায়ণ। কথাগুলো শুনতে শুনতে বুকের গভীরে কান্না ঝড়ত। না, কথাগুলো আমার সিদ্ধান্ত নয়, আশোক নারায়ণ নিজেই নানাভাবে কথাগুলো বলেছিলেন।

মধ্যাহ্নভোজের দিন উনাদের যথেষ্ট ছবি তোলার জন্য দু'ঘণ্টা সময় চেয়ে নিই। প্রিয় নীল কুর্তাটা পরলাম, ওপরে একটা শাল, হাতে ঘড়ি। ঘড়িতে লাগানো ক্যামেরা চালু হলেই একটা হালকা ফ্লুরোসেন্ট আলো জ্বলে ওঠে। ডায়েরিটাও সঙ্গে নিলাম, তাতেও একটা ক্যামেরা লাগানো আছে। এইসব মিটিংয়ের ক্ষেত্রে কোনও ঝুঁকি নেওয়া যায় না বলে একাধিক ক্যামেরা রাখতে হয়।

পৌঁছে দেখলাম খাবার তৈরি। সেইদিনই তাঁর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব অর্থাৎ গুজরাট হোম সেক্রেটারি হিসেবে তাঁর কাজকর্ম নিয়ে কথা বলতে শুরু করি। পরিবেশটা একেবারে উপযুক্ত থাকায় খেতে খেতে অন্য নানান হালকা আলোচনার মতো করেই তুললাম সেই প্রসঙ্গটা। নিঃসঙ্কোচে কথা বলে চললেন নারায়ণ।

মধ্যাহ্নভোজের পর যখন চা এল, ততক্ষণে আমরা দাঙ্গার সময় কীভাবে কাজ করেছিলেন নরেন্দ্র মোদি, সেই প্রসঙ্গে এসে পৌঁছেছি। আমি

বললাম, 'দেখুন মি. নারায়ণ, গত এক সপ্তাহ ধরে আমি আপনার ব্যাপারে গুগ্‌ল সার্চ করেছি। তাতে দেখেছি গুজরাট দাঙ্গা, নরেন্দ্র মোদি, বিভিন্ন কমিশন সংক্রান্ত নানান লিংকে আপনার নামটা চলে আসছে। ব্যাপারটা খুব বিভ্রান্তিকর লাগছে আমার কাছে। গুজরাট দাঙ্গার সময় এত বিতর্কিত যে মানুষটা প্রায় অন্যায়ের পক্ষেই ছিলেন, তাঁর সঙ্গে কাজ করাটা আপনার পক্ষেও নিশ্চয়ই খুব কঠিন ছিল। আপনার মতো এত আদর্শবাদী, এত মানবিক একজন মানুষকে কত কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে, আমি তো ভাবতেও পারি না।'

অতঃপর শুরু হল কথোপকথন:

প্র: (দাঙ্গা নিয়ন্ত্রণ করার সময়) মুখ্যমন্ত্রী যখন আপনাদের ধীরে চলার নির্দেশ দেন, তখন নিশ্চয়ই আপনার খুব খারাপ লেগেছিল?

উ: উনি নিজে বলতেন না। লিখিতভাবেও কোনো নির্দেশ দিতেন না। ওর লোকজনেরা ছিল, তাদের কাছ থেকে নির্দেশ আসত বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কাছে, তারপর তাদের কাছ থেকে নানান সূত্রে নির্দেশ চলে যেত নীচুতলার পুলিশ ইনস্পেক্টরদের কাছে।

প্র: তখন আপনারা অসহায় হয়ে পড়লেন?

উ: একেবারেই তাই। আমরা বলতাম, 'আহ্, কেন এমনটা ঘটল', কিন্তু ততক্ষণে যা হওয়ার হয়ে যেত।

প্র: তাহলে তদন্ত কমিশন কোনো প্রমাণই পাবে না?

উ: অনেক সময় মন্ত্রীরা রাস্তায় দাঁড়িয়ে মানুষকে খেপিয়ে তুলতেন। আমি ওর (মুখ্যমন্ত্রীর) ঘরে বসে থাকার সময় একবার এরকম একটা ঘটনা ঘটেছিল। একটা ফোন এল। আমি ওকে বললাম, একজন মন্ত্রী এরকম কাজ করছেন। তখন উনি (তাকে) ডেকে পাঠালেন। অন্তত সেইবার তিনি (মোদি) ডেকে পাঠিয়েছিলেন (একজনকে)।

প্র: তিনি কি বিজেপির মন্ত্রী ছিলেন?

উ: হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওর নিজের দলের মন্ত্রী।

প্র: আচ্ছা, মায়া কোদনানি নামেও তো একজন ছিলেন। শুনেছি তিনি প্রচন্ড সরকারবিরোধী হয়ে উঠেছিলেন?

উ: হ্যাঁ, ঠিক।

প্র: গোটা ব্যাপারটা কি ক্ষিপ্ততার রূপ নিয়েছিল?

উ: তাহলে তোমাকে নিজের অভিজ্ঞতা থেকে কিছু বলি। একজন মুসলিম সিভিল সার্ভিস অফিসারের সঙ্গে পরিচয় ছিল আমার, একজন অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার। তিনি আমাকে ফোন করে বললেন - স্যার, আমাকে বাঁচান, আমার বাড়ি ঘিরে ফেলেছে ওরা। আমি পুলিশ কমিশনারকে ফোন করলাম...... তিনি কিছু করেছিলেন কিনা জানি না, তবু ওই মানুষটা বেঁচে গিয়েছিলেন। পরের দিন অফিসারটি আবার আমাকে ফোন করে বলেন - স্যার, গতকাল আমি কোনোমতে বেঁচে গেছি, তবে আজ আর বাঁচব বলে মনে হচ্ছে না।

তখন আবার কমিশনারকে ফোন করে ওকে রক্ষা করতে বললাম। পনেরো দিন পর অফিসারটি আমার কেবিনে এসে বললেন - স্যার, আবারও সেই একই ব্যাপার। মহল্লায় হিন্দুরা সংখ্যাগুরু, প্রচুর মুসলিমকে মেরে ফেলা হয়েছে। 'আপনি ফোন করার পর পুলিশ আসে। বাইরে একজন মন্ত্রীর নেতৃত্বে একদল লোক দাঁড়িয়ে ছিল। পুলিশ অফিসার মন্ত্রীকে দেখে স্যালুট করলেন। মন্ত্রী পুলিশ অফিসারকে দেখে বললেন, সব ঠিক আছে। পরে একজন পুলিশ অফিসার আমাকে চিনতে পেরে বাঁচিয়ে দেন।'

প্র: ওই মন্ত্রীটি কি এখন জেলে আছেন?

উ: ওরা সবাই বাইরে আছে। কিন্তু কাউকে না কাউকে তো কাজটা করতে হত। কেউ কোনো স্বাক্ষ্যপ্রমাণ না দিলে তো কাউকে গ্রেপ্তার করা যায় না।

প্র: প্রমাণ দেওয়ার সাহস কারুর ছিল না?

উ: না, ছিল না।

প্র: মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে কে ব্যবস্থা নেবে?

উ: দেখো, হোম সেক্রেটারি হিসেবে আমার মেয়াদ শেষ হওয়ার পর ভিজিল্যান্স কমিশনার হই আমি। তুমি তো জানো প্রত্যেক রাজ্যে লোকায়ুক্ত আছে, যারা মন্ত্রীদের কাজকর্মের ওপর নজর রাখে। তো একদিন আমি গেলাম। সত্যি বলতে কী এসি কামরোঁ মেঁ মক্ষিয়াঁ নেহি হোতা, নইলে হয়তো বলতাম যে উয়ো মক্ষিয়াঁ মার রহে থে।

আমি বললাম - খবর কী?

ওরা বলল - স্যার, আমরা কী করব? মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে কেউ কোনো অভিযোগই করছে না। যেখানে ঘুষ নেওয়া বা দুর্নীতির মতো ব্যাপারেই মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে কিছু বলতে চায় না লোকেরা, সেখানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় যুক্ত মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে তাঁরা মুখ খুলবে কী করে? কিসকি শামাত আয়ি হ্যায়?

ওরা নিজে থেকে এগিয়ে এলে তবেই হতে পারে। ওরা খুব চালাক। ফোন করে অফিসারদের বলত, 'ওই এলাকার দিকে নজর রাখুন।' সাধারণ লোকে ভাববে এর মানে হল, 'নজর রাখুন যেন ওই এলাকায় দাঙ্গা না হয়, কিন্তু আসল মানে হল, 'নজর রাখুন যেন ওই এলাকায় দাঙ্গা হয়।' ওরা নিজেরা কিছু করে না, ওদের বহু বহু এজেন্ট আছে। আরও দেখো, এফআইআর করা হয়েছে জনতার নামে। জনতাকে গ্রেপ্তার করা কি সম্ভব?

প্র: দাঙ্গার তদন্ত করার জন্য গঠিত কমিশনগুলো কিছু করে উঠতে পারেনি?

উ: নানাবতী কমিশন গঠন করা হয়েছিল, এখনও কিছু পাওয়া যায়নি, কমিশন এখনও পর্যন্ত কোনো রিপোর্ট দিতে পারেনি।

হোম সেক্রেটারি থাকার সময় আমি নির্দেশ দিয়েছিলাম, লিখিত নির্দেশ না দিলে কোনো কিছুই করা যাবে না। যখন বন্ধ ডাকা হল, তখন চিফ সেক্রেটারি সুব্বারও আমাকে ডেকে পাঠিয়ে বললেন, ভিএইচপি নেতা প্রবীণ তোগাড়িয়া একটা মিছিল করতে চান, এ ব্যাপারে আপনি কী বলেন। আমি বললাম, স্যার, এরকম কোনো অনুমতি দেওয়া যাবে না, কারণ তাহলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনের বাইরে চলে যাবে। কথাটা মুখ্যমন্ত্রীর কানে যায়। তিনি বললেন, একথা আপনি কি করে বললেন? ওদের অনুমতি দিতেই হবে। আমি বললাম, ঠিক আছে, তাহলে আমাকে লিখিত নির্দেশ দিন। উনি (মোদি) শুধু আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন।

গুজরাটে হিন্দুত্ববাদের উত্থানের ক্ষেত্রে নরেন্দ্র মোদি এবং প্রবীণ তোগাড়িয়ার নাম একসময় সমার্থক ছিল। নরেন্দ্র মোদি এবং ড. প্রবীণ তোগাড়িয়া একসঙ্গে রাজ্যের রাষ্ট্রীয় সেবক সংস্থার শাখাগুলিতে যেতেন। এ ব্যাপারে বহুশ্রুত একটা ঘটনা হল - এই দু'জন একবার সঙ্ঘের

মতাদর্শ প্রচারের জন্য বাইকে বা স্কুটারে করে পুরো গুজরাট ঘুরে বেড়িয়েছিলেন। তোগাড়িয়া সবসময় বাইকটা চালাতেন আর মোদি পিছনে বসতেন। তোগাড়িয়া একজন ক্যান্সার সার্জন, ১৯৮৩ সালে বিশ্ব হিন্দু পরিষদে যোগ দেন তিনি। আর পূর্ণ সময়ের প্রচারক মোদি বিজেপিতে যোগ দেন ১৯৮৪ সালে। কেশুভাই প্যাটেল যখন মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন, তখন এরা দু'জনেই কোর কমিটিতে ছিলেন। এই কমিটিই সরকার পরিচালনা সংক্রান্ত যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করত। শংকরসিং বাঘেলা যখন কেশুভাইয়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন এবং তোগাড়িয়াকে জেলে পাঠান, তখন মোদি তাঁর পাশে দাঁড়ান।

১৯৯৫ থেকে ২০০২ সাল পর্যন্ত রাজ্য থেকে প্রায় নির্বাসিত ছিলেন মোদি, গুজরাটে সম্পূর্ণ অনাস্থাভাজন হয়ে উঠেছিলেন তিনি। তখন তিনি অধিকাংশ সময়টা কাটাতেন বিজেপি অফিসের বদলে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের অফিসে। সে সময় বিজেপি অফিসে কেউ তাকে পছন্দ করত না। একটা রিপোর্টে[১০] বলা হয়েছে, ২০০১ সালের অক্টোবর মাসে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে মোদিকে গুজরাটে নিয়ে আসার জন্য তোগাড়িয়াকে রাজি করান আদবানি। এই পরিবর্তনটা মেনে নেন তোগাড়িয়া এবং নিজের ডান হাত গোরধন জাদাফিয়াকে মোদির মন্ত্রীসভায় অভ্যন্তরীণ বিষয়ক মন্ত্রী হিসেবে নিযুক্ত করেন। দলের পুলিশ অফিসারদের কোথায় কোথায় পোস্টিং দেওয়া হবে, সে ব্যাপারে তোগাড়িয়ার মতামত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। গোধরার ঘটনার পর ২০০২ সালের ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ও বাজরং দলের কর্মীরা যখন সারা রাজ্য জুড়ে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে, তখন এইসব পুলিশ অফিসারদের মধ্যে অনেকের ভূমিকাই অত্যন্ত সন্দেহজনক ছিল।

হার্দিক প্যাটেল নামক প্যাটেল সম্প্রদায়ের ২১ বছর বয়সী একজন ত্রাণকর্তা সংরক্ষণের প্রশ্নে সারা রাজ্য অচল করে দেন। খাপ থেকে তলোয়ার বের করে একজন নিউজ রিপোর্টারকে হার্দিক বলেন, আজ পর্যন্ত তিনি কতজনের হাত কেটে নিয়েছেন রিপোর্টারটি তা জানেন কিনা। অনেকের ধারণা হার্দিককে সৃষ্টি করেছেন কেশুভাই প্যাটেল আর

প্রবীণ তোগাড়িয়া, যাদের দু'জনকে পরে গুজরাটে প্রায় অপ্রাসঙ্গিক করে দেন মোদি। শোনা যায়[11] গুজরাটের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী এবং মোদির ঘনিষ্ঠ সহযোগী আনন্দীবেনকে উৎখাত করার জন্যই হার্দিককে দাঁড় করানো হয়েছিল। আনন্দীবেন নিজেও একজন প্যাটেল। মোদি গুজরাটে প্রবেশ করার আগে কেশুভাই যে অবস্থায় ছিলেন, আনন্দীবেনও এখন ঠিক সেই অবস্থায় পড়েছেন।

২০০২ সালের গুজরাট দাঙ্গা ও তাঁর পরবর্তী সময়ে হিন্দুদের ক্রমাগত উস্কানি দিয়েছে প্রবীণ তোগাড়িয়া। আর ওদিকে হত্যার জন্য উন্মত্তভাবে ছুটে বেড়িয়েছে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সদস্যরা। গুজরাটে প্রদত্ত এক বক্তৃতায়[12] তোগারিয়া বলেন:

> গোধরায় সন্ত্রাস সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছিল কারণ এই দেশ গান্ধীকে অনুসরণ করে। ২৮ ফেব্রুয়ারি আমরা গান্ধীকে তালাবন্ধ করে দিয়েছি। (মুসলিমরা) নিজেদের শোধরাও, নইলে আমরা গান্ধীকে চিরদিনের মতো ভুলে যাব। যতদিন আমরা গান্ধীর অহিংসার নীতি মেনে চলব, যতদিন মুসলিমদের কাছে নতজানু হয়ে থাকব, ততদিন সন্ত্রাসবাদকে দূর করা সম্ভব না। ভাইয়েরা, গান্ধীকে আমাদের ত্যাগ করতে হবে। আপনারা রামায়ণের গল্প জানেন, গোধরার ঘটনার সঙ্গে তাঁর তুলনা করা যায়। সকাল সাতটা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে পুড়ে যাওয়া এস-৬ কোচটা হনুমানজির লেজে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল।

শ্রোতারা হাততালি দিয়ে ধ্বনি তুলল 'জয় শ্রীরাম'। তারপর সেই রাতে জড়ো হওয়া হাজার হাজার মানুষের উদ্দেশ্য তিনি বললেন:

> হনুমানের লেজে আগুন দিয়েছিল কে? রাবণ। হনুমানজী একটু বেড়াতে বেরিয়েছিলেন। আমরা শুনেছি তিনি গোধরায় এসেছিলেন (জনতা হেসে উল্লাসধ্বনি দিল)। হনুমানজী হালোল, কালোল, সর্দারপুরায় এসেছিলেন এবং কর্ণাবতীতে

> (আহমেদাবাদ) রয়ে গেছেন। সেখান থেকে আর ফিরে যেতে চাননি।

অর্থটা পরিষ্কার, রাবণ বলতে মুসলিমদের বোঝানো হয়েছে। এটা ছিল গুজরাটে মুসলিমদের হত্যা করার রণহুঙ্কার। তোগাড়িয়া যখন জঘণ্য কাজটা করে চলেছিলেন, মোদি তখন অধিকাংশ হিন্দুদের কাছে আরও বেশি করে 'হিন্দু হৃদয়সম্রাট' হয়ে উঠছিলেন। এইসব হিন্দুদের সারাক্ষণ মনে করিয়ে দেওয়া হচ্ছিল যে মুসলিমরা তাদের শেষ করে দিতে চায়। তবে মোদি মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার কয়েকদিনের মধ্যেই দু'জনের এই অন্তরঙ্গতার অবসান ঘটে। দু'জনের সম্পর্কে ফাটল ধরে।

টাইমস্ অফ ইন্ডিয়ার একটি প্রতিবেদনে বিষযটা চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে:

> ২০০২ সালে ডিসেম্বর মাসের বিধানসভা নির্বাচনে একটি হেলিকপ্টারে করে প্রায় দু'সপ্তাহ একটানা ঘুরে বেড়িয়ে বিজেপির সমর্থনে ১০০টিরও বেশি জনসভায় ভাষণ দেন তোগাড়িয়া। নির্বাচনে মোদির জয়লাভের পর ছবিটা উল্টে যায়। জাদাফিয়াকে নিজের মন্ত্রীসভা থেকে সরিয়ে দেন মোদি। আসলে এই পদক্ষেপের সাহায্যে তোগাড়িয়াকে বার্তা দেওয়া হয় যে সরকার পরিচালনায় তাঁর হস্তক্ষেপ আর বরদাস্ত করা হবে না। তোগাড়িয়া এবং সংঘ পরিবারের অন্যান্য সংগঠনের সঙ্গে আলোচনার প্রক্রিয়া বন্ধ করে দেওয়া হয়।

আশোক নারায়ণের সঙ্গে দেখা করে গুজরাট দাঙ্গা সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য রেকর্ডের চেষ্টা করার দিনকয়েকের মধ্যেই তাকে জানালাম, দাঙ্গার সময় থেকে তাঁর বন্ধু ও বিশ্বস্ত সঙ্গী মি. চক্রবর্তীর সঙ্গে দেখা করতে চাই আমি। মি. চক্রবতী সেইসময় গুজরাট পুলিশের ডিজি ছিলেন। নারায়ণ ও তাঁর স্ত্রী যখন বলছিলেন সেই ভয়ংকর দিনগুলোতে নারায়ণের একমাত্র বন্ধু চক্রবর্তী কীভাবে তাঁর জীবনকে কিছুটা সহনীয় করে তুলেছিলেন, তখনই তাঁর ভূমিকা সম্বন্ধে জানার কৌতুহল হয় আমার। এটা সেই

সময়ের কথা যখন অধিকাংশ পুলিশ অফিসারই মোদি প্রশাসনের কাছে নিজেদের ন্যায়পরায়ণতা বিকিয়ে দিয়েছিলেন। চক্রবর্তীর সঙ্গে কথোকথনের কথা পরবর্তী পরিচ্ছেদে বলা হবে, কিন্তু অশোক নারায়ণের সঙ্গে কথাবার্তার বাকি অংশগুলো এখানেই পাঠককে জানানো দরকার। ইতিমধ্যে চক্রবর্তীর সঙ্গে মুম্বাইতে দেখা করেছিলাম, তাঁর সঙ্গে প্রথম মিটিংটাও সেরে ফেলেছিলাম। যার ফলে নারায়ণের সঙ্গে গুজরাট দাঙ্গা এবং অন্যান্য অফিসারদের প্রসঙ্গে আলোচনা করা অনেক সহজ হয়ে উঠেছিল। সন্দেহ জাগার সম্ভাবনাও কমে গিয়েছিল।

প্র: চক্রবর্তী কি সত্যিই খুব বিতর্কিত ব্যক্তি?

উ: দেখো, উনি পুলিশের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ছিলেন, ফলে যাকিছু ঘটেছে তাঁর দায় তো চক্রবর্তী আর হোম ডিপার্টমেন্টের ওপরেই এসে পড়বে। এমনকী হিউম্যান রাইটস্ ডিপার্টমেন্টও এটাকে একটা সাংবিধানিক আনুকূল্য বলেছিল, ফলে আমরা সকলেই এর আওতায় পড়ে যাই। সঞ্জীব ভাট আইবিতে ছিলেন। চক্রবর্তী তখন ডিজি ছিলেন।

প্র: আপনি কি ওই মিটিংটায় ছিলেন না?

উ: কোন মিটিং?

প্র: শুনেছি অত্যন্ত বিতর্কিত একটা মিটিং এ সব অফিসার আর আমলাদের (দাঙ্গা থামানোর ব্যাপারে) ধীরে চলার নির্দেশ দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মোদি।

উ: হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই মিটিংয়ে আমি ছিলাম। তোমাকে তো বলেছি।

প্র: সিট আপনাকে ডেকে পাঠায়নি?

উ: হ্যাঁ, ডেকে পাঠিয়ে কড়া জেরা করেছিল।

সেজন্য চক্রবর্তী বলেছিলেন যে ওই মিটিংটা সকলকে নিষ্ক্রিয় করে দিয়েছিল। সেই মিটিং এ চক্রবর্তীও ছিলেন।

প্র: চক্রবর্তী বলেছেন, পি.সি. পান্ডের মতো মুখ্যমন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ কিছু অফিসার রেহাই পেয়েছেন।

উ: না, তবে পরে সিটের তদন্তের ফলে পি.সি. পান্ডে বিতর্কিত হয়ে ওঠেন।

প্র: কিন্তু আমি শুনেছি তিনি নাকি মুখ্যমন্ত্রীর খুব কাছের লোক?

উ: সেটা সত্যি, তবু এমনটাই ঘটেছিল। শাসক দলের অনুগত হয়ে উঠতে পারলে আর কোনো সমস্যা থাকে না।

প্র: উনি কি পুরোপুরি মুখ্যমন্ত্রীর নিজের লোক?

উ: হ্যাঁ, তা না হলে তাকেও চক্রবর্তীর মতো ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হত। যেমন আমাকে টপকে অন্যজনকে এনে আমার রিটায়ার করাতে চেয়েছিল ওরা। আমার জুনিয়রকে চিফ সেক্রেটারি করতে চেয়েছিল।

প্র: কী বিশ্রী অবস্থা।

উ: তখন আমাকে ভিজিল্যান্স কমিশনার করে দেওয়া হয়।
(তাঁর স্ত্রী বললেন) শুধু ওকেই নয়, আরও তিনজন অফিসারকে টপকে অন্যদের উঁচু পদে তুলে দেওয়া হয়েছিল।

প্র: যে শ্রীকুমারের কথা আপনি বলেছিলেন, তাঁর মতো?

উ: হ্যাঁ। তোমার ফিল্মের জন্য অনেক মশলা দিতে পারবেন উনি। বেশির ভাগই সংবেদনশীল, মশলাগুলো মিশ্রিত সত্য। মজার ব্যাপার হল, দাঙ্গার সময় একটা সাইড পোস্টিংয়ে ছিলেন শ্রীকুমার। দাঙ্গার পর আমার আর চক্রবর্তীর সুপারিশে ওকে এখানে যোগ দিতে বলা হয়। শ্রীকুমারকেও সিবিআই এর জেরার মুখে পড়তে হয়েছে।
কিন্তু পরে উনি এমন সব ঘটনা সম্বন্ধে কথা বলতে শুরু করেন যেসব ঘটনার কথা উনি ব্যক্তিগতভাবে জানতেন না। ফলে উনাকে টপকে অন্যজনকে উনার পদে বসিয়ে দেওয়া হয়। আসলে মুখ্যমন্ত্রী উনাকে সাসপেন্ড করতেই চেয়েছিলেন। আমরা নিষেধ করি। মনে হচ্ছিল উনি যেন সংবাদমাধ্যমের জন্যই কাজ করছেন। অনেক গোপন খবর সংবাদমাধ্যমকে জানিয়ে দিতেন।

প্র: কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর এত সমালোচনা করা হল কেন? উনি বিজেপিতে আছেন বলে?

উ: না, দাঙ্গার সময় উনি বিশ্ব হিন্দু পরিষদকে সমর্থন করেছিলেন বলে। হিন্দু ভোট পাওয়ার জন্যই এটা করেছিলেন উনি এবং তা পেয়েছিলেন। যা করতে চেয়েছিলেন তাই করেছিলেন উনি, আর তাঁর ফল তো আমরা দেখেছিই।

প্র: কিন্তু তিনি লোকেদের ধীরে চলতে বলেছিলেন?

উ: ওই মিটিংয়ে এই কথাটা বলা তাঁর উচিত হয়নি। কথাটা শুধু তাঁর নিজের লোকেদেরই বলতে পারতেন। ভিএইচপি-কে বলতে পারতেন, তারপর ট্যান্ডনের মতো অফিসার আর অন্য

অফিসারদের। যেকোনো অফিসারই সরকারি নির্দেশ মানতে বাধ্য।

প্র: চক্রবর্তী কি সরকারি নির্দেশ মানেননি?

উ: আমরা দু'জনই মানিনি। আমরা আমাদের কাজ করেছিলাম। আমি ওদের বলেছিলাম, চাকরিতে যোগ দিয়েছিলাম মানুষের সেবার জন্য, শাসক দলের সেবা করার জন্য নয়।

প্র: অন্যরা এমনটা করলেন না কেন?

উ: কারণ ওদের নানান ধান্দা ছিল, সমাঝোতা করতেই হত। চক্রবর্তীর মতো লোকেদের কথাটা একবার ভেবে দেখো। ওরা প্রমোশন পায়নি, ওদের বিদেশে পাঠানো হয়নি, অথচ নিজের বিবেক যেমনটা বলেছিল তেমনভাবেই কাজ করেছিল চক্রবর্তী।

প্র: এই বিতর্কিত মিটিংটার কথা বাইরের লোকেরা কী করে জানল?

উ: মন্ত্রী হরেন পান্ডিয়াও মিটিংয়ে ছিলেন, উনি প্রথম সংবাদমাধ্যমের কাছে মিটিংটার কথা ফাঁস করেন।

প্র: মিটিংয়ে কারা কারা ছিলেন?

উ: সিএম, এসিএস, হোম সেক্রেটারি, ডিজিপি ও অফিসাররা।

উপরের কথোপকথন থেকে একজন সাধারণ মানুষও বুঝতে পারবেন গুজরাট দাঙ্গায় রাজ্য প্রশাসন কতখানি জড়িত ছিল। আশোক নারায়ণ আমাকে যা বলছিলেন তা আমরা অনেকেই জানি, কিন্তু সরকারি মহলের কেউ কথাগুলো এর আগে বলেননি। কথাগুলো বলছেন এমন একজন মানুষ, গুজরাট দাঙ্গার সময় বহুজনের দৃষ্টি যার প্রতি নিবদ্ধ ছিল। গুজরাট দাঙ্গা এবং নরেন্দ্র মোদির ক্ষেত্রে তাঁর তাৎপর্য সম্বন্ধে এই সাবেক হোম সেক্রেটারি যা বলেছেন তাঁর সমাজতাত্ত্বিক ও রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতটি আরও বেশি অর্থবহ। তথ্যের সঙ্গে গালগল্প মেশানোর চেষ্টা তিনি কখনোই করেননি, যা থেকে বোঝা যায় তিনি সত্যভিত্তিক কথাই বলেছেন। শ্রীকুমার যেভাবে সাংবাদমাধ্যমের কাছে নানান ঘটনার ব্যাপারে মুখ খুলেছিলেন, সে সম্বন্ধে নিজের আশঙ্কার কথা বলেছেন তিনি, কিন্তু কখনোই বলেননি যে মুসলিমদের বিরুদ্ধে অভিযান শুরুর নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী। বরং তিনি এই ইঙ্গিতবহ কথাটি বলেন যে, এইসব নির্দেশ অফিসারদের ব্যক্তিগতভাবে দেওয়া হয়েছিল, যে অফিসাররা নানারকম সুবিধা পেয়েছেন প্রশাসনের কাছ থেকে।

সামনে বসে এই সুভদ্র, আত্মগরিমাহীন মানুষটির কথা শুনছিলাম। এমন অনেক কথা তিনি আমাকে বলেছিলেন যা নানাবতী কমিশনের জেরার মুখেও বলেননি।

উঃ বিজেপির নির্দেশে ভিএইচপি বনধ ডাকল আর তা থেকেই গোটা ব্যাপারটার সূত্রপাত হল।

প্রঃ সেটা সামলানো নিশ্চয়ই আপনাদের পক্ষে খুব কঠিন ছিল?

উঃ হ্যাঁ, বিজেপি থেকে নির্দেশ না গেলে সামলানো খুব কঠিন হয়ে যেত।

প্রঃ মোদির সম্বন্ধে মানুষের কী ধারনা?

উঃ তাকে ভক্তির চোখে দেখা হয়। গোঁড়া হিন্দুরা মনে করে উনিই পতাকাটা বহন করে নিয়ে চলেছেন।

প্রঃ তাঁর ভূমিকাটা কি একেবারে একপক্ষীয় ছিল না?

উঃ গোধরার ঘটনার জন্য উনি ক্ষমা চাইতে পারতেন, দাঙ্গার জন্য ক্ষমা চাইতে পারতেন।

প্রঃ আমি শুনেছি মোদির ভূমিকা সম্পূর্ণ একপক্ষীয় ছিল, অর্থাৎ উনি প্ররোচনা দিয়েছেন, যেমন গোধরা থেকে মৃতদেহগুলো নিয়ে আসা, সিদ্ধান্ত নিতে অনর্থক সময় নষ্ট করা।

উঃ আমি বিবৃতি দিয়ে বলেছিলাম যে মৃতদেহগুলো আহমেদাবাদে নিয়ে আসার সিদ্ধান্তটা তারই ছিল।

প্রঃ তাহলে তো প্রশাসন নিশ্চয়ই আপনার বিরুদ্ধে চলে গিয়েছিল?

উঃ মৃতদেহগুলো আহমেদাবাদে আনার ফলেই চারদিকে আগুন জ্বলে উঠেছিল, কিন্তু এ সিদ্ধান্ত উনিই নিয়েছিলেন।

আমাদের কথাবার্তা চলার সময়েই একজন আগন্তুক দেখা করতে এলেন আশোক নারায়ণের সঙ্গে অপ্রত্যাশিতভাবে। নাম কৈলাশানাথ, সেইসময় নরেন্দ্র মোদির সবথেকে কাছের মানুষ এবং তাঁর মুখ্য উপদেষ্টা ছিলেন যিনি। মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরে আশোক নারায়ণ খবর পাঠিয়েছিলেন যে হিমাচল প্রদেশের আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে দাঁড়াতে চান তাঁর শ্যালক, সেই সূত্রেই এসেছিলেন কৈলাশনাথ। গুজরাটে আসার আগে হিমাচল প্রদেশের দায়িত্বে ছিলেন মোদি এবং তখন হিমাচল প্রদেশেও যথেষ্ট প্রভাব ছিল তাঁর।

খুব বিড়ম্বনাময় একটা অবস্থা। এই জন্যই কি অফিসাররা সর্বাত্মকভাবে নরেন্দ্র মোদির বিরুদ্ধে যেতে চান না? এই সদাশয় বদান্যতার জন্য? ভাবতে খুব অস্বস্তি লাগছিল। মুখ্য উপদেষ্টা চলে যাওয়ার পর আশোক নারায়ণের স্ত্রী আমাকে বললেন কত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি উনি। আরও বললেন, ফিল্ম তৈরির ব্যাপারে কোনো সমস্যায় পড়লেই যেন তাঁর সাহায্য চাই।

কৈলাশনাথ চলে যাওয়ার পর আবার আশোক নারায়ণের সঙ্গে কথাবার্তা শুরু হল।

প্র: আপনার কাজের সবথেকে চ্যালেঞ্জিং বিষয় কোনটা ছিল?

উ: দাঙ্গায় এত মানুষ খুন হয়ে গেল এটা ভেবে সবসময়েই কষ্ট হত। যেমন, অনেক সাংবাদিক প্রশ্ন করতেন আমরা পদত্যাগ করিনি কেন? আমি তাদের বলতাম, নিজেকে অপরাধী মনে হলে অবশ্যই পদত্যাগ করতাম।

প্র: কিন্তু তাঁরা তো ভুল কিছু বলেননি, রাজনৈতিকভাবে পরিবর্তনশীল একটা অবস্থায় ফাঁদে পড়ে গিয়েছিলেন আপনি....

উ: কোনো রাজ্য সরকারকে এরকম দাঙ্গার মুখোমুখি হতে হয়নি। দাঙ্গার (নিয়ন্ত্রণের) জন্য আমাদের মাত্র চারটি কোম্পানি ছিল। এমনকী সিআরপিএফ-ও যোগ্য নয়, কিন্তু অন্তত একটা টিমকে পেলেও আমাদের উপকার হত। আবার কেন্দ্রেও ছিল বিজেপি সরকার।

প্র: তাঁর মানে মুখ্যমন্ত্রী অনায়াসেই আরও বাহিনী চাইতে পারতেন? কেন্দ্র আর রাজ্য সরকারের মধ্যে সংযোগ রেখেই সব কাজ হয়েছে?

উ: সংযোগ তো ছিলই। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী ইচ্ছে করলে যেকোনো সময় মি. আদবানির সঙ্গে কথা বলতে পারতেন।

প্র: শুনেছি তাঁরা দু'জনে নাকি ভালো বন্ধু?

উ: হ্যাঁ খুবই ভালো বন্ধু। এটাও একটা ব্যাপার।

প্র: কোনো বাহিনী ছিল না আপনি এটা মুখ্যমন্ত্রীকে জানাননি?

উ: উনি সবই জানতেন। তোমার কি ধারণা উনি জানতেন না? হিন্দুদের আচরণে ভীষণ দুঃখ পেয়েছিলাম আমি..... নির্লজ্জভাবে বাড়িঘরে লুঠপাট চালাচ্ছে, গাড়ি নিয়ে এসে লুঠপাট চালাত ওরা....মানুষ কতটা নীচে নামতে পারে!

প্রঃ কেন এমন খেপে গেল তাঁরা?

উঃ গোধরার ঘটনার জন্য।

প্রঃ নিশ্চয়ই খুব ঝামেলা গেছে... একই লোকদের কাছে রিপোর্ট দেওয়া।

উঃ আমাকে অন্যায় কিছু করতে বলার মতো সাহস ওদের ছিল না।

প্রঃ সরকার নিশ্চয়ই আপনার উপর খেপে গিয়েছিল?

উঃ তা তো গিয়েই ছিল। আমি বলেছিলাম সব নির্দেশ লিখিতভাবে দিতে হবে। নীচের তলার অফিসারদের কথাটা ভাবো। এই ধরনের অপরাধের সঙ্গে যুক্ত রাজনীতিবিদদের গ্রেপ্তার করার অধিকার সবারই আছে, কিন্তু অধিকাংশ জনই রাজনৈতিক চাপে পড়ে সমঝোতা করতে বাধ্য হয়।

প্রঃ দাঙ্গার সময় এমনটাই ঘটেছিল?

উঃ হ্যাঁ। এই মোবাইল ফোনের যুগে আর লিখিত নির্দেশ দেওয়ার দরকার হয় না, স্রেফ ফোনে বলে দিলেই হয়ে যায়।

প্রঃ মুখ্যমন্ত্রী কি আপনাকে ঘৃণা করতেন?

উঃ ঘৃণা করতেন কিনা ঠিক বলতে পারব না, তবে আমার জায়গায় অন্য কেউ আসুক সেটা যে চাইতেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

প্রঃ সবকিছু এক জায়গায় মিলল কী করে? দাঙ্গাটা বাধল কীভাবে?

উঃ সবটাই বিশ্ব হিন্দু পরিষদের পরিকল্পনা। গোধরার ঘটনা আর এই দাঙ্গা, দুটোই জঘন্য ব্যাপার এবং কোনোটাই ন্যায্য নয়।

প্রঃ ট্রেন পোড়ানোর প্রতিক্রিয়াতেই তো দাঙ্গা হয়েছিল।

উঃ ক দিয়ে খ কে ন্যায্য প্রতিপন্ন করা যায় না।

প্রঃ মুখ্যমন্ত্রীর তো পদত্যাগ করার উচিত ছিল। তিনিই যখন মুখ্যমন্ত্রী, তাঁর আমলেই যখন এত কিছু ঘটে গেল।

উঃ একটা সময় মনে হয়েছিল তাঁর পরিবর্তন ঘটেছে। এটা গোয়ার মিটিংয়ের সময়কার কথা। উনি পদত্যাগ করেছিলেন, কিন্তু আদবানির চাপ ছিল। পদত্যাগপত্র গ্রহণ না করার জন্য বাজপায়ীকে চাপ দেন আদবানি। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বাজপায়ীর কাছে দাঙ্গা সম্বন্ধে অনেক কথা বলেছিলাম আমি। মোদিও সেখানে ছিলেন।

প্রঃ মুখ্যমন্ত্রী নিশ্চয়ই তাতে খুব খুশি হননি?

উঃ এটা খুশি-অখুশির বিষয় নয়। যা ঘটেছিল তাই বলতে হত আমাকে। তখন দেখেছিলাম মোদির প্রতি এবং তাঁর ভূমিকার প্রতি বাজপায়ী মোটেই খুশি নন।

প্র: মোদিও নিশ্চয়ই ধীরে চলেছিলেন? তিনি তো তৎপরতা দেখাতে পারতেন। তিনি রাজনীতি করছিলেন।

উ: তখন পদত্যাগ করলে রাজনীতিগতভাবে মোদির লাভই হত। এখন উনি সেই ভাবমূর্তিটা ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করছেন।

প্র: উনি তো ধর্মকে কাজে লাগিয়েই ক্ষমতায় এসেছেন। উনার কথাবার্তা....

উ: ২০০২ সালে উনি ভোট পেয়েছিলেন দাঙ্গার জন্য....উন্নয়নের ভাবমূর্তি গড়ে তোলার ফলে আরও বেশি ভোট পান ২০০৭ সালে।

প্র: অন্যরা কেমন ছিলেন? অফিসাররা?

উ: প্রাক্তন সেক্রেটারি হিসেবে খোলাখুলি বলতে পারি, ডিজিপি মানুষ হিসেবে ভালো ছিলেন, কিন্তু কার্যকরী পুলিশ অফিসার হিসেবে উনি খুবই নরম স্বভাবের। দাঙ্গার সময় রাজনৈতিক হুকুমের কাছে মাথা নোয়াননি উনি। কিন্তু নিজের লোকেদের অর্থাৎ পুলিশ অফিসারদের বাগে আনতে পারেননি তিনি। এমনিতে কিন্তু খুব ন্যায়পরায়ণ ছিলেন। ধরো, অফিসারদের বদলি করার জন্য সরকার চাপ দিল। উনি বলতেন, না, আগে লিখিত নির্দেশ দিন।

প্র: উনি নিশ্চয়ই সরকারের সুনজরে ছিলেন না?

উ: ঠিক। আমার পক্ষে একটা ভালো ব্যাপার ছিল যে দাঙ্গার সময় উনি আমার সঙ্গে ছিলেন, অন্তত একজন পক্ষপাতহীন মানুষ সঙ্গে ছিল। অনেক সাহায্য পেয়েছি উনার কাছ থেকে। বস্তুত মন্ত্রীসভার সব মন্ত্রীরই সব ক্ষমতা থাকে, শুধু কালেক্টর আর ডিএমদের মতো কিছু বিশেষ ক্ষমতা বাদে অন্য সব ক্ষমতাই থাকে। কিন্তু মন্ত্রীরা কোনো অন্যায় নির্দেশ দিলে তাঁর উত্তরে ভারতের সংবিধান তোমাকে 'না' বলার অধিকার দিয়েছে।

প্র: সেই (দাঙ্গার) সময়ে 'না' বলার মতো সাহস কি আপনার ছিল?

উ: আমাদের যা বলার ছিল আমরা বলেছিলাম। এরপর এমন কোনো নির্দেশ দেওয়ার সাহস ওদের ছিল না, লিখিতভাবে তো নয়ই। আমি বলেছিলাম লিখিত নির্দেশ না পেলে কিছু করব না।

প্র: আপনাকে নিশ্চয়ই রাজ্য সরকারের রোষানলে পড়তে হয়েছিল?

উ: তা হয়েছিল। আমাকে চিফ সেক্রেটারি করা হল না। তবে ইন্সপেক্টর আর দারোগাদের মতো অফিসারদের মুখ্যমন্ত্রীসহ

যেকোনো মন্ত্রীকে গ্রেপ্তার করার অধিকার ছিল, কিন্তু ওরা সরকারের পক্ষেই দাঁড়াল।

প্র: তাহলে এটাই ঘটেছিল?

উ: হ্যাঁ। আর মোবাইল ফোনের এই যুগে শুধু ফোনে কী করতে হবে তা ওদের বলে দিলেই চলে। আর অফিসাররা প্রোমোশন নিয়েই বেশি ভাবে। যখন সেনাবাহিনী এলো তখন তাদের অনেক কিছু দরকার ছিল। সত্যি বলতে কী, দাঙ্গা থামানোর জন্য পর্যাপ্ত বাহিনী আমরা পাইনি। সমস্ত বাহিনী অযোধ্যায় ছিল। কেন্দ্রীয় সরকার (তাদেরকে) আমাদের কাছে পাঠায়নি।

প্র: দাঙ্গায় রাজনৈতিক প্রভাব কতটা ছিল?

উ: ওরা সম্পূর্ণ সাম্প্রদায়িক মনোভাবের। ভিএইচপি-র (ডাকা) বনধকে সমর্থন করল শাসক দল। এটা একটা গুরুতর সমস্যা ছিল। সিনিয়র পুলিশ অফিসাররা আমাদের বলেছিলেন, বিজেপি-র কাছ থেকে কোনো রাজনৈতিক বার্তা না এলে কিছুই করা যাবে না। কারণ ওরা মনে করতেন আমরা মানুষের পক্ষে আছি।

প্র: কিন্তু মোদিকে (মোদির জয়) দেখে তো মনে হয় জনসংযোগের জোরেই উনি জিতেছেন?

উ: একদম ঠিক।

প্র: 'ভ্রাইব্র্যান্ট গুজরাট' নিয়ে কত হইচই হল ভাবুন!

উ: (ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালেন উনি)

প্র: কিন্তু উনাকে এত সমালোচনার মুখে পড়তে হচ্ছে কেন?

উ: উনি ভিএইচপিকে সমর্থন করেছিলেন বলেই এত সমালোচনা হচ্ছে। উনার যা করা দরকার ছিল ঠিক তাই করেছিলেন এবং যা চেয়েছিলেন তাই পেয়েছেন। চক্রবর্তীর মতো লোকেরা বাহবা পাননি, পুরস্কার পাননি। কারণ, তাঁরা নিজেদের বিবেক অনুযায়ী কাজ করেছিলেন।

প্র: সকলে কি সত্যিই চিফ সেক্রেটারি জি. সুব্বারাও এর প্রশংসা করছে?

উ: তাই নাকি?

প্র: আমি মজা করছিলাম।

উ: দুর্ভাগ্যবশত সুব্বারাও সরকারকে তুষ্ট করতে চাইছিলেন, মুখ্যমন্ত্রীকে তুষ্ট করতে চাইছিলেন, কিন্তু সেটুকুও করে উঠতে পারেননি (হাসি)।

প্র: কেন?

উ: আমি বলতে চাইছি রিটায়ার করার পরও উনাকে পুরো পাঁচ বছরের চাকরি দিয়েছিল সরকার।

প্র: আচ্ছা, আমার ফিল্মে দাঙ্গার কথা কতটা রাখব?

উ: দ্যাখো, তাহলে তোমার ফিল্মটা বিতর্কিত হয়ে যাবে, কারণ দাঙ্গার বিষয়টাই তো বিতর্কিত।

প্র: তাহলে আপনাদের মুখ্যমন্ত্রীকে দাঙ্গা নিয়ে একটা প্রশ্নও করব না?

উ: যদি করো, তাহলে উনি কথা ঘুরিয়ে দেবেন, তারপর আর কখনো তোমার সঙ্গে দেখা করবেন না।

প্র: আচ্ছা, ভাটের মতো একজন মানুষ মুখ্যমন্ত্রী আর সরকারের বিরুদ্ধে চলে গেলেন কেন?

উ: কোনো কারণ নিশ্চয়ই আছে। তাঁর উর্ধ্বতন কর্মকর্তা নিশ্চয়ই ওকে তেমনটাই বলেছিলেন। উর্ধ্বতন কর্মকর্তার নির্দেশমতোই কাজ করেছেন উনি।

প্র: উনার বিশ্বাসযোগ্যতা কতটা?

উ: উনি একেবারেই বিশ্বাসযোগ্য নন।

প্র: ও হ্যাঁ, মায়া কোদনানি আমাকে জয়ন্তী রবির কথা বলেছিলেন।

উ: ও, আচ্ছা...

প্র: শুনে মনে হল উনি প্রচণ্ড সরকারবিরোধী?

উ: এখন হয়েছেন, আগে ছিলেন না। আগে উনি মুখ্যমন্ত্রীর পক্ষে ছিলেন, সরকারের পক্ষে ছিলেন।

প্র: উনাকে বাঁচানোর জন্যে কেউ এগিয়ে আসেননি বলে উনি নাকি খুব হতাশ হয়ে পড়েছিলেন?

উ: রাজনৈতিক ওপরওয়ালারা কখনো কাউকে বাঁচাতে আসে না।

প্র: উনি তো বলেছেন যে উনি নাকি সম্পূর্ণ নির্দোষ।

উ: দাঙ্গার সময় উনি পুরোপুরি আরএসএসের পক্ষে, মুখ্যমন্ত্রীর পক্ষে, ভিএইচপি-র পক্ষে ছিলেন।

প্র: তাঁর মানে দাঙ্গায় উনি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন?

উ: হ্যাঁ।

প্র: রাহুল শর্মা মানুষটা কেমন?

উ: উনি বিদ্রোহীদের একজন।

প্র: মানে?

উ: উনি কাউকে সাহায্য করেননি, শুধু দাঙ্গা থামানোর চেষ্টা করেছিলেন।

প্র: তাকেও কি ছুড়ে ফেলা হয়েছে?

উ: তাকে বদলি করে দেওয়া হয়। ডিজিপির সুপারিশ, মি. চক্রবর্তীর সুপারিশ এবং সেই সুপারিশকে সমর্থন করা সত্ত্বেও ওকে বদলি করা হয়।

প্র: শুধুমাত্র উনি মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে ছিলেন এই কারনে?

উ: একদম তাই।

এখানে রাহুল শর্মার কথা একটু বলা দরকার। দুই/তিনটা সামাজিক অনুষ্ঠানে অল্পক্ষণের জন্য তাঁর সাথে দেখা হয়েছিল আমার। নিজের উচ্চশিক্ষিতা ও মার্যাদাসম্পন্না স্ত্রীকে নিয়ে রাহুল একজন আইনজীবী বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন তখন তাঁর সঙ্গে প্রথম দেখা হয় আমার। শর্মাকে খুব স্থিতধী মানুষ মনে হয়েছিল। সাংবাদিকদের কাছে নিজের বীরত্বের বড়াই করা যার স্বভাব নয়। তাঁর কাজই তাঁর হয়ে যা বলার বলে দিত। আমি ওখানে যাওয়ার আগে পর্যন্ত নিজের আইনি মামলা নিয়ে মুখ খুলতেন না তিনি। রাজ্য সরকার তখন উঠেপড়ে লেগেছিল তাঁর বিরুদ্ধে। তাকে টপকে অন্যজনকে প্রমোশন দেওয়া হয়, বার্ষিক গোপন রিপোর্টে নেতিবাচক মন্তব্য করা হয় তাঁর সম্বন্ধে, দুটি বিভাগীয় চার্জশিটও দাখিল করা হয় তাঁর বিরুদ্ধে। পরবর্তী সময়ে ২০১৫ সালে তাঁর নির্দিষ্ট সময়ের আগেই অবসর নেওয়ার অনুরোধও গ্রহণ করেনি গুজরাট সরকার।

২০১৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে *ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস* এর একটি রিপোর্টে তাঁর সম্বন্ধে বলা হয়:

> যেসব অফিসার ২০০২ সালে গোধরা দাঙ্গার ঘটনায় রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন, শর্মা তাদেরই একজন। নারোডা পাটিয়া, নারোডা গ্রাম ও গুলবার্গ সোসাইটির গণহত্যার তদন্তকারী হিসেবে অনেক মূল্যবান প্রমান সংগ্রহ করেন তিনি এবং ২০০২ সালের দাঙ্গার তদন্তে সাহায্য করেন। তিনটি বিষয় নিয়ে সেন্ট্রাল এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ট্রাইবুনালে আইনি লড়াই

চালাচ্ছেন তিনি। বার্ষিক গোপন রিপোর্টে নেতিবাচক মন্তব্য এবং তাঁর বিরুদ্ধে আনীত দুটি বিভাগীয় চার্জশিট। এই অবস্থাতেই তিন মাস আগে অবসরের আবেদন করেন তিনি। ২০১৫ এর ২৮ ফেব্রুয়ারি নিজের অবসরের দিন ধার্য করেন। তবে যে তারিখে তিনি অবসর নিতে চেয়েছিলেন, তাঁর মাত্র দু'দিন আগে তাঁর চিঠির উত্তর দেয় রাজ্য সরকার।[১৩]

তবে শর্মার উপরে সরকারের রোষ বোঝার আগে, তাকে হয়রান করার ব্যাপারে সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক নিযুক্ত সিট যা বলেছিল সেটা জানাও জরুরি। ২০০২ সালের দাঙ্গা সম্বন্ধে সিট এর রিপোর্টের একটি প্রধান বিষয় ছিল উপরের রিপোর্টের একটি বক্তব্য। রিপোর্টে বলা হয়েছিল, যেসব পুলিশ অফিসার ২০০২ সালের হিংসা থামানোর চেষ্টা করেছিলেন তাদের নানাভাবে হয়রান করেছিল নরেন্দ্র মোদির সরকার, এমনকি দাঙ্গার পরও এই হয়রানি ও নির্যাতন চালিয়ে যাওয়া হয়েছে।

সিনিয়র আইপিএস অফিসার রাহুল শর্মার কাছে একটি নোটিশ পাঠিয়ে গুজরাট সরকার জবাব চায়, অনুমতি ছাড়া তদন্ত কমিশনের কাছে দাঙ্গার সময় সিনিয়র রাজনীতিবিদ ও আমলাদের ফোন রেকর্ড কীভাবে এবং কেন জমা দিয়েছেন তিনি। দাঙ্গার ন'বছর পরে পাঠানো নোটিশে শর্মার কাছে জানতে চাওয়া হয়, কেন তাঁর বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হবে না। এমন এক সময়ে এই নোটিশ পাঠানো হয় যখন সিট জানিয়েছিল যে দাঙ্গার সময়কার গুরুত্বপূর্ণ মিটিংগুলির কোনো রেকর্ড বা মিনিটস্ রাখেনি মোদি সরকার।

১৯৯২-এর ব্যাচের আইপিএস অফিসার রাহুল শর্মা ২০০২ সালের এপ্রিল মাসে আহমেদাবাদের ডিসিপি (কন্ট্রোল রুম) ছিলেন। নারোডা পাটিয়া ও গুলবার্গ সোসাইটির হিংসাত্মক ঘটনা তদন্ত করার সময় এটি এ্যান্ড টি ও সেলফোর্স মোবাইল সার্ভিস প্রোভাইডারদের কাছ থেকে ওই সময়ে আহমেদাবাদে আসা ও যাওয়া যাবতীয় ফোনকলের রেকর্ড সংগ্রহ করে ক্রাইম ব্রাঞ্চের হাতে তুলে দেন তিনি। বিভিন্ন সিনিয়র মন্ত্রী, পুলিশ

অফিসার এবং আরএসএস ও ভিএইচপি সদস্যদের পরস্পরের মধ্যে ফোনে কথোকপথন সম্বলিত এই সিডিগুলি পরবর্তীকালে 'হারিয়ে যায়'। তবে দাঙ্গার তদন্তের জন্য ২০০২ সালের মার্চ মাসে গঠিত নানাবতী কমিশনের কাছে সাক্ষ্য দেওয়ার সময় নিজের কাছে রক্ষিত একটি সিডি পেশ করেন শর্মা।[14]

তেহেলকা'য় প্রকাশিত একটি রিপোর্টে আমার সহকর্মী অনুমেহা যাদব লিখেছিলেন:

এই ফোন রেকর্ডগুলো অপরাধীদের গ্রেপ্তার করার ব্যাপারে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণগুলোর অন্যতম। এগুলোর সাহায্যেই ২০০৯ সালে গুজরাট ভিএইচপির সভাপতি জয়দীপ প্যাটেল ও মন্ত্রী মায়া কোদনানিকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং তাদের আগাম জামিন খারিজ করা হয়। এছাড়া গুলবার্গ সোসাইটিতে কংগ্রেসের সাবেক সাংসদ এহসান জাফরি এবং আরও ৩০ জনকে হত্যার তদন্তের সহায়ক হয়ে ওঠে এই রেকর্ডগুলো। নারোডা পাটিয়ায় সরকারি হিসেবে ১০৫ জন মুসলিম নিহত হন এবং সেক্ষেত্রেও এই সিডিগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ।

কিন্তু যেকোনো নিরপেক্ষ তদন্তের প্রচেষ্টাতে ইন্ধন জোগানোটা গুজরাটে যেন একটা নিয়মে পরিণত হয়েছে। সিনিয়র আইপিএস অফিসার সতীশ ভার্মা যিনি ২০০৪ সালে ইশরাত জাহানকে কথিত বন্দুকযুদ্ধে হত্যার তদন্তের জন্য গঠিত অন্য একটি সিট এর সদস্য–শর্মার নোটিশ পাওয়ার এক সপ্তাহ আগে জানান যে তদন্তের নানান সূত্র অনুসন্ধানের কাজে তাকে বাধা দেওয়া হয়েছিল। নিজেদের রাজনৈতিক ওপরওয়ালাদের সন্তুষ্ট করার জন্য গুজরাটের পুলিশ অফিসাররা এই এনকাউন্টারটি ঘটিয়েছিলেন বলে অভিযোগ করেন। এনকাউন্টারটির তদন্তের কাজে নিযুক্ত তিনজন অফিসারের একজন এই ভার্মা। কীভাবে তাঁকে বাধা দেওয়া হয়েছে সেব্যাপারে একটি হলফনামাও জমা দেন তিনি।

২৮ জানুয়ারি গুজরাট হাইকোর্টে দাখিলকৃত ৮০ পৃষ্ঠার ওই হলফনামায় ভার্মা জানান, ২০০৯ সালে গুজরাট সরকার কর্তৃক পূর্বের একটি সিট বা

বিশেষ তদন্তকারী দল কীভাবে বিভিন্ন সুস্পষ্ট ফরেনসিক প্রমাণকে উপেক্ষা করেছিল, যার অন্যতম ছিল ইশরাতের শরীরে বিদ্ধ বুলেটগুলো। বন্দুকযুদ্ধে যেসব অস্ত্র ব্যবহার করা হয়েছিল বলে পুলিশ দাবি করেছিল, তাঁর সঙ্গে এই বুলেটগুলোর মিল নেই। ভার্মা আরও জানান, গুজরাটের জনৈক ক্যাডার অফিসার ও পূর্বের একটি সিট এর সদস্য মোহন ঝা এবং দিল্লির জনৈক ক্যাডার অফিসার কার্নেইল সিং ইচ্ছাকৃতভাবে হাইকোর্টের কাছে একজন প্রধান স্বাক্ষীর বক্তব্য প্রত্যহারের বিষয়টি কোনো মন্তব্য ছাড়াই পেশ করেন, যাতে কোনো সন্দেহের উদ্রেক না হয়। ভার্মা আরও জানিয়েছেন মোহন ঝা বর্তমানে জেসিপি, ডিটেকশন অফ ক্রাইম ব্রাঞ্চ (ডিসিবি) কীভাবে গত মাসে স্পেশাল অপারেশন গ্রুপের ২৬ জন পুলিশ অফিসারকে সরাসরি নিজের অধীনে নিয়ে আসার চেষ্টা করেন। তিনি বলেছিলেন "ভাইব্র্যান্ট গুজরাট" সম্মেলনের নিরাপত্তার জন্য এদেরকে দরকার। এনকাউন্টারের দিন এই ২৬ জনই ডিসিবির সঙ্গে ছিলেন।

'ভার্মা বলেন, সিট কাজ শুরু করার ১৯ দিন পর, ডিসেম্বরে সিট এর মধ্যে কী চলছে না চলছে সে ব্যাপারে একটি সরকারি নোট রাখতে শুরু করেছিলেন তিনি। এ থেকে বোঝা যায় অনিয়মগুলো লিপিবদ্ধ করে রাখার প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন তিনি এবং অনুমান করেছিলেন, নিরপেক্ষ তদন্তের জন্য তাঁর প্রচেষ্টায় বাধা দেওয়া হবে। বোঝা যায় এইসব কথিত বন্দুকযুদ্ধে হত্যার তদন্তের এই চেষ্টার আসল চেহারাটা ঠিক কেমন'- বলেছেন নামপ্রকাশে অনিচ্ছুক একজন সিনিয়র পুলিশ অফিসার।[১৫]

দাঙ্গা পরবর্তী কথিত বন্দুকযুদ্ধগুলো সম্বন্ধে খোলাখুলি কথা বলেছেন আশোক নারায়ণ:

প্র: কথিত বন্দুকযুদ্ধগুলোর ব্যাপারটা কী?

উ: এনকাউন্টারগুলো যতটা রাজনৈতিক কারণে ঘটেছে, ততটা ধর্মীয় কারণে ঘটেনি। সোহরাব উদ্দিনের এনকাউন্টারের ব্যাপারটা ভেবে দেখো। রাজনৈতিক নেতাদের নির্দেশেই ওকে হত্যা করা হয়। ওই ঘটনার জন্যই অমিত শাহকে জেলে যেতে হয়েছে। এটা সর্বত্রই ঘটছে। এখানেও ঘটছে। কথিত

বন্দুকযুদ্ধের ঘটনাগুলো হয় রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত, নয়তো পুলিশ কর্মকর্তাদের অতি উৎসাহের ফলেই ঘটে।

প্র: আপনি হোম সেক্রেটারি থাকার সময় এমন কোনো ঘটনা ঘটেনি?

উ: সোহরাব উদ্দিনের (এনকাউন্টার) ব্যাপারটা নয়। মাত্র একটা ঘটেছিল। আমি অফিসারদের বলেছিলাম, আপনারা কী করছেন... নিশ্চয়ই রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ছিল। আমি ডিজিপিকে বলেছিলাম, 'আপনারা কী করছেন?'

প্র: দাঙ্গার সময় যা যা ঘটেছিল তা নিয়ে একটা বই লেখা উচিত আপনার।

উ: আমার কথা কে বিশ্বাস করবে?

প্র: আপনি হোম সেক্রেটারি ছিলেন।

উ: কংগ্রেসের লোকেরা বলবে, আপনি তো সরকারের লোক ছিলেন, (অতএব) 'উনি সরকারের বক্তব্যটাই লিখেছেন।' বিজেপিও আমার বক্তব্য মেনে নেবে না। রাজনৈতিক দলগুলো সেটাই বিশ্বাস করে যেটা তাঁরা বিশ্বাস করতে চায়।

আশোক নারায়ণের সঙ্গে এটাই ছিল আমার শেষ সাক্ষাৎ। কয়েক বছর ধরে বিভিন্ন কার্মকর্তার সঙ্গে অফ দ্য রেকর্ড কথাবার্তায় যা কিছু আমি শুনেছিলাম, তাঁর প্রায় প্রতিটা কথাকেই সত্য বলে উল্লেখ করেছিলেন তিনি। যেমন বলেছিলেন, যেসব সরকারি কর্মকর্তা সরকারের পক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন তাঁরা পুরস্কার পেয়েছিলেন। বাকিদের ক্ষেত্রে তেমনটা ঘটেনি, তাদের টপকে অন্যদের প্রোমোশন দেওয়া হয়েছিল। তর্কের খাতিরে ধরে নেওয়া যাক, আশোক নারায়ণ বিশেষ একটা পক্ষ নিয়ে একগুয়ের মতো নিজের মত ধরে রেখেছিলেন। কিন্তু তা হলেও যেসব অফিসার প্রশাসনের বিপক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন, তাদের বদলি করা এবং তাদের প্রতি মোদি সরকারের প্রতিহিংসামূলক মনোভাবের কথাটা তো আর মিথ্যে হয়ে যায় না। রাহুল শর্মা, রজনীশ রাই, সতীশ ভার্মা, কুলদীপ শর্মা প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই অন্তত ২০ বছর পুরোনো মামুলি কিছু বিষয় তুলে এনে তাদের বিরুদ্ধে কাজে লাগানো হয়েছে। গুজরাটে ন্যায়বিচার যখন প্রায় তলানিতে পৌছেছিল তখন এইসব অফিসাররাই

ন্যায়বিচারের পতাকাকে উর্ধ্বে তুলে ধরার চেষ্টা করে গেছেন এবং তাঁর জন্য আজও তাদের হয়রানী করা হচ্ছে।

পরবর্তী পরিচ্ছেদগুলিতে আমরা দেখব যে মানুষটির গুজরাটে ডিজি হওয়ার কথা ছিল, সেই কুলীপ শর্মাকে প্রোমোশন দেওয়া হয়নি। এর কারণ মাধোপুরা সমবায়ের ঘটনায় তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করেছিলেন তিনি। একটি মাদ্রাসায় দাঙ্গাবাজদের প্রতিহত করা ও পরবর্তীকালে তদন্ত কমিশনের হাতে গুজরাট দাঙ্গার সময় বিভিন্ন মন্ত্রীদের ফোনকলের রেকর্ড তুলে দেওয়ার জন্য এসপি রাহুল শর্মাকে সাসপেন্ড করে তাঁর নামে নানান মামলা দায়ের করা হয়। ধুলোর আস্তরণ কেবল সরতে শুরু করেছে। আশোক একটি রাজ্যের পক্ষপাতিত্ব ও দুষ্কর্মে সহযোগিতা করার কথা বলেছেন, যেরাজ্যে দীর্ঘ তিন মাস ধরে চলা এক ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় অবাধে রক্তস্রোত বয়ে যেতে দেওয়া হয়েছে।

এবার পরবর্তী চরিত্র ও পরবর্তী পরিচ্ছেদের দিকে অগ্রসর হতে হবে আমাদের।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

জি.সি. রাইগার

জি.সি. রাইগার ২০০২ সালের দাঙ্গার সময় গুজরাটের গোয়েন্দা প্রধান ও পরে কথিত বন্দুকযুদ্ধে সোহরাব উদ্দিনকে হত্যা করার সময় পুলিশের ডি.জি. ছিলেন তিনি। তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হওয়ার দিন ভারত-পাকিস্তান ক্রিকেট খেলা নিয়ে সবাই উত্তেজিত হয়ে আছে। অজয় তাঁর নিজের বাড়িতে একটা ছবি দেখানোর ব্যবস্থা করে তাঁর প্রায় সকল বন্ধুদের ডেকেছিল, কিন্তু আমি অজয়ের বন্ধুদের সামনে যেতে চাইছিলাম না। কারণ এদের অনেকেরই শক্তপোক্ত রাজনৈতিক যোগাযোগ ছিল। অজয় আমাকে আগেই জানিয়েছিল, তাঁর একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু আনার প্যাটেল শহরে একটা এনজিও পরিচালনা করেন। আনার হচ্ছেন গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী আনন্দীবেন প্যাটেলের মেয়ে।

বিকেলে যখন রাইগারের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম তখন খেলা শুরু হওয়ার জন্য উদ্বিগ্নচিত্তে অপেক্ষা করছেন তিনি। 'আশা করি আফ্রিদি আজ আর তেমন ছক্কা হাঁকাতে পারবে না, স্যার। তবে, আমাদের বোলিং তো আজ তেমন সুবিধের নয়।' যে দু'টো বিষয় জানা ছিল সেটুকুই উগরে দিলাম। রাজস্থানি চিভদা আর চা পরিবেশন করে গুজরাটের আইনি প্রধান থাকার সময়কার নানান কথা বলতে শুরু করলেন জি.সি. রাইগার। কথিত বন্দুকযুদ্ধে সোহরাব উদ্দিনকে হত্যা করার মামলায় সিবিআই জিজ্ঞাসাবাদ করেছে তাকে। সংবাদপত্রের রিপোর্ট[১৬] থেকে জানা যাচ্ছিল সেই সময় এই বিষয়টা নিয়ে প্রচণ্ড চাপে ছিলেন তিনি।

এই সাক্ষাৎকারটার ব্যাপারে খুব দুশ্চিন্তায় ছিলাম আমি। কারণ রাইগার যে ঠিক কোন দিকে আছেন এবং তাঁর কাছ থেকে কতটুকু সত্য আদায় করা যেতে পারে, সেব্যাপারে কোনো ধারণাই ছিল না আমার। মাইক ফিরে এসেছে। আমরা আবার নেহরু ফাউন্ডেশনে ফিরে গেছি। আমরা রাইগারের সঙ্গে তাঁর অফিসে দেখা করেছিলাম। অবসরের পর ভেজাল

মদের বিষয়টা দেখার কাজ দেওয়া হয়েছিল তাকে। ২০০২ এর গুজরাট দাঙ্গার সময় এডিজিপি, ইন্টেলিজেন্স আর বি. শ্রীকুমার একটা সাক্ষাৎকারে দাঙ্গা সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলেছিলেন:

> কিছু কিছু অফিসার উপরতলার লোকেদের খুশি রাখার জন্য কোনো কাজই করেননি। এমনকী আমার আগে যিনি এই পদে ছিলেন, সেই জি.সি. রাইগারও হাত গুটিয়ে নিয়েছিলেন। পরে তাকে প্রোমোশন দিয়ে পুরস্কৃত করা হয়, যদিও তিনি আমার জুনিয়র। এমনকী তাকে 'ভেজাল মদ কমিশন' এর সদস্য হিসেবে অবসরোত্তর পদও দেওয়া হয়েছে, যে কমিশনটি হাইকোর্টের বিচারপতির অধীনে আছে।

সুপ্রিম কোর্টে দেওয়া হলফনামায় রাইগারের নাম উল্লেখ করেছিলেন ভাট। ২০০২ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি মুখ্যমন্ত্রীর মিটিংয়ে ভাট সত্যিই উপস্থিত ছিলেন কি না সে ব্যাপারে 'হ্যাঁ' বা 'না' কিছুই বলতে অস্বীকার করেন রাইগার। স্থানীয় একটি সংবাদপত্রকে তিনি বলেন, 'আমি কিছুই বলতে পারব না, কেননা সেদিন আমি ছুটিতে ছিলাম।' হলফনামায় ভাট জানিয়েছিলেন তৎকালীন ডিজিপি কে. চক্রবর্তীই তাকেও মিটিংয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। সংবাদমাধ্যমের কাছে ২০০২ এর দাঙ্গা সম্বন্ধে কিছু বলতে অস্বীকার করেন চক্রবর্তী, ফলে তাঁর কাছ থেকে কোনো তথ্যই পাওয়া যায়নি।

মুম্বাই দাঙ্গা এবং তাঁর পরবর্তী সাজানো বন্দুকযুদ্ধগুলোর ঘটনায় অন্যতম একজন প্রধান চরিত্র রাইগার। এই দু'টি ঘটনা গুজরাটে অপরাধমূলক চক্রান্তের ক্ষেত্রে অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক ও কলঙ্কময় দৃষ্টান্ত। সোহরাব উদ্দিন কথিত বন্দুকযুদ্ধ মামলায় ভি.এল. সোলাঙ্কি নামক একজন পুলিশ অফিসার সিবিআই এর কাছে লিখিত বিবৃতি দেন, যেটি পরে চার্জশিটের অন্তর্ভূক্ত হয়। বিবৃতিতে বলা হয়েছে:

"২০০৬ সালের নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে তিনি (মিস গীতা জোহরি, আইজি) আমাকে তাঁর চেম্বারে দেখা করতে বলেন। নির্দেশ পেয়ে আমি

গান্ধীনগরে গেলাম। প্রথমে তিনি তদন্ত কীভাবে অগ্রসর হচ্ছে তা নিয়ে আলোচনা করলেন আমার সঙ্গে। খানিক্ষণ পর মিস গীতা জোহরি আমাকে বললেন, সেদিন একটা মারাত্মক ঘটনা ঘটে গেছে। তাকে, এডিশনাল ডিজিপি শ্রী জি.সি. রাইগারকে এবং ডিজিপি শ্রী সি.সি পান্ডেকে নিজের অফিসে ডেকে পাঠিয়ে তাদের সঙ্গে তদন্তের অগ্রগতি সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী অমিত শাহ।

তিনি (মিস গীতা জোহরি) আমাকে বলেন যে, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর মেজাজ অত্যন্ত খারাপ ছিল এবং আমার ব্যাপারে তাঁর কাছ থেকে জানতে চেয়েছিলেন। শাহ বলেছেন, আমার মতো একজন পুলিশ ইন্সপেক্টর কীভাবে এমন রিপোর্ট লিখতে সাহস পায় যা শ্রী ডি.জি. বানজারা, রাজকুমার পান্ডিয়ান এর মতো সিনিয়র অফিসারদের ভয়াবহ বিপদে ফেলতে পারে, যারা কথিত বন্দুকযুদ্ধে সোহরাব উদ্দিনের হত্যার জন্য দায়ী।"

সিবিআইকে এসসিকে এই মিটিং সম্বন্ধে বলতে গিয়ে জানিয়েছিলেন, এই মামলার তৎকালীন প্রধান তদন্তকারী গুজরাটের ডিজিপি পি.সি. পান্ডে এডিজিপি সিআইপি ডি.সি. রাইগার এবং আইজিপি সিআইডি গীতা জোহরিকে নিয়ে ২০০৬ সালের ডিসেম্বর মাসে এই মিটিং ডেকেছিলেন অমিত শাহ। মিটিংয়ে অমিত শাহ নাকি বলেছিলেন, জোহরির সহকারী সোলাঙ্কির দেওয়া অভিযোগমূলক তদন্ত রিপোর্ট সম্বন্ধে সতর্ক থাকতে হবে। সোলাঙ্কি কোনো রকম সহযোগিতা করতে অস্বীকার করেন। উপরন্তু তিনি প্রজাপতিকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চান, যিনি সোহরাব উদ্দিন ও কওসর বাই অপহরণের স্বাক্ষী ছিলেন। ২০০৬ এর নভেম্বর মাসে প্রজাপতি প্রকাশ্য আদালতে চিৎকার করে বলেন পুলিশ তাকে হত্যা করতে চলেছে, কারণ তিনি অনেক বেশি জেনে ফেলেছেন। সোলাঙ্কির সঙ্গে সাক্ষাৎকারের নির্দিষ্ট দিনের কয়েক দিন আগে তিনিও 'সাজানো বন্দুকযুদ্ধে' মারা যান।

১৮ মাস তদন্তের পর সিবিআই যে চার্জশিট পেশ করে তাতে অমিত শাহ এবং অন্য ১৯ জন অভিযুক্তের নাম ছিল। যাদের মধ্যে পান্ডে, জোহরি, ও. পি. মাথুর, রাজকুমার পান্ডিয়ান, ডি. বানজারা এবং আর. কে

প্যাটেলের মতো উচ্চপদস্থ পুলিশকর্তাদের নামও ছিল। সাজানো বন্দুকযুদ্ধে দুষ্কৃতী সোহরাব উদ্দিন শেখকে হত্যা করার স্বাক্ষী প্রজাপতিকে হত্যার চক্রান্তে অভিযুক্ত করা হয় এদের। স্বাক্ষী হিসেবে ন'জন গুজরাট ক্যাডার আইপিএস অফিসারের নাম ছিল: জি.সি. রাইগার (তৎকালীন এডিজিপি, সিআইডি ক্রাইম), রজনীশ রাই, আই.এম. দেশাই (তখন সিআইডির ক্রাইম ব্রাঞ্চে ছিলেন এবং মামলাটির তদারক করছিলেন), পি.সি. পান্ডে (এডিজিপি, সিআইডি ক্রাইম), ভি.ভি. রাবারি (সিআইডির ক্রাইম ব্রাঞ্চের সাবেক প্রধান), এ.কে. শর্মা (ডিআইজি ক্রাইম ব্রাঞ্চ, আহমেদাবাদ) এবং ময়ূর চাভদা (মূখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তা বাহিনীর ডেপুটি এসপি)। সিবিআই অফিসাররা জানান, রাইগার এবং রাই হচ্ছেন প্রধান স্বাক্ষী।

চার্জশিটে বলা হয়, ২০০৬ সালের ডিসেম্বরের মাঝামাঝি সময়ে অমিত শাহ (তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী) তাঁর অফিসে একটি মিটিং ডাকেন সোহরাব উদ্দিন শেখ মামলার তদন্তের ব্যাপারে নিজের অসন্তোষ প্রকাশ করার জন্য। এই মিটিংয়ে পান্ডে, জোহরি ও রাইগার উপস্থিত ছিলেন। জোহরিকে কয়েকটি নথিপত্র নষ্ট করে ফেলতে বলেন অমিত শাহ। সিবিআই বলেন, 'রাইগার অনুরোধ করেন তাকে রেহাই দেওয়ার জন্য, কিন্তু পান্ডে ও জোহরি এই চক্রান্তমূলক নির্দেশ পালনে স্বেচ্ছায় এগিয়ে আসেন।'

রাইগার সিবিআইকে বলেন, তিনি যখন সাজানো বন্দুকযুদ্ধে সোহরাব উদ্দিনকে হত্যা করার মামলাটা দেখাশোনা করছিলেন, তখন তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ তাঁর ওপর অবিরাম চাপ সৃষ্টি করছিলেন। 'আমার কার্যকলাপে অমিত শাহ অত্যন্ত অসন্তুষ্ট ছিলেন। আমাকে দিয়ে কিছু বেআইনি কাজ করাতে চাইছিলেন উনি, যা আমাকে প্রচণ্ড চাপে ফেলে দেয়। অগত্যা আমি বদলি চাই। সেদিনই আমাকে কারাইতে বদলি করার নির্দেশ দেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।' ও.পি. মাথুর নামে অন্য একজন অফিসারকে তাঁর জায়গার দায়িত্ব দেওয়া হয়। রাইগার বলেছেন, 'আমি শাহকে বলেছিলাম

বদলির আগে কয়েকটা দিন সময় দিন আমাকে, কিন্তু উনি আমাকে সেদিনই বদলি করে দেন।'

রাইগার আরও বলেছেন যে পিআই ভি.এল. সোলাঙ্কি, যিনি ঘটনাটার তদন্ত করছিলেন, তিনি কখনও এই মামলার ব্যাপারে উদয়পুরে যাওয়ার জন্য তাঁর অনুমতি চাননি। তৎকালীন এডিজিপি ও.পি. মাথুর তাঁর বিবৃতিতে বলেছেন, ডেপুটি সুপারিন্টেন্ডেন্ট অফ পুলিশ জি.বি. পাধেরিয়া ও আইজিপি গীতা জোহরির মধ্যে একটা বিবাদ দেখা দিয়েছিল। নাথুভা জাদেজা নামক একজন স্বাক্ষীকে বিরূপ করে দেওয়ার জন্য পাধেরিয়াই দায়ী বলে জোহরি সন্দেহ প্রকাশ করার পরই এই বিবাদ দেখা দেয়। পুরো বিষয়টা প্রিন্সিপাল সেক্রেটারির (স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয়) গোচরে আনা হলে তিনি বলেন বিষয়টা নিজেদের মধ্যে মিটিয়ে নেওয়া উচিত। পরে বিষয়টা মিটিয়ে নেওয়া হয়। তবে সিবিআইকে তিনি জানান, জোহরি কখনোই তাকে বিশ্বাস করতেন না।

২০১১ সালের মার্চ মাসে আমার স্টিং অপারেশন শেষ করে গুজরাট ছেড়ে চলে আসার পরই এইসব বিবৃতির বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশ্যে আসে। ডিসেম্বর মাসে মাইককে নিয়ে আমি যখন রাইগারের সঙ্গে তাঁর অফিসে প্রথম দেখা করি, তখনও জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তাকে ডেকে পাঠাত সিবিআই। পরিস্থিতিটা মাইককে বুঝিয়ে বললাম, এটাও বললাম যে তাঁর কাছ থেকে কোনো তথ্য নাও পেতে পারি আমরা। 'আজ ওকে রাজনীতি নিয়ে কোনো প্রশ্ন করব না, মাইক। আমরা বিদেশি, কোনো খোঁজখবরই রাখি না, এমন ভাব দেখাব।'

খুব আন্তরিকভাবেই মাইককে গ্রহণ করলেন রাইগার, জানতে চাইলেন গুজরাটে কেমন অভিজ্ঞতা হচ্ছে ওর। আহমেদাবাদ নি গুফা, পালদি আর সরখেজ রোজায় শুটিংয়ের কথা সংক্ষেপে বলল মাইক। গুজরাটিরা বিদেশি বা আমেরিকান কোনো কিছু দেখলেই মোহিত হয়ে পড়ে, নাকি আমাদের দু'জনের আত্মবিশ্বাসের দরুনই এইসব অফিসাররা এত সহজে আমাদের গল্পটা বিশ্বাস করে নিয়েছিলেন, সে ব্যাপারে ঠিক নিশ্চিত নই আমি।

আমার মনে আছে রাহুল ঢোলাকিয়ার সঙ্গে কথা বলার ঘটনাটা। রাহুল একজন গুজরাটি ও বলিউডের চিত্রপারিচালক। গুজরাট দাঙ্গার ওপর বানানো তাঁর সিনেমা 'পারজানিয়া *(Parzania)*' কে রাজ্যের সকল সিনেমাহলে দেখানো নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়। মুম্বাইয়ের জুহুর 'কোস্টা কফি' তে বসে 'পারজানিয়া'র জন্য অর্থ সংগ্রহ ও ছবি বানানোর অভিজ্ঞতা যখন মজা করে বলছিলেন রাহুল, তখন হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরে গিয়েছিল। তাঁর প্রযোজকের মনে হয়েছিল, যেসব দক্ষিণপন্থী হিন্দুরা ছবিটার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছেন তাদের কোন ধারণাই নেই যে দাঙ্গার সময় সংখ্যালঘুদের ওপরে সংঘঠিত অন্যায়ের বিরোধিতাই ছবিটার বিষয়বস্তু। একটা আমেরিকান চ্যানেলের হয়ে কাজ করেছিলেন রাহুল। তিনি এমন ভাব দেখান যেন প্রবাসী ভারতীয়দের জন্য গুজরাটের ওপর একটা ছবি বানাতে চান। গুজরাটে আমি যতজনের সঙ্গে দেখা করেছি তাদের অধিকাংশের কাছে আমিও একই কথা বলতাম। প্রযোজক এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে রাহুলকে বিশ্বাস করার পক্ষে এটুকুই যথেষ্ট ছিল। একবার সিনেমার জন্য গুজরাট দাঙ্গার কিছু ফুটেজ দরকার হওয়ায় একটি সংবাদপত্রের সঙ্গে যোগাযোগ করেন রাহুল, যাদের কাছে ওই রেকর্ডগুলো ছিল। রাহুল আমেরিকা থেকে এসেছেন শুনেই দায়িত্বশীল ব্যক্তিটি গলে পড়েন। রাহুলের দাদু হিন্দু মহাসভার চেয়ারপার্সন ছিলেন জেনে আরও আপ্লুত হন তিনি। নিজের প্রয়োজনীয় সব কিছু তৎক্ষণাৎ পেয়ে যান রাহুল।

এবার আসি রাইগারের কথায়। আমাদের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতে কথা বলতে খুব আগ্রহী ছিলেন রাইগার। পিতৃসুলভ ভঙ্গিতে আমাকে বললেন আমি যেন তাড়াতাড়ি বিয়েটা সেরে ফেলি, কেননা একটা বয়সের পর মেয়েদের পক্ষে উপযুক্ত পাত্র খুঁজে পাওয়া কঠিন হয়ে ওঠে। রাজস্থানের এক সেকেলে ঘরানার বংশের মানুষ তিনি। অমিত শাহের ক্রোধের মুখে পড়তে হবে ভেবে তাঁর বিরুদ্ধে মামলায় স্বাক্ষী হওয়া তাঁর পক্ষে বেশ কঠিন ছিল, কিন্তু বিভিন্ন সাজানো বন্দুকযুদ্ধের ঘটনায় অমিত শাহের যুক্ত থাকার প্রমাণ দিন দিন বেড়েই চলেছে দেখে শেষ পর্যন্ত তিনি স্বাক্ষী

হওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। তবে আমাদের কথোপকথনের দ্বিতীয় দিনে রাইগার যা বলেছিলেন তা রীতিমতো চমকপ্রদ।

আমি জানতাম কথিত বন্দুকযুদ্ধের ঘটনায় কারা কারা জড়িত আছে, কিন্তু প্রশাসন এদের কীভাবে কাজে লাগিয়েছিল ও ব্যবহার করেছিল, সেটা বুঝে ওঠা খুব সহজ ছিল না। রাইগার আমার সঙ্গে নিসঙ্কোচে কথা বলেছিলেন। কারণ তিনি জানতেন আমি ইতিমধ্যেই পি.সি. পান্ডে, আশোক নারায়ণ, রাজন প্রিয়দর্শীর সঙ্গে কথা বলেছি। আমি যে গুজরাট পুলিশের গৌরবময় ছবি তুলে ধরতে চাইছি সে বিষয়ে তিনি নিশ্চিত ছিলেন।

আমি ভুজের ভূমিকম্পের কথা তুললে তিনি জানালেন ভূমিকম্পের তীব্রতা কত ছিল, কতজন মারা গিয়েছিল, ঘটনার পর কী বিপুল পরিশ্রম করতে হয়েছিল গুজরাট পুলিশকে। খুবই অজ্ঞতার ভান করে জানতে চাইলাম, গুজরাটে সাম্প্রদায়িক মেরুকরণ যতটা প্রবল বলে শোনা যায়, সত্যিই কি তাই? তিনি বললেন, 'ওহ্, ২০০২ সালে এখানে কী ঘটেছিল আপনি ভাবতেও পারবেন না।' তিনি দাঙ্গা সম্বন্ধে মুখ খোলায় আমার অজ্ঞতার ভাব প্রকাশ্য কৌতূহলে পরিণত হল। তাকে বললাম অন্য অফিসারদের কাছ থেকে এ ব্যাপারে কিছু তথ্য পেয়েছি আমি। গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান ছিলেন রাইগার, অর্থাৎ গুজরাট দাঙ্গার সময় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা পদে ছিলেন তিনি।

প্র: আচ্ছা, মোদির ব্যাপারটা কী? সবাই তাকেই দোষী বলছে কেন?
উ: এ ব্যাপারে আমি কিছু বলতে চাই না। এ ব্যাপারটায় হাত ধুয়ে ফেলেছি আমি।
প্র: ঘটনার সময় আপনি তো একেবারে তাঁর মধ্যেই ছিলেন?
উ: হ্যাঁ।
প্র: খুবই দুঃখজনক বিষয়।
উ: হ্যাঁ, দাঙ্গার সেই তিন মাসের কথা আমি ভুলে যেতে চাই। এমন কিছু ঘটনা ঘটেছিল যা ঘটা উচিত ছিল না।
প্র: তাই নাকি? আপনার বিবেকেও আঘাত লেগেছিল?
উ: হ্যাঁ, খুবই আঘাত লেগেছিল।

আশোক নারায়ণও একই কথা বলছিলেন।

প্র: হ্যাঁ, উনিও ঝড়ের কেন্দ্রেই ছিলেন। মানুষের মনে সেসব স্মৃতি এখনও জীবন্ত, সব জায়গায়। আমেরিকা এখনও তাকে (মোদিকে) সেদেশে যাওয়ার অনুমতি দেয়নি, উনি এত জনপ্রিয় হওয়া সত্ত্বেও নয়। সম্প্রতি উইকিলিকস এ বলা হয়েছে আমেরিকা নাকি এখন ওর সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তুলতে চায়। কিন্তু পরে ওই উইকিলিকসই ওর সম্বন্ধে অনেক খারাপ খারাপ কথা বলেছে। অর্থাৎ সংবাদমাধ্যমে ওর সম্বন্ধে নানা ধরনের কথা বলা হয়েছে।

উ:

প্র: এটাই কি দেশের সবথেকে ভয়ংকর (দাঙ্গা)? মুম্বাই দাঙ্গার থেকেও ভয়ংকর?

উ: হ্যাঁ, মুম্বাই দাঙ্গা মাত্র দু'দিনের ঘটনা ছিল। এটা টানা কয়েক মাস ধরে চলেছিল।

প্র: কিন্তু সেটা হল কীভাবে? এতদিন ধরে এটা চলতে দেওয়া হল কেন?

উ: এটা তো নারায়ণ নিশ্চয়ই বলেছেন আপনাকে। উনি তখন হোম সেক্রেটারি ছিলেন।

প্র: হ্যাঁ, উনি বলেছেন উনি খুবই বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। সরকারের কঠোর সমালোচনা করছিলেন উনি, বলছিলেন রাজ্য সরকার কিছু করেনি।

উ: উনি হোম সেক্রেটারি ছিলেন। সরকারের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তা। উনি যখন বলেছেন তখন সেটাই সত্য।

প্র: কিন্তু আপনাদের সবারই কি মোহভঙ্গ ঘটেছিল?

উ: আমাদের বেশিরভাগেরই মোহভঙ্গ ঘটেছিল, কষ্ট পেয়েছিলাম, একমাত্র যারা সরকারের কাজ সমর্থন করেছিল তাঁরা ছাড়া, (তাঁরা) সরকারের পক্ষে দাঁড়িয়েছিল। শুধুমাত্র রাজনীতিবিদরাই যে খেলছিল তা নয়, পুলিশরাও দায়ী ছিল।

প্র: তাঁর মানে দাঙ্গার সময় রাজনীতিবিদ আর পুলিশদের মধ্যে একটা অশুভ আঁতাত গড়ে উঠেছিল?

উ: কথাটা খানিকটা সত্যি, কারণ পরিস্থিতি একবার হাতের বাইরে চলে গেলে আর বিশেষ কিছু করার থাকে না।

প্র: কিন্তু এই ঘটনা থেকে তো বিপুল রাজনৈতিক ফায়দা তুলেছিলেন উনি (মোদি)?

উ: হ্যাঁ, হ্যাঁ, তা তো বটেই। পরবর্তী নির্বাচনের সময় তাঁরা খুব নার্ভাস ছিল, কিন্তু দেখা গেল ফল ভালোই হয়েছে। তাঁরা ভেবেছিল ওর জন্যে এটা করেছে তাঁরা।

খানিক পরে কথাবর্তা ঘুরে গেল সাজানো বন্দুকযুদ্ধগুলোর দিকে। যখন তদন্ত চলছিল তখন রাইগার এডিশনাল ডিজিপি ছিলেন। সাজানো বন্দুকযুদ্ধের ব্যাপারে সিবিআই তাকে ওই বছরের মে আর জুন মাসে প্রতিদিন ১০ ঘন্টা ধরে জেরা করে। তবুও তিনি নিজের কথাগুলো আমাকে বলতে পেরে খুশি হলেন।

প্র: আচ্ছা, এখানকার এনকাউন্টারগুলোর ব্যাপারটা কী? আপনি তো ওখানে ছিলেন।

উ: আমি মাত্র একটা ঘটনায় ছিলাম। একটা সাজানো বন্দুকযুদ্ধে একজন অপরাধী (সোহরাব উদ্দিন) মারা যায়। বোকার মতো সোহরাব উদ্দিন এর স্ত্রীকেও মেরে দিয়েছিল ওরা।

প্র: কোনো একজন মন্ত্রীও কি জড়িত ছিলেন না?

উ: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

প্র: তাঁর অধীনে কাজ করা নিশ্চয়ই খুব কঠিন ছিল?

উ: আমরা তাঁর সঙ্গে একমত হতে পারিনি। তাঁর নির্দেশ মানতে অস্বীকার করায় এনকাউন্টারের ঘটনায় গ্রেপ্তার হওয়ার হাত থেকে বেঁচে গেছি আমরা।

প্র: অবস্থা কি সর্বত্রই এতটা খারাপ?

উ: দশ বছর আগে গুজরাট অনেক ভালো ছিল।

প্র: রাজনৈতিক পরিবর্তনের জন্যেই কি এমনটা ঘটেছে?

উ: গণতন্ত্রে কেউ খুব বড় হয়ে উঠলে তাঁর ফল ক্ষতিকর হতে পারে, যেমনটা হয়েছে এই মন্ত্রীর, মানে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর (অমিত শাহ) ক্ষেত্রে। ট্রান্সফার, পোস্টিং, প্রোমোশন সবই তাঁর হাতে। কেউ ওর কথামতো কাজ না করলে তাকে সাইড পোস্টিং দেওয়া হয় আর এই সাইড পোস্টিং কেউই চায় না। সেজন্যই সোহরাব উদ্দিন ঘটনার তদন্ত চলার সময় আমি বদলি নিতে চেয়েছিলাম।

প্র: আপনাকে বদলি করে দেওয়া হয়েছিল কারণ তাঁরা চায়নি আপনি তদন্ত করুন, তাই কি?

উ: আসলে আমি ভুল পথে তদন্ত করতে চাইনি।

প্র: এবং তাঁরা চেয়েছিল আপনি ভুল পথেই তদন্ত করুন?

উ: হ্যাঁ।

প্র: কেউ কীভাবে এসব করতে পারে? শাহ রেহাই পেলেন কীভাবে?

উ: উনি ঠিক উপায় খুঁজে নিয়েছিলেন। ক্ষমতায় থাকা লোকেদের খুব কাছের মানুষ ছিলেন উনি।

প্র: উনি কি মুখ্যমন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ ছিলেন?

উ: হ্যাঁ, মুখ্যমন্ত্রীর খুবই ঘনিষ্ঠ ছিলেন উনি। মুখ্যমন্ত্রীর সবথেকে কাছের মানুষ ছিলেন।

প্র: তাহলে মুখ্যমন্ত্রী তাকে গ্রেপ্তার হওয়ার হাত থেকে বাঁচাতে পারলেন না কেন?

উ: সেটা উনি করতে পারতেন না (ওর বিরুদ্ধে সাক্ষ্যপ্রমাণ ছিল)।

প্র: ও, তাহলে উনি নিজেও এতে জড়িয়ে পড়তেন?

উ: উনি যদি হস্তক্ষেপ করতেন তাহলে উনাকে সরে যেতে হত, সেদিক থেকে এই লোকটি (মুখ্যমন্ত্রী) অত্যন্ত চতুর। উনি সবই জানতেন, কিন্তু একটা দূরত্ব রেখে চলতেন, তাই এক্ষেত্রে উনাকে ধরা যায়নি। একটা আইন আছে, আপনি একের পর এক এনকাউন্টার চালিয়ে যেতে পারেন না। কোনো কারণে যদি তা করতেও হয়, তাহলেও মানুষগুলোকে হত্যা করা চলে না। আর এইসব মন্ত্রীদের পক্ষে ব্যাপারটা খুবই সহজ। কোনো দায়দায়িত্ব থাকে না এদের, কোথাও সই করে না, শুধু মুখে নির্দেশ দেয়। তবে এখন প্রযুক্তির উন্নতির ফলে ব্যাপারটা খুব সহজ হয়ে গেছে। ওরা ফোন ব্যবহার করে, সেই ফোন ট্র্যাক করা যায়।

প্র: হ্যাঁ, এক জায়গায় পড়লাম আপনার কেসে কোনো কল রেকর্ডের সূত্রেই মন্ত্রীকে ধরা গিয়েছিল।

উ: হ্যাঁ।

প্র: কিন্তু আমরা যেমনটা দেখছি তাঁর বিপরীতে রাজ্যে কি কোনো নীতিনিষ্ঠ অফিসার নেই?

উ: আছে, অনেক আছে, কিন্তু কোন ক্ষতি করার জন্য তো কয়েকজন খারাপ লোকই যথেষ্ট। কয়েকজন ভালো অফিসার অবশ্য এখনও আছে, সেইজন্যই এখন মন্ত্রীদের নামে অভিযোগ আনা সম্ভব হচ্ছে।

প্র: কেউ একজন আমাকে রাহুল শর্মা নামে একজন অফিসারের সঙ্গে দেখা করতে বলছিলেন। তিনি নাকি খুব নীতিনিষ্ঠ, আর তাই নাকি সরকারের সুনজরে নেই?

উ: রাহুল মুসলিমদের জীবন বাঁচিয়েছিলেন বলে (সরকার) ওর ওপর নজরদারি চালাচ্ছে। একটা স্কুলে মুসলিম শিশুদের বাঁচিয়েছিলেন উনি। শুধু বাঁচানইনি, কয়েকজনকে গ্রেপ্তারও করেছিলেন। (উনি) শাসক দলের একজন সদস্যকে গ্রেপ্তার করায় ওকে বদলি করে দেওয়া হয়। সরকারের দিক থেকে একটা সমস্যা ছিল। প্রথমটায় ওরা বুঝে উঠতে পারেনি পরিস্থিতি এতটা খারাপ হয়ে যাবে। প্রথমটায় দাঙ্গাবাজদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বাহিনীকে কাজে লাগাতে চায়নি ওরা। এ কারনেই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনের বাইরে চলে যায়।

প্র: আচ্ছা, (যেসব) হিন্দুরা মুসলিমদের বিরুদ্ধে ছিল, তাদের প্রতি কি নরম ছিল ওরা?

উ: প্রথমটায় তাই ছিল, আসলে বুঝেই উঠতে পারেনি অবস্থা এতটা খারাপ হয়ে উঠবে। তবে আপনি যা বললেন সেটা সত্যি।

প্র: কিন্তু হিন্দুদের প্রতি, দাঙ্গাবাজদের প্রতি নরম থাকার নির্দেশ তো আপনাদের, মানে অফিসারদের, দেওয়া হয়েছিল?

উ: ঠিক আমাদের নয়, মানে সবাইকে নয়। কোনো কোনো জায়গায়, কোনো কোনো এলাকায় গুরুত্বপূর্ণ পদে থাকা অফিসারদের এ ধরনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।

প্র: মোদির আগে কেশুভাই নামে একজন মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন না? কেমন মানুষ ছিলেন তিনি?

উ: মোদির তুলনায় উনি একজন সাধু ছিলেন। তুলনায় মানে, কেশুভাই কখনো ইচ্ছাকৃতভাবে কারও ক্ষতি করতেন না, সে যে ধর্মেরই লোক হোক না কেন। শুধুমাত্র মুসলিম বলেই তাদের ক্ষতি করতে দিতেন না উনি।

প্র: কিন্তু স্যার, নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে মনে হয়, অনেক তথ্যের সঙ্গে বানানো গল্পও যেন মিশে গেছে।

উ: ব্যাপারটা আসলে খুব কঠিন। এইসব লোকেরা সরাসরি নির্দেশ দেয় না, এরা সব আড়াল থেকে অদৃশ্য হয়ে কাজ করে। এমনকী আইনের ক্ষেত্রেও। যেমন ধরুন চিফ সেক্রেটারি যদি বলেন আমি আপনার কথা মানব না আর মুখ্যমন্ত্রী যদি বলেন

আপনাকে মানতেই হবে, তাহলে যা ঘটবে তাঁর সম্পূর্ণ দায়িত্ব মুখ্যমন্ত্রীরই। অবশ্য পুলিশ বাহিনীর ক্ষেত্রে সেটা আমার দায়িত্ব।

প্র: মি. চক্রবর্তী একই কথা বলেছিলেন। উনি বলেছিলেন কিছু কিছু নির্দেশ পাঠানো হত, কিন্তু সেগুলো সরাসরি পাঠানো হত না। এবং এই ব্যাপারটা অবশ্যই বুঝতে হবে...

উ: হ্যাঁ, ওরা এমনভাবে বলে যেন অতীতে যাদের উপকার করেছে সেইসব লোকেদের কিছু করতে বলছে। ওরা জানে কারা ওদের সাহায্য করবে। ইন্সপেক্টর আর নিম্নপদস্থ পুলিশ অফিসারদের সঙ্গে কথা বলে ওরা, কিন্তু সব অফিসার ওদের নির্দেশ মেনে নেয় না। উচ্চপদস্থ কিছু অফিসারদের আত্মসম্মানবোধ এখনও হারিয়ে যায়নি।

প্র: তাঁর মানে মুখ্যমন্ত্রী তাদের কিছু বললে সেটা বুমেরাং হয়ে যাবে?

উ: হ্যাঁ। যেমনটা ঘটেছিল আশোক নারায়ণের ক্ষেত্রে, যার সঙ্গে গান্ধীনগরে দেখা হয়েছিল আপনার। উনি কোনো অন্যায় নির্দেশ মানতেন না, কখনো বলতেন না 'জ্বী হুজুর'।

প্র: উনি তো একজন আইএএস অফিসারও?

উ: হ্যাঁ, ওরা লিখিত নির্দেশ পান। আমাদের বেলায় তা হয় না।

প্র: স্যার, আপনি কিছু ইন্টারেস্টিং কথাও বলেছেন। যেমন, আপনি বলেছিলেন এনকাউন্টারগুলোর তদন্তের সময় রাজনৈতিক চাপ ছিল আপনার ওপর। চাপ সৃষ্টিকারীদের কি তখন আপনি গ্রেপ্তার করতে পারতেন না? যেমন ধরুন, এই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে?

উ: কিছু প্রমাণ পাওয়া দরকার হয়। আমাদের বিরুদ্ধে এই প্রমাণটুকুই পাওয়া গেছে। ওই শাহ যখন আমাকে কিছু কাজ করতে বলেছিলেন, আমি বলে দিয়েছিলাম–করব না। অন্য অনেকে বলত, 'হ্যাঁ স্যার, করে দেব', কারণ তাদের অন্য স্বার্থ ছিল।

প্র: তাঁর মানে আপনি সরাসরি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বিরুদ্ধে গেলেও রাজ্য (সরকার) আপনার কোনো ক্ষতি করতে পারত না?

উ: না, সরাসরি পারত না, তবে আড়াল থেকে আমাকে খুন করাতে পারত। তবে এখানে গণতন্ত্র আছে, তাই আমরা টিকে থাকতে পারছি।

প্র: আমি আপনাদের সম্বন্ধে কিছু পড়াশোনা করছিলাম। তখন দেখলাম আপনাদের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শাহের বিরুদ্ধে অভিযোগ আছে

যে তিনি নাকি সংশ্লিষ্ট অফিসারদের স্বাক্ষী হতে বলতেন, বিবৃতি দিতে বলতেন?

উ: কিন্তু উনি কখনোই সেটা করে উঠতে পারেননি। উনি ঘুরিয়ে জানতে চাইতেন, কারা কারা আমার বিরুদ্ধে কথা বলছে।

প্র: মিসেস জোহরির ব্যাপারটা কী? উনি বলেছেন, সোহরাব উদ্দিন একজন সন্ত্রাসবাদী ছিল।

উ: দেখুন, সোহরাব উদ্দিনের ব্যাপারটা অতটা গুরুত্বপূর্ণ নয়, গুরুত্বপূর্ণ হল ওর স্ত্রীর ব্যাপারটা। সোহরাব উদ্দিন কোনো বৈধ এনকাউন্টারে মারা গেলেও এতটা সমস্যা হত না। প্রশ্নটা ওর স্ত্রীকে নিয়ে, তাকে হত্যা করা হল কেন? তাও তিন দিন পর।

প্র: আপনিই এর তদন্ত করছিলেন?

উ: এইসব এনকাউন্টারগুলো যে আসলে সাজানো, সেটা প্রকাশ্যে আসার পর পুরো ব্যাপারটার তদন্ত করি আমরা। গীতাই কাজটা করছিলেন, আমার অধীনেই কাজ করতেন উনি। আমি যতদিন ছিলাম ততদিন ভালোই কাজ করতেন উনি, তারপর তো ... (হাসি)

প্র: সেইজন্যই আপনাকে বদলি করে দেওয়া হয়?

উ: হ্যাঁ।

প্র: পি.সি. পান্ডের সঙ্গেও দেখা করেছি আমি।

উ: উনি তো পুলিশ কমিশনার ছিলেন।

প্র: তাঁর মানে দাঙ্গার সময় আপনারা একসঙ্গেই কাজ করেছেন?

উ: হ্যাঁ, করতে হয়েছে। আমি তো আইনি চিফ ছিলাম।

প্র: যেসব অফিসারদের সঙ্গে আমি দেখা করেছি তাঁরা অনেকেই বলেছেন, মুখ্যমন্ত্রী পান্ডেকে বিশ্বাস করে সব কিছু বলতেন এবং দাঙ্গার সময় তাকে দিয়েই সমস্ত কাজ করিয়ে নিতেন।

উ: দাঙ্গার ব্যাপারে তো এতদিনে সব কিছুই জেনে গেছেন আপনি (হাসি)।

সবই বলে দিয়েছেন রাইগার। কিছুই বাকি রাখেননি। তাঁর বলা প্রতিটি শব্দে মোদি, অমিত শাহ এবং সহযোগী পুলিশ অফিসারদের দাঙ্গায় যুক্ত থাকার ছবি ফুটে উঠছিল। তীব্র একটা ক্রোধ জন্ম নিচ্ছিল আমার মধ্যে। আমার ক্রোধটা অনুভব করেছিল মাইক। রাইগারের বাড়ি থেকে বের হবার সময় আমার হাতটা চেপে ধরে রেখেছিল ও। নির্লজ্জ একটা

ব্যাপার। গুজরাট দাঙ্গা এবং সাজানো বন্দুকযুদ্ধে রাজ্যের জড়িত থাকার কথা খোলাখুলিই বলে দিয়েছিলেন রাইগার।

রাইগার কি বলেননি যে রাজ্যের রোষের শিকার হতে হয়েছিল আইপিএস অফিসার রাহুল শর্মাকে গুজরাটের একটা মাদ্রাসায় মুসলিম ছাত্রদের জীবন বাঁচানোর জন্য? এখনও কি আমরা ধরে নেব যে গুজরাটের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী এবং তাঁর মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচার চালিয়েছিল সংবাদমাধ্যম? আমাদের রেকর্ডগুলোর প্রমাণ কিন্তু অন্য কথা বলেছে।

মাথায় খুব যন্ত্রণা অনুভব করছিলাম। বাড়ির লোকেদের কাছে, আপনজনদের উষ্ণতায় যেতে ইচ্ছে করছিল। এই দুর্ভাগা রাজ্যে ছড়িয়ে পড়া ঘৃণা থেকে দূরে পালাতে চাইছিলাম, যে ঘৃণার কথা প্রতিদিন কেউ না কেউ জানিয়েছেন আমাকে। একটু ছুটি চাই আমার।

পানির দরজায় কড়া নাড়লাম। স্থানীয় একজন কারিগরের কাছ থেকে নকশা করা কিছু হস্তশিল্প কিনে ঘরের দেয়ালে লাগানোর চেষ্টা করছিল পানি। দরজা খুলে আন্তরিক ভঙ্গিতে হেসে বলল, 'আরে, এসো, আমাকে একটু সাহায্য করো।' তারপর বলে চলল গুজরাট কত সুন্দর জায়গা। মনে মনে বললাম, হ্যাঁ, তা তো বটেই। যে ঘৃণা আমি দেখেছি তা যদি পানি দেখতে পেত। ১৮ বছরের তরুণী পানি, গুজরাটের অসংখ্য তরুণ তরুণীদের একজন। এদের মধ্যে এত ঘৃণা ছড়ানো হচ্ছে কেন? কিছুদিন কোনো কাজ করতে চাই না আমি। অজয়কে ফোন করলাম।

কোন একটা কলেজের অনুষ্ঠানের কয়েকটা পাস আছে অজয়ের কাছে। ও বলল যাওয়ার সময় আমাকে তুলে নিয়ে যাবে। কালো রঙের একটা কুর্তা পরলাম, চোখে সুর্মা লাগালাম, মেক আপ করলাম, হিলতোলা জুতো পরলাম। মাইক একটা বই পড়ছিল। আমার সঙ্গে যেতে চাইল না। একদিনের জন্য আমাকে কলেজের ছাত্রী হয়ে যেতে বলল ও, বলল ওখানে গিয়ে যেন নাচানাচি করি, সন্ধ্যাটা যেন সুন্দরভাবে কাটাই। আমি মনেপ্রাণে সেটাই চাইছিলাম। সেদিন সন্ধ্যায় মনে হল নেহরু

ফাউন্ডেশনের বাইরে কেউ গাড়ি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সকালেও ওখানেই দেখেছিলাম লোকটাকে।

হয়তো নিছকই অনুমান। কলেজে যাওয়ার জন্য অটো না নিয়ে অজয়কে মেসেজ করলাম আমাকে তুলে নিয়ে যাওয়ার জন্য। সেদিন সন্ধ্যায় প্রচুর ছবি তুললাম, ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে নাচলাম, গলা ছেড়ে গান গাইলাম। পরের দিন বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা সেই গাড়িটা আর চোখে পড়ল না।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

পি.সি. পান্ডে

পুলিশবাহিনীর অনেকে তাকে অষ্ট্রিচ পাখি বলতেন, আবার কেউ কেউ বলতেন তিনি দুর্বলের রক্ষক, মার্জিত, ভদ্র, স্পষ্টভাষী একজন অফিসার। মুখ্যমন্ত্রী তাকে সবচেয়ে বেশি বিশ্বাস করতেন। মোদি এবং অমিত শাহ রাজ্যের যাবতীয় প্রাসঙ্গিক বিষয়ে তাঁর পরামর্শ নিতেন। জীবনের সুন্দর জিনিসগুলো ভালোবাসতেন: বিদেশে ছুটি কাটাতে যাওয়া, নিজের সম্বন্ধে উজ্জ্বল পর্যালোচনা এবং ক্লাবে বা জিমখানায় বন্ধুদের সঙ্গে সুরাপানে সন্ধ্যা কাটানো।

২০০২ সালের ২ মার্চের *টেলিগ্রাফ* পত্রিকায় তাঁর সম্বন্ধে লেখা হয়েছিল:

আহমেদাবাদের সাবেক পুলিশ কমিশনার শ্রী পি.সি. পান্ডে (গণহত্যার সময় পুলিশ কমিশনার ছিলেন তিনি)। পুলিশদের ভূমিকা সবথেকে চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে পুলিশ কমিশনার পি.সি. পান্ডের এই বক্তব্যে, 'সমাজ জীবন থেকে পুলিশরা তো বিচ্ছিন্ন নয়.... (যখন) সামাজিক ধারনায় কোনো পরিবর্তন ঘটে, তখন পুলিশরাও তাঁর অংশীদার এবং (সেই পরিবর্তনের) কিছু তাপ তাদের ওপর পড়েই।'

প্রথমে মাইককে দিয়ে পান্ডেকে ফোন করালাম, তারপর দেখা করার সময়টা নিশ্চিত করার জন্য নিজে ফোন করলাম। কথার সুর শুনেই বুঝতে পারছিলাম আমাদের সম্বন্ধে বেশ একটা সম্ভ্রম তৈরি হয়েছে তাঁর মনে। আমরা যখন আহমেদাবাদে তাঁর বাংলোয় ঢুকলাম তখন তিনি হুইলচেয়ারে বন্দি তাঁর মাকে ঠেলে ঠেলে বাগানো ঘোরাচ্ছিলেন। তাকে আর তাঁর মাকে 'নমস্তে' জানালাম আমি। মাইককে পরিচয় দিলাম আমার সহকারী হিসেবে। বাড়ির ভিতরে নিয়ে যাওয়া হল আমাদের। শুনেছিলাম তাঁর স্ত্রীর ক্যানসারের চিকিৎসা চলছে। বসার ঘরে এসে নিজের পরিচয় দিলেন তিনি। কফি টেবিলের ওপর ছড়িয়ে ছিটিয়ে করে রাখা বিভিন্ন

খবরের কাগজ ও সাময়িকপত্র, এক কপি *ইন্ডিয়া টুডে* এবং অন্যান্য গুজরাটি সংবাদপত্র।

পি.সি. পান্ডে প্রথমেই আমার 'ত্যাগী' পদবী নিয়ে প্রশ্ন করলেন। আমাদের বংশে রাষ্ট্রীয় সেবক সংঘের প্রভাবের কথা, আমার সংস্কৃত শিক্ষক বাবা এবং আমেরিকায় পড়াশোনা করার কথা বললাম। বললাম আমি একজন কায়স্থ। মুম্বাই আর কানপুরে আমাদের আত্মীয়রা আছেন। এটাও বললাম ধর্মের সঙ্গে আমার কোনো যোগ নেই। তবে সেই সঙ্গেই জানালাম যে দেশে মুসলিম তোষণের পরিবেশটা আমাকে আমার ধর্মের দিকে টেনে এনেছে।

যেমনটা আশা করেছিলাম তেমন ফলই পাওয়া গেল, তবে পান্ডে অত্যন্ত বিচক্ষন। তিনি জানতে চাইছিলেন তাঁর সঙ্গে দেখা হওয়ার আগে সংবাদমাধ্যমে তাঁর সন্দেহজনক ভাবমূর্তি সম্বন্ধে কেউ আমাদের কিছু বলেছে কিনা। বেশ বুদ্ধি করেই ফেলছিলেন তিনি নিজের তাসগুলো। সেদিন আমি কোনো যন্ত্রপাতি সঙ্গে নিয়ে যাইনি। তাকে জানালাম গুজরাটে আমাদের যোগসূত্র হচ্ছেন চিত্রপরিচালক নরেশ কানোরিয়া এবং তিনি আমাদের কাছে ওর সম্বন্ধে শুধুমাত্র ভালো কথাই বলেছেন।

পান্ডে বললেন, 'ও, তাই বলুন। তা না হলে আপনারাও এই *আল জাজিরা* আর এদেশের আরও অনেক ইয়েলো জার্নালিস্টদের মতো পক্ষপাতী মনোভাব নিয়েই আমার কাছে আসতেন।' আমি বললাম গুজরাটের যে হীরা ব্যবসায়ীদের কথা সারা দুনিয়া জানে, তাদের সঙ্গে দেখা করতে চাই। আমার প্রস্তুতিতে কোনো ভুল ছিল না। পান্ডের ছেলে সুরাতে হীরার ব্যবসা করেন। সাগ্রহে ছেলের ফোন নম্বর ইত্যাদি আমাকে দিয়ে দিলেন উনি। যে 'ভাইব্র্যান্ট গুজরাট' সম্বন্ধে আমরা এত চমৎকার সব কথা শুনেছি, তাঁর ফিল্মস ডিভিশন বা পাবলিসিটি ডিভিশনের কারও সঙ্গে আমার যোগাযোগ করিয়ে দেওয়ারও অনুরোধ জানালাম পান্ডেকে। 'স্যার, আমি কচ্ছ (গুজরাটের একটি জেলা) সম্বন্ধে জানতে চাই, সেই সাদা বালি, নতুন হাইওয়ে, শিল্পকৌশল, যা গুজরাটকে ভারতের সবথেকে

উজ্জ্বল একটা রাজ্যে পরিণত করেছে। এখানকার সংস্কৃতি সম্বন্ধেও কিছু জানতে চাই।'

গুজরাট দাঙ্গায় বিতর্কিত ভূমিকা সম্বন্ধে পান্ডে কিছু ইঙ্গিত দেওয়া সত্ত্বেও আমি এমন ভাব দেখলাম যেন এ ব্যাপারে আমার বিন্দুমাত্রও কৌতূহল নেই। উনি আমাকে থিরুপুগজা নামক জনৈক দক্ষিণ ভারতীয় আমলার ফোন নম্বর দিলেন, যিনি আমাদের গুজরাটের, বিশেষ করে 'ভাইব্রান্ট গুজরাট' সংক্রান্ত প্রচারাভিযানের ব্যাপারে যাবতীয় তথ্য দিতে পারবেন।

উনি বললেন, 'মৈথিলী, খবরের কাগজে সুহেল শেঠ নামে অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় একজন বুদ্ধিজীবীর লেখা এই কলামটা আপনার অবশ্যই পড়া উচিত।' নিজেকে ভালোভাবেই তৈরি করে রেখেছিলেন উনি। যেসব লেখায় মোদির প্রশংসা ছিল তাঁর প্রিন্টআউট বের করে রেখেছিলেন, আর ছিল *ইন্ডিয়া টুডে*'র একটা কপি যেখানে দেওবন্দের মাওলানা ভাস্তানভি মোদির প্রশংসা করেছিলেন। পরে অবশ্য মাওলানা ভাস্তানভি বলেছিলেন ওই লেখায় তাঁর কথাকে ভুলভাবে উদ্ধৃত করা হয়েছে। সুহেল শেঠের কলামের অন্তত ১২টি কপি করিয়ে রেখেছিলেন পান্ডে। তাঁর একটা আমাকে দিয়ে বললেন, 'ছবিটা যদি আমেরিকার গুজরাটিদের জন্য করা হয়, তাহলে আমার ধারণা মোদিজি নিশ্চয়ই আপনার সঙ্গে দেখা করবেন। আমি একটু খোঁজখবর নিয়ে দেখা করার দিন ঠিক করে দেব।' একটু উৎসাহ দেখিয়ে বললাম পান্ডে যার সঙ্গে দেখা করতে বললেন তাঁর সঙ্গেই দেখা করব আমি, কারণ তিনি গুজরাটের একজন বিদগ্ধ মানুষ, ছবি তৈরির ব্যাপারে তাঁর পরামর্শ আমার একান্তই প্রয়োজন। কথাটা শুনে খুশি হলেন পান্ডে।

পরে ক্যান্টিনে ২০ টাকার লাঞ্চ খেতে খেতে মাইককে বললাম, আমরা কিন্তু যেনতেন লোকেদের সঙ্গে কাজ করছি না। আমার প্লেটের পাপড়ভাজাটা মাইকের প্লেটে তুলে দিলাম। খুব মজা করে খেল মাইক। ওকে বললাম *তেহেলকা*'য় আমার একজন সহকর্মী অতীতে গুজরাটে একটা স্টিং অপারেশন করেছিল। কিন্তু তাঁর কাজ ছিল ঠগ জোচ্চোর আর দাঙ্গাবাজাদের নিয়ে। আমাদের কাজ পোড়খাওয়া আমলাদের নিয়ে,

এখানে নিজেদের বানানো কাহিনির ব্যাপারে চূড়ান্ত আত্মবিশ্বাসী থাকতে হবে। মাইক বলল স্টিং অপারেশনের ব্যাপারটা শেষ হলে একটা চিত্রনাট্য লিখব আমরা। দু'জনেই হেসে উঠলাম।

পি.সি. পান্ডের সঙ্গে দেখা করার সময়গুলোতে রাইগার, আশোক নারায়ণ, মায়া কোদনানির সঙ্গেও কথাবার্তা চলছিল আমাদের। প্রত্যেককেই জানাতাম যে অন্যদের সঙ্গেও দেখা করছি আমরা। একদিন পি.সি. পান্ডের বাংলোর দিকে যাওয়ার সময় অল্পের জন্য বেঁচে গেলাম। তাঁর বাড়ির দিকে এগোচ্ছি এমন সময় মাত্র তিনটা বাড়ির পরে একটা বাংলোর সামনে জনৈক অফিসারের কজন আর্দালিকে দেখতে পেলাম। এই আর্দালিটি আমাকে রানা আইয়ুব নামেই চিনত। আমার কোঁকড়ানো চুল সাধারণত এলোমেলোভাবে এলিয়ে থাকে, কিন্তু ভাগ্যক্রমে সেদিন চুলটা ভালোভাবে বাঁধা ছিল আর ওড়না দিয়ে মুখের প্রায় অর্ধেক ঢাকা ছিল। পান্ডে আমার জন্য দরজায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। আমার চুলের পাশ থেকে ঘামের ফোঁটা গালে গড়িয়ে পড়ছে। শরীরের উত্তাপ বেড়ে গেছে। আমি যে ঘামছি, মুখের রং যে পাল্টে গেছে, পান্ডে সেটা খেয়াল করেছিলেন। আমাকে বাড়ির ভিতরে নিয়ে যাওয়ার সময় তিনি বললেন, 'আপনি ঠিক আছেন তো, মৈথিলী?' বললাম, ঠিকই আছি। মাত্র মিনিটখানেক আগেই আমার ছদ্ম পরিচয় যে ফাঁস হয়ে যেতে পারত, তাঁর ধাক্কাটা তখনও সামলে উঠতে পারিনি। আবহাওয়ার পরিবর্তনের ফলে হয়তো একটু জ্বর-টর হয়েছে বলে ব্যাপারটা কাটানোর চেষ্টা করলাম।

তাড়াতাড়ি বসতে দিয়ে পরিচারককে আমার জন্য এক কাপ কফি করতে বললেন উনি। এরপর প্রাথমিক চিকিৎসার সাজসরঞ্জাম আনার জন্য ভিতরে চলে গেলেন। থার্মোমিটার নিয়ে এসে আমাকে জিভের নীচে দিতে বললেন। আমি তখনও কাঁপছি। উনি আমাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে চাইলেন। এমনটা মাঝেমধ্যেই হয় বলে এড়াতে চাইলাম। থার্মোমিটারে দেখা গেল উত্তাপ ৯৯ ডিগ্রি। উনি জোর করে আমাকে একটা বিস্কুট আর কফি খাওয়ালেন, তারপর একটা প্যারাসিটামল।

ততক্ষণে কিছুটা সামলে উঠেছি। একটু হেসে মিসেস পান্ডের কথা জানতে চাইলাম। কয়েক মিনিট পরেই তিনি এসে হাজির হলেন।

পান্ডে পরিকল্পনা করছিলেন আত্মীয়দের সঙ্গে নেপাল ঘুরতে যাওয়ার, অন্তত ভাইয়ের সঙ্গে তার টেলিফোনে কথাবার্তা শুনে তেমনটাই মনে হচ্ছিল। তৎক্ষণাৎ মাথার মধ্যে হিসেবটা খেলে গেল। তাঁর মানে আমার হাতে খুব বেশি সময় নেই। বছর শেষের ছুটিতে যাওয়ার পরিকল্পনা করছিলেন তিনি, বছর শুরুর আগে আমাকেও দেশের কয়েকটা জায়গায় ঘুরে আসার পরামর্শ দিলেন। ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালাম। গুজরাটে হিন্দু মুসলিম মেরুকরণ নিয়ে আলোচনার সময় পান্ডে আমাকে বলেছিলেন, তাঁর এক আইনজীবী ও বন্ধু প্রায়ই তাঁর বাড়িতে আসেন এবং তিনি একজন মুসলিম। তারপর থেকে পান্ডের বাড়িতে গেলেই আমার বুক দুরদুর করত। কেননা আহমেদাবাদের ওই আইনজীবীকে আমি চিনতাম। তাঁর হাতে থাকা বিভিন্ন ফৌজদারি মামলার ব্যাপারে অনেকবার তাঁর সঙ্গে দেখা করতে হয়েছে আমাকে। স্নায়ুর প্রবল চাপ সত্ত্বেও, পরবর্তী কয়েক মাস ধরে পি.সি. পান্ডের সঙ্গে কথোপকথন চালাতে কোনো অসুবিধে হয়নি আমার।

প্র: আরএসএসের সঙ্গে গুজরাট কতটা জড়িত?

উ: দেখুন, ওরাই হচ্ছে গুজরাটের বিজেপি সরকারের মেরুদণ্ড। ইসলামিক দলগুলোকে ঠেকানোর একমাত্র সংগঠন ওরাই।

প্র: মোদি আরএসএসের কতটা ঘনিষ্ঠ?

উ: হ্যাঁ, উনি আরএসএসের খুবই ঘনিষ্ঠ। ওরা উনার খুব কাছের। উনি তো একজন ক্যাডার ছিলেন। এখনকার আরএসএস প্রধান অমরুতভাই কাদিওয়ালা উনাকে ক্ষমতা দিয়েছিলেন।

প্র: আপনাদের মন্ত্রীদের ব্যাপারে অনেক কথা শুনেছি আমি দাঙ্গা কিংবা অন্য নানান ঘটনার ক্ষেত্রে। পান্ডিয়াকে আরএসএস খুব পছন্দ করত, ঠিক না?

উ: হ্যাঁ, উনি এখানকার খুব জনপ্রিয় মন্ত্রী ছিলেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, হরেন পান্ডিয়া, আরএসএসের খুবই ঘনিষ্ঠ ছিলেন। একই কারণে অমিত শাহ ও এসেছিলেন, যিনি এখন জেল খাটছেন। উনিও আরএসএসের খুব ঘনিষ্ঠ ছিলেন। গোরধন জাদাফিয়া নামে আর

একজন নেতা আছেন, তিনি বিশ্ব হিন্দু পরিষদের খুব ঘনিষ্ঠ ছিলেন।

প্র: আর এরা সকলেই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন। আচ্ছা, সচেতনভাবেই কি এদের....?

উ: হ্যাঁ, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রনালয়ই পুলিশ অফিসারদের নিয়ন্ত্রণ করে, কাজেই সেখানে (নিজেদের) লোক থাকা ভালো। কেশুভাই মুখ্যমন্ত্রী থাকার সময় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন হরেন পান্ডিয়া।

প্র: গোরধন জাদাফিয়ার সঙ্গে আমার দেখা করাটা কি ঠিক হবে? আপনি কী বলেন?

উ: না, ওর সঙ্গে আপনার দেখা করা ঠিক হবে না বলে মনে হয়, কারণ তাহলে বিষয়টা অন্যদিকে চলে যাবে... মানে এটা তো আপনার ছবির অঙ্গ নয়।

প্র: আচ্ছা, আমি দিল্লিতে গেলে কি অমিত শাহের সঙ্গে আমার দেখা করা উচিত?

উ: হ্যাঁ, অবশ্যই। উনি একজন তাত্ত্বিক নেতা।

প্র: কেন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে বলছেন?

উ: অমিত শাহের সঙ্গে দেখা করলে অন্য দিক থেকে ব্যাপারটা জানতে পারবেন। উনি খুব মন দিয়ে কাজ করেন। আরএসএস এবং এই রাজ্য সম্পর্কে অনেক কিছু বলতে পারবেন উনি।

প্র: তাঁর কাছে কি আপনার কথা বলতে পারি? উনি কোথায় থাকেন?

উ: হ্যা, তাকে বলবেন যে আমি বলেছি। উনি গুজরাট ভবনে থাকেন।

প্র: দাঙ্গার ব্যাপারে কি মোদিজির সঙ্গে কথা বলা দরকার?

উ: না, উনি কিছুই বলবেন না।

প্র: ওটা কি ওর দুর্বল জায়াগা?

উ: হ্যাঁ। কথা বলতে যাবেন না।

প্র: আচ্ছা, দাঙ্গার সময় কি আপনি ওখানেই ছিলেন?

উ: হ্যাঁ, সেটা আমার জীবনের এক ভয়ংকর অধ্যায়। প্রায় ৩০ বছর চাকরি করছি। কিন্তু ব্যাপারটা দেখুন - ১৯৮৫, ৮৭, ৮৯, ৯২ সালেও দাঙ্গা হয়েছে। বেশির ভাগ সময় হিন্দুরাই মার খেয়েছে আর মুসলিমরা ছড়ি ঘুরিয়েছে। তাই ২০০২ তে এটাই হওয়ার ছিল, হিন্দুরা প্রতিশোধ নিয়েছিল। ১৯৯৫ সালের পর লোকেরা মনে করেছিল এখন তাদেরই সরকার আছে, কারণ তখন বিজেপির সরকার ছিল। ওরা বলে আমি নাকি মানুষের কাছে

পৌঁছাতে পারিনি। কেউ তো আমাকে ডাকেনি। আমি তো আর অলৌকিক শক্তিধর নই যে বুঝে নেব কে আমাকে ডাকছে।

প্র: তাহলে মোদি হচ্ছেন পোস্টার বয়?

উ: মল্লিকা সারাভাইয়ের নাম জানেন তো? বিখ্যাত নৃত্যশিল্পী। উনি চরম মোদিবিরোধী। লোকে বলে মোদির জন্যই ২০০২ এর দাঙ্গা হয়েছিল। উনি বলেন, আমি তো আর গোধরায় ট্রেনে আগুন জ্বালাতে যাইনি। আমি যদি সেটা না করে থাকি, তাহলে তাঁর পরের ঘটনার জন্য আমাকে দায়ী করা হবে কেন? আগের কাজটা যদি আমি করতাম, তাহলে পরের কাজটাও আমি করেছি বলা যেত। এটা আসলে ওখানে যা ঘটেছিল তাঁরই প্রতিক্রিয়া। মানে, যুক্তিসম্মতভাবে বিচার করলে বলতে হয়, একদল মুসলিম গিয়ে ট্রেনে আগুন লাগাল, সেক্ষেত্রে আপনার প্রতিক্রিয়া কী হবে?

প্র: পাল্টা মার দিতে হবে?

উ: হ্যাঁ হ্যাঁ, পাল্টা মার দিতে হবে। এখন এই পাল্টা মার দেওয়াটা, আপনি নিশ্চয়ই এর মধ্যে পড়াশোনা করে দেখেছেন যে, ৮৫, ৮৬, ৯২ সালে এবং আরও অন্যান্য সময়ে (হিন্দুরা) মার খেয়েছে, তাই যা হল, এই সুযোগ, পাল্টা মার দাও.... এতে আর কী মনে করার আছে?

প্র: আর আমি নিশ্চিত যে উনি এটা থামাতে চেষ্টা করেননি।

উ: আসলে লোকে এতটা আবেগপ্রবণ হয়ে পড়লে তাদের আর ঠেকানো যায় না, মিশরে যেমনটা ঘটেছে।

আপনি বলুন, এদের ওপর কি আপনি গুলি চালাতে বলবেন? উনি যদি তাই করতেন, তাহলে কী করে বলবেন যে মোদি এটা বন্ধ করতে পারতেন? রিমোটটা ওর হাতে ছিল না।

প্র: কতদিন ধরে দাঙ্গা চলেছিল?

উ: প্রথম পর্যায় দু'দিনের মতো ছিল, তাঁর বেশি নয়।

প্র: আচ্ছা, মিডিয়া কি দেখাচ্ছিল যে হিন্দুরা মুসলিমদের আক্রমণ করছে?

উ: হ্যাঁ, তাছাড়া আর কী দেখাবে? আবার মুসলিমরাও হিন্দুদের আক্রমণ করছিল। দুটোই একসঙ্গে ঘটছিল। হয়তো শতকরা হিসেবে অনেক কম, কিন্তু এখানে তো আমরা সমান-অসমান নিয়ে বিচার করতে কিংবা দুটোকে সমানভাবে ব্যালেন্স করতে বসিনি। তবে গোধরায় ট্রেনে আগুন লাগানোর ক্ষেত্রে মুসলিমরাই

প্রথমে আক্রমণকারীর ভূমিকা নেয়, তাঁর প্রতিক্রিয়া তো ঘটবেই। মুসলিমদের অনেক বেশি ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। কিন্তু ওরাও ছেড়ে কথা বলেনি। কোনো হিন্দু ওদের সামনে গিয়ে পড়লে সে খুন হয়ে যেত। এগুলো ওকে জিজ্ঞেস করবেন। উনি সব বলবেন।

প্র: ও হ্যাঁ, সিট এর রিপোর্ট বের হবার আগের দিন খবরের কাগজে একটা লেখা দেখছিলাম।

উ: হ্যাঁ, দাঙ্গার তদন্ত করার জন্য একটা সিট কমিটি গঠন করা হয়েছিল। সুপ্রিম কোর্টে রিপোর্ট দাখিল করা হয়। তাঁর একটা কপি মিডিয়ার কাছে পৌঁছে যায়, ওই খবরের কাগজটার হাতে। নইলে ওটা কিন্তু গোপন রিপোর্ট ছিল। রিপোর্টে ওকে কোনো কিছুর জন্য দায়ী করা হয়নি। কিন্তু এই রিপোর্টটা যে লিখেছে সে বলেছে ওকে দায়ী করার মতো কিছু খুজে পায়নি সে।

প্র: আপনাকে অভিযুক্ত করার চেষ্টা হয়নি?

উ: হয়েছে। ওরা বলেছিল, যেসব অফিসার ওর হয়ে কাজ করেছে তাদের অবসরের পরেও পোস্টিং দেওয়া হয়েছে। আমি বললাম, কীসের পোস্টিং? আমার পোস্টিং থেকে আমি কোনো টাকা পয়সা পাই না।

প্র: কিন্তু আপনি রাজ্যের হয়ে কাজ করলে কেন আপনাকে পুরস্কৃত করবেন না উনি? তাহলে কি যারা ওর বিরুদ্ধে কাজ করেছে তাদের পুরস্কার দেওয়া হবে?

উ: তা ঠিক, যারা ওর বিরুদ্ধে কাজ করেছে তাদের কেন পোস্টিং দেবেন উনি?

প্র: দেওয়া একেবারেই উচিত নয়।

উ: এ ব্যাপারে কোনো প্রশ্নই ওঠে না।

প্র: উনি তো কোনো সাধু নন।

উ: তা তো বটেই।

প্র: আপনি রাস্তায় গিয়ে লোকেদের জিজ্ঞেস করুন, পরিমল গার্ডেনে যান।

উ: হ্যাঁ, মানুষ ওকে ভালোবাসে।

প্র: আমার মনে হয় এই ভালোবাসার একটা কারণ হল, ওরা যা চায় তাই ওদের দিয়েছেন উনি। উনি বুঝেছিলেন ওরা কী চায়। বেশির ভাগ লোক বলে এখানে কোনো সংখ্যালঘু তোষণ নেই, নিজেদের গৌরব ফিরে পেয়েছে তাঁরা।

উ: হ্যাঁ, অযাচিতভাবেই এই প্রতিদানটা পাওয়া গিয়েছিল।

প্র: আর তাই মুসলিমরা ওকে ঘৃণা করে?

উ: একেবারে কট্টর মুসলিমরা করে, কিন্তু তাঁরা তো মিডিয়া যা গেলাচ্ছে তাই গিলছে। ওই দেওবন্দ প্রধান ভাস্তানবির কথাই ধরুন। *ইন্ডিয়া টুডে* লিখেছে যে ভাস্তানবি বলেছেন গুজরাটে সবাই সমান সুযোগসুবিধে পায়। এর বিরুদ্ধে আপত্তি উঠল, কারণ ওদের মনে হল ২০০২ সালে মোদি যা করেছিলেন তাঁর জন্য তাকে সার্টিফিকেট দিচ্ছেন উনি। আমি (মুকুল) সিনহার বাড়িতে বসেছিলাম, তখন *আল জাজিরা* চ্যানেলের কয়েকজন সাংবাদিককেও ওখানে বসে থাকতে দেখি। অর্থাৎ মুসলিম চ্যানেলের লোকেরাও গোধরা কান্ডে রায় কভার করতে এসেছিল। ওরা তো আজেবাজে বকবেই।

প্র: উনি আমাকে কোন একটা পত্রিকা দিয়েছিলেন সেখানে সিট সম্পর্কে একটা রিপোর্ট ছিল।

উ: সেটা নির্ঘাত *কমিউনালিজম কমব্যাট*।

প্র: না না, বলছি দাঁড়ান..... *তেহেলকা*।

উ: ওহ্, ওটা হচ্ছে ইয়েলো জার্নালিজমের একেবারে খাঁটি উদাহরণ। *তেহেলকা*'র লোকেরা কী করে জানেন? ক্যামেরা নিয়ে ঘুরে বেড়ায় যাতে সবার ছবি তুলতে পারে। ওরা দেখায় এ ওকে টাকা দিচ্ছে, ওটা অভিনয় করে দেখায়, তারপর লোকেদের জানায়। ওদের কথা না শুনলেই সেটা প্রকাশ্যে দেখিয়ে দেয়।

প্র: কীভাবে দেখায় ওরা?

উ: বিভিন্ন চ্যানেলের কাছে ওগুলো বিক্রি করে ওরা। আগে একবার দেখিয়েছিল একজন মন্ত্রী অস্ত্র ব্যবসায়ীদের সঙ্গে টাকা লেনদেন করছেন। খানিক খানিক ছবি দেখানো হয়, কিন্তু পুরো ফুটেজটা দেখায় না। ২০০২ সালের ঘটনা নিয়ে যারা অতিরিক্ত বকবক করে, তাদের দেখায় প্রায়। এভাবেই ওরা টাকা কামায়। নিউজ চ্যানেলগুলোর কাছে ফুটেজ বিক্রি করে। যেমন ওই শর্মা, *আল জাজিরা*কে সাক্ষাৎকার দেওয়ার কী দরকার ছিল ওর? ওই চ্যানেলে তো সারাক্ষণ দেখাচ্ছে কীভাবে মেয়েদের ধর্ষণ করে পুড়িয়ে মারা হয়েছে। কিন্তু কেন? আসলে এসব দেখালে বেশি প্রচার পাওয়া যায়।

প্র: কমিশন নিশ্চয়ই আপনাকেও জিজ্ঞাসাবাদ করেছে?

উ: হ্যাঁ, এখনও করে চলেছে।

প্র: এর শেষ হচ্ছে না?

উ: এখনও করে চলেছে, কারণ এই ছড়িটা দিয়ে নরেন্দ্র মোদিকে আঘাত করা যাবে। ওদের কাছে ২০০২ সাল একটা সর্বক্ষাণিক পেশা, যা থেকে টাকা আমদানি হয়।

প্র: আমি জানতে চাই, মানে আপনি তো তখন পুলিশ কমিশনার ছিলেন, তো ব্যাপারটা সামলিয়েছিলেন কীভাবে?

উ: সে এক ভয়ংকর অভিজ্ঞতা। এরকম পরিস্থিতি যে আগে কখনো দেখিনি তা নয়, কিন্তু এটা একেবারে অন্য রকম ব্যাপার ছিল। অনেকটা মিশরের ঘটনার মতো। আমরা জানি মিশরে জনগনের ওপর পুলিশ লেলিয়ে দেওয়ার নিয়ম নেই, তাহলে এখানে যারা প্রতিবাদ জানাচ্ছে সেই জনতার বিরুদ্ধে কী করে পুলিশ পাঠানো যায়? সেটা করার পর কি আমরা আর বেঁচে থাকতাম? পুলিশ পাঠানোটা কোনো সমাধান ছিল না।

প্র: ওই গোধরার ঘটনার সূত্রেই গোটা গুজরাটের ঘটনাগুলো ঘটল?

উ: ঠিক তাই। অযোধ্যা থেকে একটা ট্রেন আসছিল, তাতে ভিএইচপির সমর্থকরা ছিল। মূলত ভিএইচপির লোকেরা অযোধ্যায় একটা মন্দির বানাতে চাইছিল। অযোধ্যা থেকে ফিরছিল তাঁরা, মোট ৭৩ জন লোক ছিল। কিছু মুসলিম তাদের ওপর হামলা চালায়, স্থানীয় লোক তাঁরা, পেট্রলের টিন নিয়ে কামরায় ঢুকে আগুন লাগিয়ে দেয়। তাতে ৬১ জন লোক মারা যায়। এর প্রতিবাদে বনধ ডাকে ভিএইচপি। ২৮ তারিখে হিংসাত্মক কাজকর্ম ছড়িয়ে পড়ে, সবাই রাস্তায় নেমে আসে- বৃদ্ধরা, যুবকরা, মেয়েরা....

প্র: কিন্তু ওর বিরুদ্ধে অভিযোগটা কী?

উ: ওদের ধারণা উনিই সবাইকে বেরিয়ে আসার জন্য সংগঠিত করেন। ২৭ তারিখে উনি গোধরায় গিয়েছিলেন.... মানে উনি মুসলিমদের বিরুদ্ধে হিংসাত্মক কার্যকলাপ পরিচালনা করেন।

প্র: এমনও অভিযোগ আছে যে উনি গোধরায় গেলেন অথচ দাঙ্গাকারীদের সঙ্গে দেখা পর্যন্ত করলেন না।

উ: সেটা উনি কেন করবেন? কেন দেখা করবেন?

প্র: ঠিক, যখন হিন্দুরাও খুন হয়েছে।

উ: রাত দশটা-এগারোটা নাগাদ ফিরে আসেন উনি।

প্র: ওদের ধারণা উনি তাদের কোনো ব্যবস্থা নিতে বারণ করেছিলেন।

উ: হ্যাঁ, কমিশন আমাকে এই প্রশ্নটা করেছিল। আমি বললাম আমার কাছে এরকম কোনো নির্দেশ আসেনি। বললাম ওর কাছ থেকে এরকম কোনো নির্দেশ পাইনি আমি। আমি চেষ্টা করেছিলাম, তা সত্ত্বেও বহু মানুষ খুন হয়েছিল। আমি বলছি না যে সবাইকে আমি রক্ষা করতে পারতাম। আমি তো আর ভগবান নই, তবু যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলাম।

প্র: তাঁর মানে এটাই কি একমাত্র ব্যাপার?

উ: না, আসলে আমার বিরুদ্ধে কেবলমাত্র এটাই বলার ছিল ওদের, কেননা একমাত্র এভাবেই নরেন্দ্র মোদির কাছে পৌঁছাতে পারত ওরা, আমার সূত্র ধরে।

প্র: আর আপনি ওর খুবই ঘনিষ্ঠ ছিলেন, সেটাও কি একটা কারণ ছিল?

উ: আমি মোদির বিরুদ্ধে কিছু বললে খুশি হত ওরা।

প্র: তাঁর মানে আপনার অনেক শত্রু সৃষ্টি হয়েছে, এমনকী পুলিশ বিভাগের মধ্যেও?

উ: জনাদুয়েক আইপিএস অফিসার শত্রু হয়ে গেছে।

প্র: যেমন আমি যে কয়েকজনের কথা শুনেছিলাম, যারা এখানে ভালো কাজ করছিলেন?

উ: হ্যাঁ। রাহুল শর্মা, সতীশ ভার্মা, কুলদীপ শর্মা–এরা।

প্র: হ্যাঁ হ্যাঁ।

উ: ওই কুলদীপ শর্মা। ওকে শিপ অ্যান্ড উল (বিভাগ) এ পাঠানো হয়। উনি এখন সরকারের বিষনজরে পড়েছেন। সরকারের সুনজরে আছেন মুকুল সিনহার মতো লোকেরা। এ এক বিশাল গল্প, আপনাকে পুরোটা জানতে হবে। তখনকার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন কুলদীপ শর্মা।

প্র: তখন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কে ছিলেন?

উ: অমিত শাহ।

প্র: যিনি গ্রেপ্তার হয়েছিলেন?

উ: কুলদীপ শর্মা মুখ্যমন্ত্রীকে বলেছিলেন যে আপনার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীটি খুব বজ্জাত। তখন মুখ্যমন্ত্রী নিশ্চয়ই তাকে (সেটা) প্রমাণ করতে বলেছিলেন।

প্র: কিন্তু উনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বিরুদ্ধে গেলেন কী করে?

উ: শুনুন না। তারপর উনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বিরুদ্ধে সিবিআই তদন্ত চেয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে একটা চিঠি লেখার ধৃষ্টতাও দেখান। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী বলেন একজন অবসরপ্রাপ্ত চিফ সেক্রেটারিকে দিয়ে তদন্ত করাব আমি।

প্র: তাঁর মানে অমিত শাহ গ্রেপ্তার হতে খুব খুশি হয়েছিলেন তিনি।

উ: তাঁর গ্রেপ্তার হওয়ার পিছনে শর্মারই প্রধান ভূমিকা ছিল।

প্র: কী রকম?

উ: সিবিআই এর মিডিয়ার কাছে উনিই সব তথ্য দিয়েছিলেন। পান্ডিয়ান নামে একজন অফিসারের ফোনকলের রেকর্ড প্রমাণ করে দিয়েছিলেন তিনি।

প্র: কীভাবে?

উ: পান্ডিয়ান আর কুলদীপের পরস্পরের বিরুদ্ধে অন্য কিছু ঘটনা ছিল। একটা ঘটনার কথা খবরের কাগজে ফাঁস করে দেন পান্ডিয়ান। তখন উনি (কুলদীপ) পান্ডিয়ানকে জেলে পাঠাতে চেষ্টা করেন। আর পান্ডিয়ান সত্যিই এনকাউন্টারের ঘটনায় যুক্ত ছিলেন।

প্র: ও, তাঁর মানে এইভাবেই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে ফাঁসাতে পেরেছিলেন তিনি?

উ: হ্যাঁ, কারণ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর খুব ঘনিষ্ঠ ছিলেন পান্ডিয়ান। তিনি ওর সঙ্গে কথা বলেন। সেই সূত্রেই উনি প্রমাণ করে দেন যে (অমিত) শাহ এনকাউন্টারে জড়িত ছিলেন।

প্র: আচ্ছা, এনকাউন্টারে কাদের মারা হয়েছিল?

উ: সব ক'টাই বদমাশ আর ছুটকো ক্রিমিনাল। আইন যখন তেমন কিছু করতে পারছে না, তখন খতম করে দাও ওদের।

প্র: শুনেছি একজন মেয়েকে, মানে মহিলাকেও নাকি সন্ত্রাসবাদী বলে এনকাউন্টারে মেরে দেওয়া হয়েছিল?

উ: হ্যাঁ, হ্যাঁ।

তো যেটা বলছিলাম। আমি ছিলাম ডিজি, পুলিশ বিভাগ থেকে রিটায়ার করব, এই সময় উনিও বিদেশ থেকে ফিরে এলেন। উনি পুলিশের ডিজি হতে চাইলেন। কিন্তু যে-লোকটা সারাক্ষণই সরকারের বিরুদ্ধে কিছু না কিছু করছে, সেরকম একজন লোককে কী করে নিয়োগ করা যায়।

প্র: তাই তো। উনি সরকারের বিরুদ্ধে কাজ করেছেন, তাকে কী করে নিয়োগ করা হবে!

উ: এরকম একজন লোককে (কুলদীপ শর্মা) সরকার নিয়োগ করতে পারেন না, তাই তাকে একটা সাইড পোস্টিং দেওয়া হয়।

প্র: কীরকম?

উ: তাকে শীপ অ্যান্ড উল বিভাগের চেয়ারম্যান করে দেওয়া হয়। (হাসি)

প্র: ওহ, ... এটা তো শাস্তিমূলক পোস্টিং।

উ: হ্যাঁ, শাস্তিমূলক পোস্টিংই বটে। সরকারের বিরুদ্ধে গেলে তো, মানে.... মানে তা না হলে ডিজি হওয়ার পক্ষে উনিই ছিলেন সবচেয়ে উপযুক্ত ব্যক্তি। পুলিশি ব্যবস্থা এবং সংস্কারের ওপর একটা পি.এইচ. ডিও করেছিলেন তিনি। কিন্তু তিনি প্রতিশোধ নিতে চাইছিলেন, তা থেকেই সব গড়বড় হয়ে গেল। মুখ্যমন্ত্রী বরাবরই বলতেন তিনি একেবারেই নির্ভরযোগ্য নন। আসলে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর ভালো সম্পর্ক ছিল।

প্র: কিন্তু এই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তো অন্য চরিত্রের!

উ: তবু আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে বলব আপনাকে। উনি জামিন পেয়েছেন এই শর্তে যে উনি গুজরাটে যেতে পারবেন না। তাই আমি বলছি আপনি তাঁর সঙ্গে দেখা করুন। উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব। অত্যন্ত বুদ্ধিমান। অনেক ইন্টারেস্টিং ব্যাপার আছে।

প্র: আদর্শবাদী মানুষ?

উ: হ্যাঁ, মনেপ্রাণে আরএসএস পন্থী।

প্র: এই সবকিছু কেন ঘটছে?

উ: তিস্তা আর সিনহার মতো লোকেরা কিন্তু এটা পছন্দ করে।
যাই বলুন না কেন, জনতার ৮০ ভাগই তো সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুরা, কাজেই তাদের দিকটা তো দেখতেই হবে। যেমন কংগ্রেস দেখে। আর মুসলিমদের অবৈধ কার্যকলাপের হয়ে কেন দালালি করতে হবে বলুন তো? মুসলিমরা যতই বাজে কাজ করুন না কেন, তাদের সমর্থন করতে হবে, আর হিন্দুরা যতই ভালো কাজ করুক, তাদের বিরোধিতা করতেই হবে?

প্র: কিন্তু হিন্দুদের তো এখন নিজেদের একেবারে স্বাধীন বলে মনে করা উচিত...

উ: তাই তো। শহরে গিয়ে হিন্দু আর মুসলিম মহল্লাগুলোয় একবার চক্কর দিলেই বুঝতে পারবেন। বিস্তর কল রেকর্ড ঘাঁটতে হয়েছে আমাদের। তাঁর জন্যই আইএস জঙ্গিদের ধরা সম্ভব হয়েছিল (গুজরাট বিস্ফোরণের ব্যাপারে)।

প্র: ওয়াও!

উ: কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট বলল এদের বিরুদ্ধে মামলা চালানোর দরকার নেই।

প্র: কেন?

উ: সংখ্যালঘু তোষণ।

প্র: সুপ্রিম কোর্টেও এমনটা হয়?

উ: হ্যাঁ, হয়। এইসব লোকেদের দেওয়ালে দাঁড় করিয়ে গুলি করে মারা উচিত। প্রথমে একটা বোমা বিস্ফোরণ হল, ছ'জন মারা গেল। তারপর আর একটা বিস্ফোরণ। তৃতীয়টা ঘটল ট্রমা স্টোরের কাছে, যেখানে রোগীরা আসে। মুখ্যমন্ত্রীকে ফোন করে আমি বললাম, আপনি যাবেন না। উনি ততক্ষণে কমিশনারের অফিসে পৌঁছে গেছেন। একটা ভ্যানের মধ্যে বোমাটা রাখা ছিল। কত পরিকল্পনা করে এসব ঘটানো হয়। তারপরেও ওদের তোষণ করতে হবে। কেন? ভোটের জন্য। আমার সবথেকে ঘনিষ্ঠ বন্ধু একজন মুসলিম, তবে সেটা আলাদা ব্যাপার, সে একজন ব্যক্তি মাত্র। ওদের সঙ্গে যেমন খুশি আচরণ করা হোক, আমার কোনো আপত্তি নেই।

প্র: দাঙ্গার সময় মুসলিমরা উচিত শিক্ষা পেয়েছে, এটা ভাবতেও ভালো লাগে আমার।

উ: হ্যাঁ, একটা সময়ে এসে মনে হয় যা হয়েছে ঠিক হয়েছে। এ কারণেই ওইসব লোকগুলোকে (মুসলিম) জেলে পাঠাতে পেরে আমি খুব খুশি। দারুণ তৃপ্তি পেয়েছি। মুকুল সিনহা আর তিস্তার মতো লোকেরা বলবে, এ সব তো নৈরাজ্য। হ্যাঁ, নৈরাজ্য, কিন্তু কারা এই নৈরাজ্য সৃষ্টি করেছে? ওই মুসলিমরাই। কোনো রাজনৈতিক দলের প্রতিই আমার তেমন প্রীতি নেই, তবে কংগ্রেস যদি এইভাবেই চলে, তাহলে আমি হয়তো বিজেপির সঙ্গে থাকব।

প্র: আচ্ছা, এনকাউন্টার সম্বন্ধে আপনার কী মনে হয়?

উ: দেখুন, ব্যক্তিগতভাবে আমি এনকাউন্টারের বিরুদ্ধে, এটি খুন করার মতো ব্যাপার, তবে মাঝেমাঝে এটা প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে।

প্র: যে অফিসারের সঙ্গে আমি কথা বলেছিলাম, তিনিই আমাকে এনকাউন্টেরর কথা বলেছিলেন।

উ: আচ্ছা, তাঁর মানে তখন আমার কথা নিশ্চয়ই উঠেছিল। আমি ডিজি ছিলাম ঠিকই, কিন্তু যখন এনকাউন্টার হয়েছে তখন আমি ডিজি ছিলাম না। এনকাউন্টার হয়েছিল ২০০5 সালে। ঘটনাটার তদন্ত করতে বলা হয়েছিল আমাকে।

প্র: ও, আচ্ছা।

উ: কিছু একে (AK) রাখার অভিযোগে ধরা হয়েছিল সোহরাব উদ্দিনকে। সেগুলো উদ্ধার হয়, পরে (তাঁর) জেল হয়.... এই হচ্ছে ব্যাপার। ওই মহিলা (কওসর বাই) তো ওর স্ত্রী ও ছিল না।

প্র: ওদের মধ্যে কি কোনো প্রেমের সম্পর্ক ছিল?

উ: মহিলা ওর সঙ্গে থাকত। তা ওই ধরনের একটা লোকের সঙ্গে থাকলে তাঁর যা ঘটবে ওরও তো তাই ঘটবে। এ তো ঝামেলা ডেকে নিয়ে আসা। আর লোকটা যে কেমন তা যে ও জানত না এমনও নয়। অবশ্য এটা কোনো মানুষকে হত্যা করার কারণ হতে পারে না।

প্র: কিন্তু স্যার, এটা কি ওরা টাকার জন্য করত নাকি আদর্শের জন্য? মানে হিন্দুত্বের আদর্শের জন্য...

উ: দুটোই। আদর্শও আছে, আবার টাকার ব্যাপারটাও আছে।

প্র: আমি শুনেছি এনকাউন্টারের পিছনে একটা বড় কারণ ছিল দুর্নীতি। সেটা কি এই জন্যই? টাকার ব্যাপার ছিল বলে? সেই জন্যই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং অফিসারদের গ্রেপ্তার করা হয়েছিল?

উ: হ্যাঁ, অধিকাংশ সময়েই ব্যাপারটার সঙ্গে টাকা জড়িয়ে থাকে।

প্র: অনেকে বলে ওই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর জন্য মুখ্যমন্ত্রীও নাকি প্রায় জড়িয়ে পড়েছিলেন?

উ: দেখুন, যারা ঘটনাটার তদন্ত দাবি করেছিল তাদের লক্ষ্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন না, তাদের লক্ষ্য ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী।

প্র: কিন্তু স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তো সত্যিই জড়িত ছিলেন, তাহলে....

উ: না, শুধুমাত্র সেই কারণে মুখ্যমন্ত্রীকে জড়িয়ে দেওয়া যায় না।

প্র: আচ্ছা, এটিএস প্রধান সিংঘলের ব্যাপারে কিছু বলুন আমাকে। আমি তো তাকে দলিত হিসেবে দেখাচ্ছি।

উ: সিংঘল এমনিতে অফিসার হিসেবে ভালো। আসলে রাজস্থানের লোক, পরে গুজরাটে এসেছে। তবে সোহরাব উদ্দিনের এনকাউন্টারে ও ছিল। প্রায় ফেঁসে যাচ্ছিল, কোন মতে বেরিয়ে যায়। আবার ইশরাতের এনকাউন্টারেও ছিল।

প্র: এতে তো সরকারের ভাবমূর্তি খারাপ হয়ে যায়!

উ: হ্যাঁ, তা যায়, আমি আর কী করতে পারি!

প্র: যেসব অফিসাররা ২০০২ এর ঘটনার সময় ওখানে ছিলেন, তাদের ভাবমূর্তি কি গুজরাটিদের মধ্যেও ক্ষুণ্ণ হয়েছে?

উ: গুজরাটিরাও মনে করে কিছু অফিসার আরও ভালো কাজ করতে পারতেন। তাঁরা রুখে দাঁড়াননি, নিজেদের দায়িত্ব পালন করেননি। আমাকে অবশ্যই সবাই নিরেপেক্ষ বলেই মনে করে।

প্র: কিন্তু আপনাকেও তো হয়রানি করা হয়েছে?

উ: না, গুজরাটিরা আমাকে হয়রানি করেছে না, হয়রানি করছে এনজিও গুলো। দেখুন মৃতদেহগুলো আহমেদাবাদে নিয়ে এসে সিভিল হসপিটালে রাখা হয়েছিল। তারপর ওই এলাকায় কিছু উত্তেজনা দেখা দেয়। এখানে ওখানে আরও কিছু ঘটনা ঘটেছে বলে খবর ছাড়াচ্ছিল। আমার দুঃখ হল, যে দুটো জায়গায় হিংসা ছড়িয়ে পড়েছিল সেখানে আমি নিজে যেতে পারিনি, যেতে পারলে নারোডা আর মেঘানিনগরে এমন ঘটনা আমি কিছুতেই ঘটতে দিতাম না। একটা জায়গায় একজন প্রাক্তন সাংসদ তাঁর সংস্থার ছাদে দাঁড়িয়ে ১০ হাজার লোকের মহড়া নিতে চান। ১২ বোরের বন্দুক থেকে গুলি চালান জনতার দিকে।

প্র: এই লোকটি কে?

উ: এহসান জাফরি, প্রায় ৭৫ বছর বয়সি এজন বৃদ্ধ। উনি আগে রাজ্যসভার সদস্য ছিলেন, এখন তিনিই গুলি চালিয়ে দিলেন। এই গুলি চালানোর ঘটনায় দু'জন মারা যায়। এটা পুলিশ রেকর্ডেই আছে। দ্যাখো আমি কী করতে পারি, এই (ভাবনা) থেকেই এমন আক্রমণ। আমার ১০ হাজার লোক আছে আর তোমার আছে ১০০ জন। আমি হলে এমন কাজ করতাম না।

প্র: তাহলে আপনাদের ছাড় দেওয়া হবে কেন?

উ: ঠিক। আপনি বলতেই পারেন পুলিশ কিছুই করেনি। কিন্তু আমরা তো কাউকে গুলি চালাতে বলিনি। উনি কিছু না করলেই পারতেন। এটাই হচ্ছে ব্যাপার। নারোডাতেও একই ঘটনা ঘটেছিল। ওখানে অতি উৎসাহি একটি হিন্দু ছেলে একটা মসজিদে উঠে পড়ে। মুসলিমরা তাকে কেটে কুঁচিয়ে ফেলে। হিন্দুরা উত্তেজিত হয়ে ওঠে, তা থেকেই দাঙ্গা শুরু হয়ে যায়।

প্র: আমাকে কেউ কেউ তিস্তা নামে একজন সমাজকর্মীর সঙ্গে দেখা করতে বলছিলেন।

উ: একজন পাক্কা বদমাশ। উদয় মহুরকরের ফোন নম্বর নিয়ে নিন, উনি *ইন্ডিয়া টুডে*'র সাংবাদিক।

প্র: সিনহা নামে একজন আইনজীবি আছে না?

উ: সে আর একটা বজ্জাত। উনি নানাবতী কমিশনে লড়ে যাচ্ছেন, বিদেশ থেকে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা পান। আর ওই মহিলা, তিস্তা শেতলবাড়, উনি শেতলবাড় পরিবারের লোক। আর ওই জাভেদ আনন্দ, ও তখন সাব-এডিটর ছিল। তাঁর আগেই বিয়ে হয়ে গিয়েছিল জাভেদের। তাই তিস্তা ওদের চিনতেন। তিস্তার বাবা এসব পছন্দ করতেন না। নিজের বউকে ছেড়ে তিস্তার সঙ্গে থাকতে শুরু করল জাভেদ। তারপর তিস্তার কোনো খোঁজখবর ছিল না, কিন্তু ২০০২ সালের পর গুজরাটে এসে চটজলদি গুজরাটের বাসিন্দা হয়ে লড়তে শুরু করেন উনি। আইজীবী পরিবারের মেয়ে হওয়ার সুবাদে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিদের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল ওর, পরে *কমিউনালিজম* নামে একটা বই লেখেন ওরা। দাঙ্গাপীড়িতদের সমর্থন করতে শুরু করেন তিস্তা, আর মধ্যপ্রাচ্য থেকে টাকা আসতে শুরু করে। সবাই ভেবেছিল বিজেপি হেরে যাবে। গুজরাটে বিজেপি জিতলেও কেন্দ্রে হেরে যায়। তখন থেকেই কেন্দ্রের পোস্টার গার্ল হয়ে ওঠেন তিস্তা।

প্র: ওকে থামানোর জন্য আপনার কিছু করতে পারতেন না?

উ: আমরা কী করে করব? আমাদের ইচ্ছে ছিল, কিন্তু তাহলে আদালতগুলো আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ত।

প্র: মুখ্যমন্ত্রী কি (তিস্তার ব্যাপারে) নিজের দুশ্চিন্তার কথা আপনাকে জানিয়েছিলেন?

উ: হ্যাঁ, জানিয়েছিলেন।

প্র: কিন্তু দাঙ্গার দরুনই তো মোদি, এখনকার মোদি হয়ে উঠতে পেরেছেন, তাই না?

উ: তা ঠিক। দাঙ্গার আগে কে চিনত তাকে? কে মোদি? দিল্লি থেকে এসেছিলেন, তাঁর আগে ছিলেন হিমাচলে। বিভিন্ন গুরুত্বহীন রাজ্যের দায়িত্ব দেওয়া হত তাকে, হরিয়ানা বা হিমাচলের দায়িত্ব পেতেন না।

প্র: এটাকে তুরুপের তাস বলা যায়, না?

উ: সেই রকমই.... দাঙ্গা না হলে উনি আন্তর্জাতিক পরিচিতি পেতেন না। দাঙ্গা একটা ধাক্কা দিল। নেতিবাচাক ধাক্কা, কিন্তু তাঁর জোরে উনি অন্তত পরিচিতি পেয়ে গেলেন।

প্র: তাহলে, আপনি কি মোদির লোক?

উ: তা বলা যায়, কেননা ২০০২ এর দাঙ্গার সময় আমি তাঁর সঙ্গেই ছিলাম, কাজেই আমাকে তাঁর লোক বলতেই পারেন।

দু'মাস ধরে বিভিন্ন কথোপকথনে নানান যন্ত্রপাতির সাহায্যে উদ্ধৃত এইসব কথা রেকর্ড করা হয়েছিল। নিজেকে মোদির প্রিয়জন মনে করেন পান্ডে এবং মোদির সঙ্গে নিজের নৈকট্যের কথা বলতে তিনি দ্বিধা করেননি। আমাকে তিনি খোলাখুলিই বলেছেন মোদি কোন সাধু নন বলেই নিজের মতাদর্শের বিরোধী লোকেদের পোস্টিং দেন না তিনি। কওসর বাই এর হত্যাকে তিনি এই বলে ন্যায্য প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেছেন যে, সে সোহরাব উদ্দিনের সঙ্গে 'থাকছিল'। সোহরাব উদ্দিনকে যে সাজানো বন্দুকযুদ্ধে হত্যা করা হয়েছিল তা ইতিমধ্যেই প্রমাণ করে দিয়েছে সিবিআই।

কথাবর্তার সময় যখনই কোনো অ্যাকটিভিস্টের প্রসঙ্গ এসেছে, তখনই তিনি নির্দ্বিধায় তাদের গুজরাটের দুর্নাম রটনাকারী বদমাশ বলেছেন। শেষের দিকে যখন তিনি বলেন আমার একবার পরিমল গার্ডেন থেকে ঘুরে আসা উচিত। দাঙ্গার পর গুজরাটিরা নিজেদের কতটা ভারমুক্ত মনে করছে, তখন খুব একটা অবাক হইনি আমি।

পান্ডের হীরা ব্যবসায়ী পুত্র নেপাল থেকে ফিরলে তাঁর সঙ্গে সুরাতে আমাকে দেখা করতে বলেছিলেন। দিল্লিতে অমিত শাহের সঙ্গে দেখা করার দিনক্ষণ ঠিক করতেও আমাকে সাহায্য করেছিলেন তিনি। সাজানো বন্দুকযুদ্ধের মামলায় জামিন পাওয়ার পর আদালতের নির্দেশে অমিত শাহের তখন গুজরাটে ঢোকা নিষিদ্ধ ছিল। থিরুর সঙ্গে তিনি কথা বলেন এবং গুজরাটের উন্নয়ন বিষয়ক সমস্ত তথ্য ও রাজ্যে বিনিয়োগ আনার জন্য মুখ্যমন্ত্রী যা যা করেছেন তাঁর তথ্য আমাকে দিয়ে সাহায্য করার অনুরোধ জানান। বিভিন্ন কমিশন পান্ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে। সাজানো বন্দুকযুদ্ধের মামলায় সিবিআই তাকে অভিযুক্ত করেছে। এহসান জাফরির স্ত্রী সুপ্রিম কোর্টে অভিযোগ জানিয়েছেন তাঁর স্বামী ও অন্যান্য মুসলিমদের রক্ষা করার ব্যাপারে পান্ডের নিষ্ক্রিয়তার জন্য। কিন্তু কোনো

কিছুকেই পাত্তা দেননি পান্ডে। সম্পূর্ণ নিরুদ্বিগ্নভাবে তিনি আমাকে বলেছিলেন যে কেউই তাকে ছুঁতে পারবে না।

আমার উদ্বেগ বেড়ে যায় পান্ডের সঙ্গে কথোপকথন যখন শেষের দিকে। কিছুদিনের জন্য এই শহরের বাইরে যেতে চাইছিলাম। দাঙ্গার সময় গুজরাটের ডিজি চক্রবর্তীর সাক্ষাৎ নেওয়ার পরিকল্পনা করায় চিন্তাটা বাস্তবায়িত হল, কারণ চক্রবর্তী মুম্বাইতে থাকতেন। মুম্বাইয়ের খার এলাকার বাসিন্দা ছিলেন চক্রবর্তী। পানি আমার সঙ্গে মুম্বাই যেতে চাইছিল। মাইক আবার দিল্লি গেছে। আমার একজন সহকারী দরকার, তাই পরের বিমানেই মুম্বাই চলে গেলাম আমি আর পানি। সঙ্গে একটা শাড়ি নিয়েছে পানি, ওর অফিসের এক সহকর্মী শাড়িটা দিয়েছিল ওকে। আসলে আমার এক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধুর বিয়ে আছে এবং সেই বিয়ের উৎসবে পানিকে নিমন্ত্রণ করেছি আমি, সেই জন্যই শাড়িটা সঙ্গে নিয়েছে ও। কাজ শেষ হয়ে গেলে ভারতীয় সংস্কৃতির কিছু নমুনা দেখানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম পানিকে।

নবম পরিচ্ছেদ

চক্রবর্তী

আশোক নারায়ণকে চক্রবর্তীর নামে আমার জন্য একটা সুপারিশ লিখে দিতে বলেছিলাম আমি। সংবাদমাধ্যম ও গুজরাটে নিজের সহকর্মীদের থেকে কিছুটা দূরে নিভৃতে বাস করছিলেন তিনি। সংবাদমাধ্যম, আন্তর্জাতিক প্রেস ও বিভিন্ন কমিশন তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, কারণ গুজরাটের দাঙ্গার সময় তিনি ছিলেন ডিরেক্টর জেনারেল অব পুলিশ। মুম্বাইয়ে খারের অভিজাত এলাকায় স্ত্রী ও দুই কন্যাকে নিয়ে মোটামুটি শান্তিতে বসবাস করছিলেন তিনি।

চক্রবর্তীর সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার সময় পানিকে আমাদের বাড়িতে রেখে গিয়েছিলাম। বাড়ির লোকেরা আমাকে মৈথিলীর বদলে নিম্বি বলে ডাকায় কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গিয়েছিল পানি। ওকে বলি এটা আমার ডাকনাম। কিন্তু পানি যখনই আমাকে মৈথিলী বলে উল্লেখ করত, আম্মা খুব বিরক্ত হতেন। একদিন রান্নাঘরে গিয়ে আমার আর পানির জন্য সকালের নাস্তা বানানোর চেষ্টা করছি, এমন সময় রাগত সুরে মা বলে উঠলেন, 'অফিসে সেসব অভিনয় টভিনয় করিস, সেসব বাড়িতে নিয়ে আসিস কেন? এটা একটা বাড়ি, কোনো থিয়েটার না। আসলে আমি যে বিপদের মুখে দাঁড়িয়ে কাজ করছি সেটাই তাঁকে আতঙ্কিত করে তুলেছিল। আমার জন্য ভয়ার্ত হয়ে উঠেছিলেন মা। একদিন দেখলাম নিজের ঘরে মা কাঁদছেন। আমার একটা কুর্তা মুঠোয় ধরে আছেন। 'ওরা যখন খুশি তোকে মেরে ফেলতে পারে, সোনা। আমি স্বপ্নে দেখি একটা ট্রাক তোকে চাপা দিচ্ছে কিংবা ওই যে নিরালা বাড়িতে থাকিস সেখানকার সাপটা তোকে ছোবল মারছে।' মাকে জড়িয়ে ধরে বললাম আমার কোনো বিপদ হবে না। মা ফোঁপাতে লাগলেন।

বান্দ্রায় গেলাম একটা এসি বাসে করে, সেখান থেকে অটো ধরে খার। এখানেই একটা নাম করা স্কুলের পাশে থাকেন চক্রবর্তী। একই বাড়িতে

একজন ডাক্তারও থাকেন। এজন্য স্থানীয় লোকেদের কাছে বিখ্যাত হয়ে গেছে বাড়িটা। চক্রবর্তী নিজেই আমাকে বাড়ির ভিতরে নিয়ে গিয়ে তাঁর সুন্দরী স্ত্রীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। তাঁর স্ত্রী এক রাজপরিবারের মেয়ে। বসার ঘরে আলো খুব কম দেখে দুশ্চিন্তায় পড়লাম। এত কম আলোয় ছবি উঠবে কীভাবে? টিউবলাইটগুলো যদি জ্বেলে দিতে বলি, তাঁর জন্য কী অজুহাত দেব?

চক্রবর্তী আমার আমেরিকার জীবন সম্বন্ধে জানতে চাইলেন। তাঁর স্ত্রী বললেন তাদের মেয়ে একজন উঠতি অভিনেত্রী, সে আমেরিকায় আছে। তাঁর অভিনেত্রী মেয়ের সঙ্গে আমাকে যোগাযোগ রাখতে বললেন, তাঁর ধারণা আমরা দু'জন ভালো বন্ধু হতে পারব। আমি মিসেস চক্রবর্তীর সঙ্গে গল্প করার সময় তাদের অন্য মেয়েটি বাড়ি ফিরল। এই ছোট মেয়েটি একটা নামী বিমান সংস্থায় স্টুয়ার্ডেসের কাজ করে। বিমানযাত্রার সময় বিখ্যাত লোকেরা কেমন অমার্জিত আচরণ করে, তা নিয়ে গল্প করল সে। এক মাসে মোট তিনবার চক্রবর্তীর সঙ্গে দেখা করেছিলাম। প্রথমবারের দেখাটা ছিল খুব অল্প সময়ের। কচ্ছে আমার শুটিং, সেখানকার মৃৎশিল্পীদের সঙ্গে দেখা করা, গুজরাটের বিখ্যাত উত্তরায়ণ উৎসব দেখা কেবলমাত্র এইসব নিয়েই কথা বলেছিলাম। মিসেস চক্রবর্তীকে বললাম আশোক নারায়ণের বাড়িতে একদিন লাঞ্চে উনার স্ত্রী এবং মিসেস চক্রবর্তীর বান্ধবী কী চমৎকার তন্দুরি পনির খাইয়েছিলেন আমাকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই খুব স্বচ্ছন্দ হয়ে পড়লেন মিসেস চক্রবর্তী, তাঁর শাড়ির সংগ্রহ এবং পারিবারিক ছবির অ্যালবাম দেখালেন আমাকে।

পরের সপ্তাহে আবার আসব কথা দিয়ে বিদায় নিলাম। গেলামও। এবার মিসেস চক্রবর্তীর জন্য এক বাক্স পিঠে নিয়ে গিয়েছিলাম। উনি আমাকে কফির সঙ্গে নানারকম স্ন্যাকস খেতে দিলেন। কিন্তু চক্রবর্তী খুব কম কথার মানুষ। নিজের একটা জগৎ গড়ে নিয়েছেন তিনি, যে জগতে অল্প কিছু অতিথি আর বন্ধুরাই শুধু আসে, বেশিরভাগই তাঁর পেশাদার জীবনের পরিচিত ব্যক্তি। তাঁর স্ত্রী বলছিলেন যে ক'বার তাঁরা আহমেদাবাদে গেছেন, মনে হয়েছে এ কোথায় এসে পড়লেন। তাঁর স্বামী এত

ন্যায়পরায়ণ মানুষ হওয়া সত্ত্বেও তাঁর সঙ্গে বহিরাগতের মতো ব্যবহার করত অন্যরা।

তাঁর কথা বলতে অতি উৎসাহী স্ত্রীর সঙ্গে বকবক করার সময়েও আমি জানতাম কীভাবে চক্রবর্তীর মৌনতা ভাঙ্গা যাবে। কথার ফাঁকে ফাঁকে গুঁজে দিতাম গুজরাটের যাদের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে, সেইসব অফিসারদের নাম, যেসব গুজব শুনেছি সেগুলোও শুনিয়ে দিতাম। সবটাই করতাম চূড়ান্ত অজ্ঞতা আর বিস্ময়ের ভান করে। তাতেই বরফ গললো।

চক্রবর্তীর সঙ্গে আমার কথোকপথন লেখার আগে, ২০০২ সালে গুজরাটের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হওয়ায় মূলধারার সংবাদমাধ্যম তাকে অযোগ্য ডিজি হিসেবে চিহ্নিত করার পর গুজরাটভিত্তিক বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত কিছু খবর জানিয়ে রাখা দরকার। আমি যখন তাঁর সঙ্গে দেখা করি সেই সময়ই তাকে নিয়ে কিছু খবর প্রকাশিত হচ্ছিল। এইসব খবর প্রকাশিত হওয়ার কারণ হল, ২০০২ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি নরেন্দ্র মোদির ডাকা মিটিংয়ে সঞ্জীব ভাট উপস্থিত ছিলেন বলে নানান সংবাদপত্রে যে খবর বেরিয়েছিল, চক্রবর্তী তা অস্বীকার করেছিলেন। তবে একজন কনস্টেবলসহ অধিকাংশ স্বাক্ষীই পরে সঞ্জীব ভাটের বক্তব্য সমর্থন করে বলেন যে তিনি তাদের সত্য গোপন করতে বাধ্য করেছিলেন। সঞ্জীব ভাটের বক্তব্যের অবশ্য বিশেষ গুরুত্ব ছিল না। তবে ওই একই বছরে সিট এর তদন্তকারী অফিসার এ. কে. মালহোত্রা সুস্পষ্টভাবে জানান যে সেই মিটিংয়ে আটজন উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মোদি, অস্থায়ী চিফ সেক্রেটারি চন্দ্রকান্ত ভার্মা, এডিশনাল চিফ সেক্রেটারি (হোম) আশোক নারায়ণ, ডিজিপি কে. চক্রবর্তী, আহমেদাবাদের পুলিশ কমিশনার পি.সি. পান্ডে, সেক্রেটারি (হোম) কে. নিত্যানন্দম, মুখ্যমন্ত্রীর প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি পি. কে. মিশ্র এবং মুখ্যমন্ত্রীর সেক্রেটারি অনিল মুকিম।

গুজরাট দাঙ্গা, নরেন্দ্র মোদি ও অমিত শাহের অধীনস্থ গুজরাট সংক্রান্ত তদন্তের ক্ষেত্রে চক্রবর্তী সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ একজন ব্যক্তি। কেবলমাত্র ২০০২ সালের দাঙ্গার সময়েই নয়, অন্যান্য বিভিন্ন অপরাধের তদন্তের ক্ষেত্রেও তিনি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ২০০২ সালের মার্চ মাসে *টাইমস অফ*

ইন্ডিয়া'র একটি প্রতিবেদনে বলা হয়, পুলিশ দপ্তরে বিভিন্ন বদলির ব্যাপারে গুজরাট সরকারের প্রতি তোপ দেগেছেন ডিজিপি চক্রবর্তী।'[১৭]

যখন দ্বিতীয়বারের মতো চক্রবর্তীর বাড়িতে গেলাম, তখন আমার গোপন ক্যামেরার সামনে প্রথম মুখ খোলেন তিনি। শোনা যাচ্ছিল তিনি তাঁর অফিসারদের পক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন, কিন্তু কোনো বক্তব্যেরই প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছিল না। আসলে সংবাদমাধ্যম এবং নিজের সহকর্মীদের কাছে কিছু বলতে অস্বীকার করেছিলেন তিনি। অন্যান্য কর্মকর্তাদের সঙ্গে কী কথাবার্তা হয়েছে আমার তা বলতে শুরু করার পর অবশেষে মুখ খোলেন চক্রবর্তী। কারণ সম্ভবত তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, আমি ইতিমধ্যেই অফ দ্য রেকর্ড কথাবার্তায় অনেক কিছু জেনে ফেলেছি। শেষ পর্যন্ত গুজরাট দাঙ্গা প্রসঙ্গে তাকে কথা বলাতে সক্ষম হলাম।

এরচেয়ে খারাপ আর কিছু হতে পারে না। দাঙ্গা হওয়ার কোনো যুক্তিসম্মত ভিত্তিই ছিল না। গোধরায় ট্রেনে আগুন লাগানোর পরই দাঙ্গা শুরু হল। ভিএইচপির যেসব লোকেরা অযোধ্যায় গিয়েছিল, তাঁরাই যে ওই কামরায় ছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। পুরো ট্রেনটাই ওদের লোকজনে ভর্তি ছিল। কাজেই ওখানে যা ঘটল তারপর দাঙ্গা বেধে গেল। (আমি) বলতে চাইছি, সাধারণ কোথাও দাঙ্গা বাধলে তাঁর একটা কারণ থাকে এবং সেই কারণটা বেশিরভাগ সময়েই স্থানীয় কারণ হয়ে থাকে। এখানে এমন একটা কারণ ছিল যা গোটা হিন্দু সমাজকেই যেন বিপন্ন করে তুলেছিল। 'দাঙ্গায় কারা যোগ দেয়? গরিব লোকেরা.... এখানে সব বড়লোকেরা রাস্তায় নেমে পড়েছিল। অনেকে ফোন করে বলত, 'স্যার, মার্সিডিজ নিয়ে এসে আমার দোকানে লুট করছে'

'ইতিহাস সুদূর অতীতকাল থেকেই হিন্দুদের শিখিয়েছে যে গজনি আর বাবর ভারত আক্রমণ করেন, সোমনাথে লুঠতরাজ চালান। ফলে এটা এখানকার হিন্দুদের মজ্জায় মিশে গেছে। আর ভারতে ১৯৬৫ সাল থেকেই দাঙ্গা হয়ে আসছে। আগেও হাজার হাজার মানুষ মারা গেছে।

প্র: আমার ধারণা উনি (মোদি) যে আরএসএসের লোক ছিলেন এবং দাঙ্গার সময় আরএসএস আর ভিএইচপি কে সমর্থন করেছিলেন, এটাই বোধহয় উনার বিরুদ্ধে চলে গেছে, তাইনা?

উ: এই বাধ্যবাধকতাটা অবশ্যম্ভাবী ছিল। যে মানুষটি আরএসএস ক্যাডার হিসেবেই বেড়ে উঠেছিল, তাকে তো তাদের দাবির কাছে নত হতেই হবে।

প্র: আমিও শুনেছি দাঙ্গার সময় আরএসএসের কাছে নতি স্বীকার করেছিলেন উনি।

উ: উনার অবস্থায় দাঁড়িয়ে অন্য কিছু করতে পারতেনও না উনি, বিশেষত যে সংগঠন উনাকে গড়ে তুলেছে তাঁরাই যেখানে জড়িত। আর কেউ যদি ক্ষমতালোভী মন্ত্রী হয়, তাহলে তাঁর পক্ষে কথাটা আরও বেশি করে সত্যি হয়ে ওঠে।

প্র: উনি কি খুবই ক্ষমতালোভী?

উ: হ্যাঁ। *তেহেলকা*'কে পুরো সম্মান জানিয়েই কথাটা বলছি।

প্র: সেটা কী?

উ: ওটা একটা পত্রিকা, তরুণ তেজপাল ওটা প্রকাশ করেন। আপনি নিশ্চয়ই পত্রিকাটার নাম শুনে থাকবেন। ওই পত্রিকায় বলা হয়েছে দাঙ্গার সময়কার সব অফিসারকেই পুরস্কৃত করা হয়েছে। ব্যক্তিগত কথা বাদ দিলেও বলা যায়, আমি কী পেলাম? সে ঠিক আছে, কিন্তু সবাইকে একই মানদণ্ডে মাপা যায় না, (সেটা) একটা কুসংস্কার।

প্র: যেসব লোক আপনার সঙ্গে কাজ করেছে তাঁরা অনেকেই দেখল নিজেরা বিতর্কে জড়িয়ে পড়েছি, সেই জন্যই কি আপনিও তোপের মুখে পড়লেন?

উ: কিন্তু সেরকম হলে তো এ ব্যাপারে তেমন কিছু করাই থাকে না।

প্র: কিন্তু আপনি যে ধরনের মানুষ, তাতে গুজরাটের ডিজিপি হিসেবে টিকে থাকা নিশ্চয়ই খুব কঠিন ছিল?

উ: আমার মনোভাব ছিল আমার ক্ষমতায় যতটুকু কুলোয় সবটুকু করব। যতজন মুসলিমকে সাহায্য করা সম্ভব, আমি করেছি। বহু মানুষ প্রাণে বেঁচে গিয়েছিল। শুধু এহসান জাফরিকে বাঁচানো গেল না বলে...

প্র: এহসান জাফির কে?

উ: উনি একজন প্রাক্তন মুসলিম সাংসদ ছিলেন। ওকে বাঁচানো যায়নি। উন্মত্ত জনতা তাকে খুন করে তাঁর বাড়ি জ্বালিয়ে দেয়।

পুরো মহল্লাটা জুড়ে আক্রমণ চালানো হয়েছিল। পুলিশ সময়মতো পৌঁছাতে পারেনি।

প্র: আপনি ডিজি ছিলেন বলেই কি তোপের মুখে পড়লেন?

উ: দেখুন, আমার অধীনে বহু লোক কাজ করত.... পুরো একটা স্তরবিন্যাস আছে। আহমেদাবাদের কমিশনার, তাঁর আইজি, তারপর তাঁর জুনিয়র। আমি কমিশনারকে নির্দেশ দিয়েছিলাম, ব্যাপারটা দেখতে বলেছিলাম তাকে। কমিশনার জানালেন তিনি তাঁর অফিসারদের বলেছেন, কিন্তু তাঁরা যাওয়ার আগেই উনি (এহসান জাফরি) খুন হয়ে যান, যা ক্ষতি হওয়ার হয়ে যায়। নানাবতী বিচারবিভাগীয় তদন্ত কমিশন (ব্যাপারটা) দেখছে। সুপ্রিম কোর্টেও বিষযটা বিচারের জন্য নিয়েছে।

প্র: আমিও ঠিক সেটাই বলছি। অন্যদের অপরাধের জন্য আপনি ভুগছেন আর ওরা এখন রাজ্যের কাছ থেকে পুরস্কার পাচ্ছে?

উ: এটাই তো হওয়ার ছিল। সেইজন্যই তো বলছি মিডিয়া পক্ষপাতিত্ব করেছে, ওরা কখনোই ঘটনার দুটো দিক সম্পর্কে জানতে চায়নি।

প্র: দাঙ্গার সময় আপনি যে অবস্থান নিয়েছিলেন, তাঁর জন্য আপনি কখনোই ওদের প্রিয়পাত্র ছিলেন না?

উ: আমার তো তাই মনে হয়। আমি কখনো ওরকম হইনি। যা করেছি তাই বলতে চেয়েছি সবসময়। সেটা অর্থহীন আওয়াজ ছিল না।

প্র: দাঙ্গার সময়েও কি আপনি নিজের অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন?

উ: হ্যাঁ, কয়েকটা বিষয় নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলাম, কিন্তু আমাদের এর-ওর-তাঁর হাজারো স্তরবিন্যাস পেরিয়ে কিছু করা মুশকিল।

প্র: সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ করার উপায় ছিল না?

উ: দেখুন, একটা ব্যাপার আছে। সরকারকে হুকুম দেওয়া যায় না। কাজের একটা পদ্ধতি আছে, একটা ব্যবস্থা আছে। একটা সময়ের পর আর তেমন কিছু করার থাকে না। আপনি কিছু বিষয় সরকারের নজরে আনলেন, সরকার কিছুই করল না। তারপর আপনি আর কী করতে পারেন?

প্র: আপনি যা যা বললেন তা বিচার করে দেখা হল না বলে আপনি কি হতাশ হয়ে পড়েছিলেন?

উ: তা হয়েছিলাম, তবে এটা তো এই ব্যবস্থার অঙ্গ।[১৮]

প্র: কিন্তু এ নিয়ে তো আপনার কিছু লেখা কিংবা বলা উচিত ছিল। দাঙ্গার সময়ে ঠিক কী ঘটেছিল!

উ: আমার মেয়েরা বলেছিল....

প্র: দাঙ্গার বিষয়ে গঠিত তদন্ত কমিশনগুলোর ব্যাপারটা কী?

উ: একটা ছিল ব্যানার্জি কমিটির রিপোর্ট। তাতে বলা হয় একটা চক্রান্ত হয়েছিল, কিন্তু তাঁর সঙ্গে বিচারবিভাগীয় প্রক্রিয়ার কোনো সম্পর্ক ছিল না বলে ওটার কোনো গুরুত্ব নেই, কারণ কোনো স্বাক্ষীকেই জেরা করা হয়নি। তারপর ছিল সুপ্রিম কোর্ট নিযুক্ত সিট, যার কাজ ছিল ব্যক্তিগত ঘটনাগুলোর তদন্ত করা। তারপর রাজ্য সরকার কর্তৃক গঠিত নানাবতী কমিশন।

প্র: সকলেই আপনাকে জেরা করেছিল?

উ: হ্যাঁ।

প্র: এগুলোর মধ্যে কোনটা বেশি কার্যকরী ছিল?

উ: ওদের পক্ষে নানাবতীই[১৭] (কমিশন) বেশি কার্যকরী। নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন আমি কী বলতে চাইছি?

প্র: মানে সরকারের পক্ষে?

উ: ঠিক ধরেছেন। ওদের লোকেরা, প্রসিকিউশন, আসামি পক্ষের মুসলিম আইনজীবীরা। মিডিয়ার কাছে আমি কিছু বলব না। যা বলার উপযুক্ত কমিশনের কাছেই বলব।

প্র: এবং সুপ্রিম কোর্ট নিযুক্ত কমিশনকে নিরপেক্ষ হতে হবে?

উ: আসলে এহসান জাফরির বিধবা স্ত্রীই অভিযোগ জানিয়েছিলেন।

প্র: আপনাদের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীও তো গ্রেপ্তার হয়েছিলেন? আপনি কি ওর অধীনে কাজ করেছেন?

উ: করেছি। ওর সঙ্গে আমার সাপে-নেউলে সম্পর্ক ছিল।

প্র: দাঙ্গার সময়ে?

উ: না, দাঙ্গার পরে। অক্ষরধামের ঘটনার পর উনি আসেন।

প্র: কোনো দুর্নীতিপরায়ন লোকের (অধীনে) কাজ করতে আপনি রাজি ছিলেন না?

উ: শুধু দুর্নীতিই নয়, মানসিকতাও একটা বড় ব্যাপার। উনি গ্রেপ্তার হলেন। (ফোনের) কল রেকর্ড থেকে উনার বিরুদ্ধে প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল।

প্র: উনার অধীনে কাজ করার সময় আপনি কোন পদে ছিলেন?

উ: ডিজি।

প্র: আপনি রেহাই পেয়ে গেলেন?

উ: না না, উনি আমাকে প্রচুর জ্বালাতন করেছেন।

প্র: দাঙ্গার সময় আপনি কি এক জায়গায় আটকে থাকার আতঙ্কে ভুগতেন? আপনি কি লড়াই করেছিলেন?

উ: হ্যাঁ, লড়েছি। ভেতর থেকে লড়ার জন্যও অন্য ধরনের কিছু দরকার হয়। হয় সাহসী হতে হয়, নয়তো মানুষের এবং সংবাদমাধ্যমের কাছে যেতে হয়। *টাইমস্ অফ ইন্ডিয়া* বলেছিল, মি. চক্রবর্তীর বিবেক বলে কিছু থাকলে তিনি পদত্যাগ করতেন। কেন আমি পদত্যাগ করব? আমি কি অপরাধী? আমি কি দাঙ্গাবাজদের প্রশ্রয় দিয়েছি? বরং আমি সর্বশক্তি দিয়ে লোকেদের বাঁচাতে চেষ্টা করেছি। আমি আরও ভেবেছিলাম আমার জায়গায় যিনি আসবেন তিনি হয়তো ওদের সাহায্য করতে পারেন।[২০]

প্র: আপনি না থাকলে তেমনটা হতেও পারত?

উ: হ্যাঁ।

প্র: বনধ ডাকা না হলে কি সুবিধে হত?

উ: অবশ্যই হত। ভিএইচপি বনধ ডেকেছিল।

প্র: ওরাই তো সবকিছুর কেন্দ্র ছিল।

উ: ভিএইচপি হচ্ছে শাসকদল বিজেপি-র একটা শাখা।

প্র: উনি কি কিছু না করার নির্দেশ দিয়েছিলেন?

উ: ওরা আমাকে কোনো বেআইনি নির্দেশ দিত না। উনি নিশ্চয়ই নিজের মৃত্যু পরোয়ানায় সই করতেন না।

প্র: নির্দেশ তো প্রচ্ছন্নভাবেও দেওয়া যায়?

উ: সেটা আলাদা করে একজনকে মুখোমুখি দিতে হয়, ২০ জনের সামনে সেটা দেওয়া যায় না, যাদের মধ্যে ৫ জন হয়তো আপনার বিরুদ্ধে।[২১]

প্র: তাহলে যে বইটা আপনি লিখতে চাইছেন সেটা বেরোলে কি আমলাতন্ত্র আর পুলিশ বাহিনীর মধ্যে তুলকালাম লেগে যাবে?

উ: আমি কারো নাম উল্লেখ না করে শুধু ঘটনার কথা উল্লেখ করলে তেমনটা হবে না।

প্র: ওইসব ঘটনার পর থেকে আপনি কি কিছুটা একঘরে হয়ে পড়েছেন?

উ: আমার একজন বন্ধু আছে আশোক নারায়ণ নামে, তাঁর সঙ্গে আমার মতে মেলে। চিফ সেক্রেটারি সুব্বারাও আমার বন্ধু, তবে

পুরোপুরি নয়, কেননা ও যা করেছে তাঁর সঙ্গে আমি একমত নই।

প্র: আচ্ছা, ওই ভাটের ব্যাপারটা কী, যার কথা সেদিন বলছিলেন? যে ওয়েবসাইটের কথা আপনি বলছিলেন, তাতে ওর সাক্ষ্য আছে? এটা কি সত্যি?

উ: উনি এসপি স্তরের অফিসার ছিলেন, সেই অর্থে কথাটা সত্যি নয়। ইন্টেলিজেন্স বিভাগের এসপি। মি. রাইগার ছিলেন এডিশনাল ডিজি, সেই গুরুত্বপূর্ণ দিনে তিনি অনুপস্থিত ছিলেন। সম্ভবত সেইজন্যই উনি মনে করেছিলেন উনার যাওয়া উচিত। কিন্তু মিটিংটা ছিল বিভিন্ন বিভাগের প্রধানদের নিয়ে, কাজেই উনি এর অংশীদার ছিলেন না। আমি সত্যি কথা বলছি কিনা সেটা আশোক নারায়ণকে জিজ্ঞেস করলেই জানতে পারবেন।

প্র: দাফনালায় আপনার কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়েছে আমার। কয়েকজন অফিসার, পিসি, পিপি...

উ: হ্যাঁ, ওরা সবাই ওখানেই থাকে। কুলদীপ শর্মাও ওখানে থাকে।

প্র: ও হ্যাঁ, পি.সি. পান্ডে আমাকে ওর সঙ্গে দেখা করতে বলেছিলেন। উনি (শর্মা) তো এখন শিপ অ্যান্ড উল বিভাগে আছেন।

উ: কুলদীপ চমৎকার ছেলে। ও সরকারের সমালোচনা করায় ওকে সরিয়ে দিয়েছে। আগে ও এমন হাবভাব দেখাত যেন কার্যত ওই মুখ্যমন্ত্রী। এটুকু ছাড়া ও খুব ভালো অফিসার। আজ ওরই ডিজি হওয়ার কথা, কিন্তু (ওদের) বিরুদ্ধে কথা বলার কারণে ওকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। ওরা আদালতে গেল না। সরকার এত বুদ্ধিমান যে ওকে একটা সাইড পোস্টিং দিয়ে দিল। ওই মোদি অত্যন্ত বুদ্ধিমান লোক।[২২]

প্র: আচ্ছা, ওই সুব্বারাওকে কেউ পছন্দ করে না কেন? নারায়ণের স্ত্রী বলছিলেন উনি নাকি সরকারের ঢোল বাজিয়ে বেড়ান।

উ: উনি হচ্ছেন চিফ সেক্রেটারি। উনাকে সরকার পুরস্কার দিয়েছে, কাজেই ভালো ভালো কথা বলতে উনি বাধ্য।

প্র: তাঁর মানে দাঙ্গার সময় সরকারের খুবই ঘনিষ্ঠ ছিলেন সুব্বারাও?

উ: হ্যাঁ হ্যাঁ, একদম, বসের খুবই ঘনিষ্ঠ ছিলেন।

চক্রবর্তী এখানে গুজরাটের চিফ সেক্রেটারি সুব্বারাও এর কথা বলেছেন। যতজনের সঙ্গে আমি দেখা করেছি তাঁরা প্রত্যেকেই বলেছেন গুজরাটের দাঙ্গার সময় সুব্বারাও ছিলেন মুখ্যমন্ত্রীর নিজের লোক। একটি সংবাদপত্রের প্রতিবেদনে লেখা হয়েছিল, সুব্বারাও হচ্ছেন 'প্রাক্তন চিফ সেক্রেটারি যিনি ২০০৩ সালে অবসর নেন, তাকে গুজরাট এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন (জিইআরসি) এর চেয়ারম্যান পদে বসিয়ে পুরস্কৃত করা হয়। এই পদে সাধারণত গুজরাটের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিদেরই বসানো হয়ে থাকে। বিশ্লেষকদের ধারণা কেন এই পুরস্কার তিনি পেয়েছেন তা তাঁরা জানেন।'

প্র: আচ্ছা, যারা সরকারের পক্ষে দাড়িয়েছিলেন তাদের মধ্যে আপনার নামও তো ছিল?

উ: হ্যাঁ, ওই পত্রিকায় (*তেহেলকা*) বলা হয়েছিল আমি নাকি নানান সুযোগসুবিধা পেয়েছি। কী পুরস্কার পেয়েছি আমি? অন্য সবাই পেয়েছে - চিফ সেক্রেটারি, হোম সেক্রেটারি, পুলিশ কমিশনার। আসলে কেউ বস্তুনিষ্ঠ হতে চেষ্টা করলে এমনটা হতে পারে না।

প্র: কিন্তু ওই সঞ্জীব ভাট, উনিও তো আপনার নাম বলেছেন?

উ: হ্যাঁ, শ্রীকুমারের সঙ্গেও আপনার দেখা করা উচিত। আপনি কি আমার অফিসে মন্ত্রীর আসার কথা বলছেন? ওই মন্ত্রী খুব অল্পক্ষণ আমার অফিসে ছিলেন, তাঁর নাম আই. কে. জাদেজা, আমার ওপর প্রচণ্ড রেগে ছিলেন। উনি বললেন, আপনার সময় নেই আমার সাথে কথা বলার জন্য। আমি চাইছিলাম না উনি আমার ঘরে থাকুন। তাই আমার লোককে বললাম ওকে অন্য ঘরে বসাতে। আমি আমার কন্ট্রোলের কাজ নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম। ওই সঞ্জীব নিশ্চয়ই তখনই মন্ত্রীকে অন্য ঘরে দেখেছিলেন। কাজেই ওর হস্তপেক্ষপের কোনো প্রশ্নই ছিল না।

প্র: কিন্তু ভাট ওখানে থেকে থাকলেও আজ আর কেউই সে কথা বলবে না। কে-ই বা ঝামেলায় জড়াতে চায়?

উ: দেখুন, এটাই যদি পরম সত্য হয়, তাহলে আমি শুধু এইটুকু বলতে পারি যে সরকার একটা বিচারবিভাগীয় কমিশন নিযুক্ত করেছিল এবং সেটা মার্চ মাসে বিধানসভায় ঘোষণা করা হয়েছিল। তারপর দাঙ্গা শান্ত হয়ে এল আর এই লোকগুলো বলতে লাগল তাদের কাছে সব তথ্য আছে। তাই যদি থাকে,

তাহলে তাঁরা না করছে না কেন? কিছুদিনের মধ্যেই তো একটা হলফনামা পেশ করতে পারত তাঁরা। ওই শ্রীকুমার সেটা করেছিলেন। গোটা পাঁচেক হলফনামা পেশ করেছিলেন তিনি।

প্র: কিন্তু *তেহেলকা*'র এই প্রবন্ধে বলা হয়েছে যে এই মানুষটি সত্যটা বলতে পারেন।

উ: আমি ওকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। কারণ, মে মাসে মি. রাইগার বদলি হয়ে গেলেন। দাঙ্গা তখনও চলছিল। এই শ্রীকুমারকে এখন ইন্টেলিজেন্স বিভাগের ডিজি হিসেবে নিয়োগ করা হয়। আমি ওকে একটা হলফনামা পেশ করতে বলি। উনি পেশ করেন। নিজের দায়িত্বেই করেছিলেন, আমার বা অন্যদের ব্যাপারে একটা কথাও ছিল না। মাস দুয়েক পরে উনি একটা হলফনামা পেশ করেন, তাতে উনি জানান মি. চক্রবর্তী হ্যান বলেছেন, ত্যান বলেছেন। তখন আমি একটা উত্তর দিয়ে বলি, মি. শ্রীকুমার কেন হলফনামা পেশ করেননি। উনি যদি এতই রামচন্দ্র কি আউলাদ হন তাহলে তো তখনই কাজটা করা উচিত ছিল ওর। আসলে ওকে টপকে অন্যকে প্রোমোশন দেওয়া হয়েছিল বলেই এসব বলছেন উনি। তারপর আমি মুম্বাইতে চলে আসি।

এই কথাগুলো কখনো বলবেন না। উনি রোজ আমায় ফোন করে বলতেন– স্যার, অনুগ্রহ করে একবার গুজরাটে আসবেন, আমি সরকারের বিরুদ্ধে ক্যাট (CAT) এ একটা কেস করতে চাই। ওকে প্রোমোশন দেওয়া হয়নি বলে কেস করবেন। আমি বলতাম আমার পক্ষে যাওয়া সম্ভব নয়, কারণ আমি মুম্বাইতে আছি। অনেক সময় ওরা (ওর বাড়ির লোকেরা) ফোন করত। উনি বলতেন– স্যার, ক্যাট এর সামনে আপনি শুধু বলবেন যে শ্রীকুমার সত্যি কথা বলছে। তো আমি বললাম, এ কথা আমি কী করে বলব? ২০০২ আর ২০০৫ সাল কোথায় গেল? আজ এসব কথা বলছেন কেন? তাই আমাকে অভিযুক্ত করে আমার বিরুদ্ধে তিনটে হলফনামা লেখেন উনি। ঘরে বসে ডায়েরি লেখন, কোনো সরকারি কেস ডায়েরি না। ওই ভাটও ওর জাতই। সবকিছু যখন ঠিকঠাক ছিল, তখন এইসব লোকেরাই সরকারের পক্ষে ছিল।

প্র: আচ্ছা, জাদেজার মিটিংটাই কি বিতর্কিত মিটিং?

উ: না, সেটা ছিল মুখ্যমন্ত্রীর মিটিং।

প্র: সেই মিটিংয়ে ভাট উপস্থিত ছিলেন?

উ: না। আগেই বলেছি, রাইগার মিটিংয়ে অনুপস্থিত ছিলেন। তখন ভাট নিজেই ঠিক করেন তিনি মিটিংয়ে থাকবেন। কিন্তু আশোক নারায়ণের মনে হয় যেহেতু মিটিংটা শুধু প্রধানদের নিয়ে, অতএব সেখানে ভাটকে থাকতে দেওয়া যায় না। যদি ঘোলা জলে মাছ ধরতে চাও, তাহলে গিয়ে নিজের মুখটা দেখাও। তবে স্বর্ণকান্ত ভার্মার কিন্তু মিটিংয়ে আসার ন্যায্য অধিকার ছিল।

প্র: তার মানে প্রত্যেকেই কোন না কোন বিতর্কে জড়িত হয় এনকাউন্টারে, নয়তো দাঙ্গায়।

উ: হ্যাঁ। এমনকী খোদ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যন্ত গ্রেপ্তার হয়ে গেলেন।

প্র: সব অফিসাররাই কি উনাকে অপছন্দ করেন?

উ: হ্যাঁ হ্যাঁ, সবাই উনাকে ঘৃণা করে।

প্র: তাহলে উনার মতো লোক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হলেন কী করে?

উ: রাজনৈতিক যোগাযোগের সূত্রে। অমিত শাহের সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছিল একেবারে সাপে-নেউলে। এসিবিতে থাকার সময় তাঁর বিরুদ্ধে একটা কেস করেছিলেন কুলদীপ।

প্র: আপনার সঙ্গে শাহ কী করেছিলেন?

উ: আমি কখনো কোনো কাগজে সই করতাম না।

প্র: আপনারা সকলে অভিযোগ জানাননি কেন?

উ: তাঁর রাজনৈতিক জোর ছিল খুব বেশি। যতদিন ওরা লিখিত নির্দেশ দিত। একমাত্র ভালো ব্যাপার হল, সব চিঠিতে উনি নিজে সই করতেন, এমনকী পি.এ. কেও করতে দিতেন না। প্রথমে উনি ভাবতেন, এটা বদলাতে হবে কিন্তু পরে নিজেই সব নির্দেশে সই করতেন। এমন সব নির্দেশে সই করতেন যে কাজগুলো জুনিয়র কর্মীদের করার কথা। দেশের ইতিহাসে এমন কাণ্ড এর আগে ঘটেনি।

প্র: কেমন নির্দেশ?

উ: বিভিন্ন কর্মকর্তাকে বদলি করার নির্দেশ। এটা আমার লোক, তাকে এখানে রাখো। তো আমি ওকে বলতাম: স্যার, সরকারী আদেশ পেলেই করব। অমনি পরের দিনই অর্ডার এসে যেত। এভাবেই শাহের ক্রোধের হাত থেকে বেঁচে গিয়েছিলেন আশোক নারায়ণ।

প্র: আর এই মন্ত্রী মায়া কোদনানি?

উ: হ্যাঁ, উনি নারোডা মামলায় জড়িত ছিলেন। ব্যাপারটা এখন সুপ্রিম কোর্টের হাতে।

প্র: কিন্তু তাকে দেখলে তো নিপাট ভালোমানুষ বলেই মনে হয়। উনি কি সত্যিই জড়িত ছিলেন?

উ: হ্যা, ছিলেন। আরএসএসের লোক। বাইরে থেকে দেখে সবাইকে চেনা যায় না।

চক্রবর্তী একজন পরস্পরবিরোধী ব্যক্তিত্ব যার মনে জমে আছে নিজের লোকেদের সম্বন্ধে অনেক তিক্ত সত্য। যেমন তিনি মনে করেন ন্যায়বিচারের জন্য অনেক দেরিতে (শ্রীকুমারের মতো) মুখ খুলেছেন তাঁরা। সত্যিই হয়তো শ্রীকুমার একটু বেশি দেরিতে মুখ খুলেছেন এবং সঞ্জীব ভাটের বক্তব্যের উপযুক্ত ওজন বা বাস্তব প্রমাণ নেই, কিন্তু তাঁর জন্য কি রাজ্যের ডিজি হিসেবে চক্রবর্তী যাবতীয় দায়িত্ব থেকে রেহাই পেয়ে যাবেন? আসলে কোন ডিজি কিংবা পুলিশের অন্য যেকোনো কর্মকর্তার পক্ষে সরকারের উচ্চপদস্থ ও ক্ষমতাশালী লোকেদের সঙ্গে টক্কর দেওয়া খুবই কঠিন। এক্ষত্রে তাদের সামনে ছিলেন অমিত শাহ, যার সম্বন্ধে সিংঘল, রাইগার, আশোক নারায়ণ, প্রিয়দর্শী এবং চক্রবর্তীসহ সকলেই বলেছেন যে, তিনি আইনশৃঙ্খলার কোনো ধার ধারতেন না এবং কর্মকর্তাদের বিভিন্ন বেআইনি নির্দেশ দিতেন। কিন্তু চুপ করে থেকে চক্রবর্তী কি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার অপরাধীদের বিচারের পথ প্রশস্ত করছিলেন?

দশম পরিচ্ছেদ

মায়া কোদনানি ও অন্যান্যরা

আহমেদাবাদে জীবটনাকে উপভোগ করতে শুরু করেছিলাম। অথবা, অজয়ের ভাষায়, একজন খাঁটি আমদাবাদি হয়ে উঠেছিলাম। রাত একটায় আহমেদাবাদের 'আপার ক্রাস্ট' (একটা বিখ্যাত বেকারি) থেকে কীভাবে আপেলের পিঠে জোগাড় করতে হয়, তা শিখে গিয়েছিলাম। হোস্টেলের মেয়েদের সঙ্গে রাত দু'টোর সময় ডিম খাওয়ার জন্য বাইরে বের হতাম। দূর্গাপূজোর প্যাণ্ডেল আর ন'দিন ধরে চলা গরবা'য় নেচে নেচে পানি আর আমার পা লাল করে ফেলতাম।

আমরা দুপুরে খাওয়ার একটা জায়গা আবিষ্কার করেছিলাম। সেখানে দারুণ কাথিয়াবাড় ঘাটিয়া আর লাল মরিচ দিয়ে সাজানো লাঞ্চের নানান চমৎকার পদ পাওয়া যেত। একবার তিন দিনের জন্য নেহরু ফাউন্ডেশনের ঘর ছেড়ে দিতে হয় আমাকে, তখন ছাত্রী হিসেবে এনআইডির হোস্টেলে জায়গা পেয়ে যাই। অন্য একজন ছাত্রীর সঙ্গে এক ঘরে থাকতাম, সে সারা রাত জেগে একেবারে ভোর পর্যন্ত প্রেমিকের সঙ্গে ফোনে কথা বলতো। গোটা ছাত্রজীবনে হোস্টেলে থাকার খুব ইচ্ছে ছিল আমার, জীবনের সেই দিকটা যেন উপভোগ করছিলাম আহমেদাবাদে।

তবে সবই খুশির খবর ছিল না। মাইকের চলে যাওয়ার সময় এসে পড়ল। 'পাকওয়ান'এ গেলাম আমরা। বিদায়ী নৈশভোজ হিসেবে ওর প্রিয় থালি নেওয়া হল। ওর ল্যাপটপে আহমেদাবাদের অসাধারণ কিছু ছবি ছিল। এতদিনে বেশ ভালো হিন্দি বলাও শিখে নিয়েছিল ও। সারা রাত গল্প করে যে যার ঘরে ফিরলাম। সকাল দশটায় দিল্লির বিমান ধরল মাইক। পরের দিন সকালে আমার ঘরের দরজার নীচে একটা ছবি আর একটা ময়ূরের পালক দেখতে পেলাম। ছবিটা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের, তাঁর পিছনে মাইক হিন্দিতে লিখেছে: প্রিয় মৈথিলী, নিজের খেয়াল রেখো। আমরা বন্ধু, আমার সান্তনা, আমার অপরাধের সঙ্গী চলে গেছে আমাকে ছেড়ে। কথা

বলার মতো এমন আর কেউ নেই যে রানা আইয়ুবকে চেনে। শেষ কাজটুকুর জন্য ২০১১ সালে একদিনের জন্য আহমেদাবাদে আসবে মাইক।

আবার আহমেদাবাদ যেতে হয় ২০১৩ সালে, কিছু নথিপত্র পাওয়ার জন্য। মায়া কোদনানি তখন জেলে। আমার স্টিং অপারেশন শেষ, সেটা কবে দিনের আলো দেখবে তাঁর জন্য অপেক্ষা করছি এবং *তেহেলকা*'য় কাজ করে চলেছি। নথিপত্রগুলোর জন্য যে অফিসারের সঙ্গে দেখা করলাম তিনি বললেন মায়াবেনের সঙ্গে জেলে দেখা করেছেন তিনি। আরও বললেন, জেলে মায়াবেনকে ওশোর কিছু বইপত্র পাঠানোর কথা ভাবছেন তিনি। শুনে চমকে উঠলাম। তিনি বললেন, 'উনি খুব কাঁদছিলেন, ছাড়িয়ে আনতে বলছিলেন। প্রায় অপ্রকৃতিস্থ হয়ে পড়েছেন। আধ্যাত্মিকতা হয়তো ওকে সাহায্য করতে পারে।'

স্টিং অপারেশন চালানোর সময় একদিন বিকালে যখন মায়াবেনের বাড়িতে লাঞ্চ খেতে যাই, উনি আমাকে আমড়া খেতে দিয়েছিলেন। আমের মৌশুম তখন শেষ। আমের চাটনি বানিয়ে নিজের ছেলের জন্য রেখে দিয়েছিলেন তিনি। খুব শিগগিরই আমেরিকা থেকে তাঁর ছেলে আসার কথা ছিল। আমাকে জড়িয়ে ধরে উনি বলেছিলেন, 'তুমি খাও, তাহলে মনে হবে আমার ছেলেই খাচ্ছে। মৈথিলী তুমি আমার মেয়ের মতো।' সেদিন বিকালে মায়াবেনের কাছে গীতাসার ব্যাখ্যা করেছিলাম, বলেছিলাম এটা আমার সংস্কৃত শিক্ষক বাবার কাছে শেখা। বিদেশে থাকা মেয়ে যে এখানকার বাসিন্দাদের থেকেও ধর্ম সম্বন্ধে বেশি জানে, তা দেখে খুব খুশি হয়েছিলেন তিনি। 'বুঝলে মৈথিলী, আমরা আমাদের সংস্কৃতি পুরো হারিয়ে ফেলেছি। ওই মুসলিমগুলোর কথা ভাবো। ওদের বাচ্চাগুলো পর্যন্ত একেবারে কট্টর।' ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালাম। লাঞ্চে মাত্র দু'রকম নিরামিষ পদ ছিল: পাঁপড় আর পুরি। মায়াবেন নিজেই রান্না করে পরিবেশন করেছিলেন। সেদিন সন্ধ্যায় আমরা কথা বলা শুরু করি। মুসলিমদের যে উনি ঘৃণা করতেন তাতে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু কথাবার্তার সময় মোদির প্রতি ওর ঘৃণাটা আরও স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছিল।

নিজের অপছন্দের লোকেদের শেষ করার জন্য ওর এবং গোরধন জাদাফিয়ার বিরুদ্ধে মামলাগুলোকে যে নিজের সুবিধামতো ব্যবহার করেছেন মোদি, সেটা বুঝিয়ে দিতে কোনো কার্পণ্য করেননি মায়াবেন।

'এই নতুন প্রজন্ম, এদের কিচ্ছু নেই, কোনো আদর্শ নেই, (চোখের সামনে) কিছু ঘটতে দেখলেও এরা রাস্তায় নামবে না। 'আমাদের ধর্মে কী শেখানো হয় ভাবো: একটা পিঁপড়েকেও আঘাত করো না। একেবারে ছোটবেলা থেকেই আমাদের বাচ্চাদের এসব শেখানো হয়। আর ওইসব লোকেদের ছোটবেলা থেকে শেখানো হয় খুন করো, খুন করলে তবেই বোঝা যাবে যে তুমি একজন মুসলিম। তাদের শেখানো হয় একজনকে মুসলমান বানাও তাহলে জান্নাতে হুর পাবে। মাদ্রাসাগুলোয় এইসবই শেখানো হয়। আরে নিজের ছেলেমেয়েকে অন্তত এটুকু তো শেখাও যে তোমরা ভারতীয়। পাকিস্তান জিতলে তোমরা বাজি ফাটাবে, এটা কিছুতেই মেনে নেওয়া যায় না।

প্র: ২০০২ সালের পর এই লোকগুলো কমে যায়নি?

উ: হ্যাঁ, এখন একটু কম হয়েছে।

প্র: আচ্ছা, আপনি কি প্রায় আট ঘণ্টা আদালতে থাকেন?

উ: আর কী করব? আমার প্র্যাকটিস কমে যাচ্ছে। কিন্তু আদালতে না গিয়েও উপায় নেই, কারণ আরও ৮০ জন আছে। নইলে তিস্তার মতো লোকেরা চ্যাঁচামেচি শুরু করে দেবে।

প্র: আচ্ছা, একটা কথা বলুন। নরেন্দ্র মোদির চারপাশে প্রচুর মোসাহেব আছে, তাই না? মানে সব ভালো কাজের কৃতিত্বই ওকে দেওয়া হয়, তাই না?

উ: ব্যাপারটা এখন ঠিক আছে, ভবিষ্যতে এর ফল খারাপ হবে।

প্র: আপনি কি ওর কাছের মানুষ?

উ: কাছের মানুষ ছিলাম।

প্র: গুজরাটিদের জন্য আপনি যা করেছেন, তাঁর জন্য গুজরাটিরা নিশ্চয়ই আপনাকে ভুলতে পারবে না।

উ: ওরা আমাকে কখনও ভুলবে না। ওরা আমার পাশে আছে।

প্র: ওই অমিত শাহের ব্যাপারটার পর মোদি কী করছেন?

উ: আমি গ্রেপ্তার হওয়া আর জামিন পাওয়ার পর ওর সঙ্গে আর কথা হয়নি আমার। (ওই ঘটনার পর) সম্ভবত দু'জায়গায় দু'বার ওর সঙ্গে দেখা হয়েছিল আমার।

প্র: আপনাকে দেখলে ওর প্রতিক্রিয়া কেমন হয়?

উ: কোনো প্রতিক্রিয়াই দেখান না, কোন কথাও বলেন না। অবশ্য উনি বললেও আমি উত্তর দিতাম না। তবে সেটা আমার সমস্যা, আমিই সমাধান করব। ঈশ্বর আমাকে সাহায্য করবেন। অন্য কারোর থেকে সাহায্য চাইতে যাব কেন? আমি জানি আমি নির্দোষ, ঈশ্বর আমাকে সাহায্য করবেন। আমি ওখানে ছিলামই না, মৈথিলী। ওখান থেকে ২০ কিলোমিটার দূরে ছিলাম। সোলায় ছিলাম আমি। বিধানসভায় গেলাম, সাড়ে আটটা থেকে বিধানসভার কাজ শুরু হল। আমি ওখানে গিয়েছিলাম। নিজের বাড়ি থেকে বেরিয়ে আনন্দীবেনের অফিসে যাই। আমরা দু'জনে ওখানে গিয়েছিলাম। ওখানে গল্প করছিলাম।

প্র: তাঁর মানে আনন্দীবেনকেও কি জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে?

উ: আমি জানি না। ওখান থেকে আমি হাসপাতালে যাই, কারণ সমস্ত মৃতদেহেগুলো সোলা সিভিল হাসপাতালে রাখা ছিল। আমার নার্সের বাবা গোধরার ঘটনায় নিহত হন, তাঁর মৃতদেহ শনাক্ত করার জন্য ওখানে যেতে হয় আমাকে। অমিত শাহ আর আমি সিভিল হাসপাতালে যাই। সেখানে হিন্দুরা পর্যন্ত আমার ওপর অত্যাচার চালায়। প্রচণ্ড খেপে ছিল ওরা। আমার আর অমিত শাহের বিরুদ্ধে ওরা চিৎকার করছিল। পিআই তাঁর নিজের গাড়ির দিকে নিয়ে যান আমাকে, গাড়িতে করে আমাকে বের করে আনেন।

প্র: অভিযোগটা কী?

উ: ওরা নানান স্বাক্ষীকে দিয়ে প্রমাণ করতে চাইছে যে আমি দাঙ্গায় উসকানি দিয়েছি, আমিই জনতাকে নেতৃত্ব দিয়েছি। আমি আমার হাসপাতালে চলে এসেছিলাম.... একজন মহিলার বাচ্চা

হওয়ার সময় হাজির থাকতে হয়েছিল। বেলা তিনটার দিকে হাসপাতালে যাই আমি। ওরা বলছে আমার মোবাইল তখন এই এলাকাতেই ছিল। অর্থাৎ আমি ওখানে উপস্থিত ছিলাম।

প্র: গোরধন জাদাফিয়া তো স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন। ওকেও কি একই কারণে সরিয়ে দেওয়া হয়?

উ: না। মুখ্যমন্ত্রীর সুনজরে ছিলেন না বলেই সরানো হয় তাকে।

প্র: তাঁর মানে অমিত শাহের ক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রী যেভাবে স্বাক্ষীদের ব্যবহার করেছিলেন, গোরধন ভাইকে বাঁচানোর জন্য তেমনটা করেননি?

উ: না (হাসি)।

প্র: অর্থাৎ দাঙ্গার অযুহাতে গোরধন জাদাফিয়াকেও ঝেড়ে ফেললেন উনি?

উ: একদমই তাই।

প্র: তাঁর মানে যাদের উনি পছন্দ করতেন না, তাদের ঝেড়ে ফেলার একটা ভালো উপায় হয়ে উঠেছিল এটা?

প্র: হ্যাঁ।

প্র: এই অমিত শাহের ব্যাপারটা কী?

উ: উনি হচ্ছেন মোদির লোক, মোদির খুবই ঘনিষ্ঠ।

উ: আমি ভাবতাম আনন্দীবেন হচ্ছেন ওর লোক।

উ: আনন্দীবেন হচ্ছেন ডান হাত আর উনি বা হাত। অমিত শাহকে বাইরে আনার জন্য সবরকম চেষ্টা করেন উনি। আদবানি উনার সঙ্গে দেখা করতে আসেন। সুষমা স্বরাজ ওর বাড়িতে গিয়েছিলেন।

প্র: কিন্তু আপনি গ্রেপ্তার হওয়ার পর এসব কিছুই করা হয়নি।

উ: কী আর করা যাবে। ঈশ্বর আছেন।

দেখেশুনে মনে হচ্ছে ওকেই প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তুলে ধরা হবে। তাকে টক্কর দেওয়ার মতো কেউ নেই। আনন্দীবেনকে মুখ্যমন্ত্রী বানিয়ে দেবেন উনি।

প্র: ইয়ে সব লোগ কিতনা বোলতে হ্যায় উনকে পিছে। ইয়ে আপকে এনকাউন্টার কপ্‌স্‌ ভি ইয়েহি বোলতে হ্যা কি ইউ অ্যান্ড থ্রো কিয়া?

উ: হ্যাঁ, বানজারা খুব ভালো ছিল। দেখো, এনকাউন্টার্স তো কিয়া ইন লোগো নে, লেকিন জো সাহি বজা হ্যায়, এনকাউন্টারগুলো কেন ঘটেছে এগুলো সামনে আসে না। সোহরাব উদ্দিনকে মারা হলো টেররিস্ট বলে, কিন্তু তাঁর স্ত্রী কওসর বাইকে কেন মারলে, সে তো টেররিস্ট ছিল না। লোকটা খারাপ ছিল, তাকে এনকাউন্টারে মারতে পারো, তাঁর বউকে মারলে কেন?

প্র: হরেন পান্ডিয়া আর গোরধন জাদাফিয়া দোনো কো নিকাল দিয়া না?

উ: গোরধনভাই তো ঠিক থে, হরেন পান্ডিয়া খুব কাজের লোক ছিলেন।

প্র: লেকিন গোরধন কো ভি তো রায়টস মে ইউজ করকে ফেক দিয়া ইসনে?

উ: ঠিক তাই।

সারা গুজরাট জুড়েই দাঙ্গা হল, কিন্তু ওরা শুধু নারোডার বিধায়কের পিছনেই লেগে পড়ল, মানে আমরা পিছনে।

প্র: আপনাকে বলির পাঠা বানালো?

উ: হ্যাঁ।

প্র: মোদিকে জিজ্ঞাসাবাদ করার ব্যাপারটা কি দাঁড়াল?

উ: উনি সিট এর সামনে হাজির হয়েছিলেন, কিন্তু ওকে রেহাই দেওয়া হয়।

প্র: কিন্তু যে যুক্তিতে আপনাকে গ্রেপ্তার করা হল, সেই একই যুক্তিতে তো উনাকেও গ্রেপ্তার করা উচিত ছিল?

উ: হা হা..... (ঘাড় নাড়লেন)।

প্র: আগামীকাল আমি উনার সঙ্গে দেখা করব, আপনাদের মোদির সঙ্গে।

উ: মোদির সঙ্গে দেখা হলে জিজ্ঞেস করো উনি এত বিতর্কিত কেন?

প্র: তাই?

উ: উনি সবকিছুকেই নিজের অনুকূলে ঘুরিয়ে দেন।

প্র: এইসব লোকেরা কি জেলে আপনার সঙ্গে দেখা করতে আসতেন?

উ: না, একজনও নয়।

প্র: তাঁর মানে আবার যে কোন দিন আপনাকে জেলে যেতে হতে পারে?

উ: হ্যা, যে কোন দিন, যে কোন দিন। বিচারের রায়টা বের হবার অপেক্ষা শুধু।

প্র: আমি মোদিকে জিজ্ঞেস করতে যাব কেন? উনি তো এখন (আমার সব প্রশ্নই) এড়িয়ে যাবেন?

উ: ওর সঙ্গে দেখা হলে একটু ঘুরিয়ে প্রশ্ন করো। প্রথমে ওর প্রশংসা করবে, তারপর জানতে চাইবে...

প্র: আপনার ব্যাপারে?

উ: ঘুরিয়ে প্রশ্ন করো, জানতে চেয়ো কেন তাঁর কিছু মন্ত্রী জড়িত ছিলেন? পি.সি. পান্ডেকে জিজ্ঞেস করো। উনি সব জানেন, সত্যিটা জানেন। ওকে জিজ্ঞেস করো, উনি আহমেদাবাদের কমিশনার ছিলেন।

প্র: তাহলে উনি সত্যিটা বলছেন না কেন?

উ: তা বলতে পারব না।

প্র: এখন আমি বুঝতে পারছি কেন ওর মুখটা গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল (মায়া কোদনানি সম্পর্কে প্রশ্ন করার পর)।

উ: এখন আর উনি আমার সম্বন্ধে কিছু বলতে যাবেন কেন?

প্র: মোদি সম্পর্কে কী বলবেন?

উ: ওর প্রশংসা করো, ওর কাজকর্মের ধারার প্রশংসা করো, তাহলেই উনি মুখ খুলবেন। কী উত্তর দেবেন সবাই জানে, মুখস্ত বুলি, 'আমি বিবেকানন্দকে ভালোবাসি, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলকে ভালোবাসি।' উনাকে আমার কথা জিজ্ঞেস করলে বলবে, 'আচ্ছা হ্যাম ক্যা করে, সিট কাজ করছিল, ফোন কলের

রেকর্ড ছিল', কিংবা মিষ্টি সুরে ছোট্ট করে বলবেন, 'ওটা বিচারধীন বিষয়।'

প্র: কিন্তু এই সবকয়টা পয়েন্ট তো ওর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য?

উ: হাহা.... কথাটা ওকেই বলো।

প্র: ও হ্যাঁ, জয়ন্তী রবির সঙ্গে দেখা করার কথা ছিল আমার। গোধরার ঘটনার সময় উনিও ছিলেন নাকি?

উ: হ্যাঁ, জয়ন্তী রবি, গোধরার কালেক্টর ছিলেন, অফিসার ইনচার্জ। আনন্দীবেনকে কোনো দাঙ্গা করতে না দেয়ার জন্য তখন তাকে তোপের মুখে পড়তে হয়েছিল। তখন উনি সরকারের সুনজরে ছিলেন না। এখন উনি আবার ফিরে এসেছেন। পুরোটা জানি না। তাঁর সঙ্গে দেখা হলে যেন বলো না যে তুমি আমাকে চেনো কিংবা আমার সঙ্গে দেখা করেছো। বললে সেটা উনি ঠিক মনে রেখে দেবেন।

আরএসএসের কাছে মায়া কোদনানি যে অভিযোগ জানিয়ে বলেছিলেন, তাঁর সাজা হল অথচ মোদিকে ছেড়ে দিল সিট, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। অমিত শাহকে যে মোদির ঘনিষ্ঠ বলে মনে করতেন মায়া কোদনানি, সেই সঙ্গেই মনে করতেন অমিত শাহকে বাঁচানোর জন্য সবকিছু করতে পারেন মোদি, এ ব্যাপারেও ও কোনো সন্দেহ নেই। সবার সঙ্গে কথা বলার সময় বহুবার যে কথাটা শুনেছিলাম উনিও সেটাই বলেছিলেন: অফিসারদের ব্যবহার করা হয়েছিল এবং সময়মতো ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছিল।

গীতা জোহরি

ভোরে পানিকে ঘুম থেকে ডেকে তুললাম। সেদিন ওকে আমার দরকার। পানির বয়স বড়জোড় ১৮, গ্রিনল্যান্ডের একটা কনফেকশনারির শেফ হিসেবে কাজ করত। দারুণ দারুণ পোষাক পরে। ফাউন্ডেশনে যেকোন পার্টির পানিই হচ্ছে মধ্যমণি। আমি 'শীলা কি জওয়ানি' বাজালেই মুখটা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, তৎক্ষণাৎ নাচতে শুরু করে। একবার আমরা আহমেদাবাদ যাওয়ার সময় মুম্বাই বিমানবন্দরেও একই কাণ্ড করেছিল। আমার মাথায় একটা পরিকল্পনা ছিল, কিন্তু বুঝে উঠতে পারছিলাম না পানি আমাকে সাহায্য করতে পারবে কিনা। সারাদিন ধরে যে সাম্প্রতিকতম জ্যাজ গানটা শুনে চলেছে, সেটা ছাড়া এই মুহূর্তে আর কিছুতেই কোনো উৎসাহ নেই ওর।

পানিকে বললাম বাইরে বেরিয়ে একটু ধুমপান করে আসা যাক। তারপর জানতে চাইলাম একটা সারাদিনের জন্য রাজকোট যেতে ও রাজি কিনা। বললাম আমার একটা মিটিং আছে, ঘণ্টাখানেক সময় লাগবে, ওর সাহায্য দরকার। বেশ উত্তেজিত সুরে ও বলল, 'বাসে যাওয়া হবে?' বললাম: হ্যাঁ, যেতে ছ'ঘণ্টা লাগবে, একটা হোটেলে থাকব। অন্য একটা কারণেও পানির সাহায্য দরকার ছিল আমার। আহমেদাবাদে কোনভাবে থাকার জায়গা জুটিয়ে নিয়েছি, কিন্তু রাজকোটে উপযুক্ত প্রমাণপত্র লাগবে এবং সেক্ষেত্রে পানি খুবই সাহায্য করতে পারবে।

রাজকোট যাওয়ার বাস ধরলাম আমরা পরের দিন সকালে। সঙ্গে ক্যামেরা নিয়েছি, পিঠের ব্যাগটা চিপস্, ল্যাপটপ, গান আর চকোলেটে ভর্তি। হালকা খাবার খাওয়ার জন্য বাস দাঁড়াতেই পানি সোজা সিগারেটের দোকানে গিয়ে হাজির হল। বাসটা পুরুষে ঠাসা, অধিকাংশই ব্যবসায়ী। অতএব পানি সিগারেট ধরাতে সবার নজর গিয়ে পড়ল ওর দিকে। সারাক্ষণ ওর হাতটা ধরে রেখেছিলাম, যেন অবাঞ্ছিত নজরের হাত থেকে রক্ষা করতে চাইছি ওকে। আহমেদাবাদে না ফেরা পর্যন্ত পানির সব

দায়িত্ব আমার। অদ্ভূত একটা আত্মীয়তার বন্ধন অনুভব করছিলাম ওর সঙ্গে। যেন আমার ছোট বোন, যা আমার কোন দিনই ছিল না।

হোটেলে পৌঁছে পানির পাসপোর্ট দেখাতেই কেল্লা ফতে। আমার নাম মৈথিলীই লেখা হল। ঘরে ঢুকেই উত্তেজনায় চিৎকার করে উঠল পানি। বাথরুমে একটা বাথটাব আছে, কাচের জানালা দিয়ে গোটা শহরটা দেখা যাচ্ছে। পানি রোমাঞ্চিত, আমি নার্ভাস। সেই সময়ের সবথেকে বিতর্কিত অফিসার গীতা জোহরি আমাকে একটা এ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়েছেন। তাকে বলেছিলাম একজন সফল নারী হিসেবে তাঁর কথা তুলে ধরতে চাই। একটা ভূয়া চিত্রনাট্যও পাঠিয়েছিলাম।

আমরা গীতা জোহরির কাছে যেতেই উনি আমাদের ঘরে নিয়ে গেলেন। বললেন খুব উত্তেজিত হয়ে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। তাকে রাজকোটের কমিশনার করে দেওয়া হয়েছিল, ফলে তাঁর বাড়ি খুঁজে পেতে কোনো অসুবিধে হয়নি আমাদের। কয়েক মিনিটের মধ্যেই পানির সঙ্গে দিব্যি জমে গেল তাঁর। হাত পা নেড়ে আমাদের বাসযাত্রার বর্ণনা দিচ্ছিল পানি। তারপর জোহরি বললেন আট বছর আমেরিকায় থাকার ফলে আমি নাকি পুরো বিদেশি হয়ে গেছি।

'আপনি একেবারে বিদেশি উচ্চারণে কথা বলেন।' তারপর নিজের মেয়ের কথা বললেন। সে বিদেশে থাকে। তাঁর বন্ধুরা হামেশাই রাজকোটে এসে ওদের সঙ্গ থাকে। পরের বার এলে পানিকে তাঁর বাড়িতে থাকতে বললেন। পানি এককথায় রাজি হয়ে গেল। আমি ঘাড় নাড়লাম। এখন তর্কবিতর্কের সময় নয়। পানিকে পরে বুঝিয়ে বললেই চলবে।

প্রথমে ওর সাহসিকতা সম্বন্ধে নানান ঘটনার কথা বলে বিস্মিত সুরে জানালাম যে একটা রিপোর্টে ওর সম্বন্ধে কিছু খারাপ কথা আছে। 'ওঃ, ওই সোহরাব উদ্দিনের এনকাউন্টারের ঘটনাটা। এ ব্যাপারে আপনার তো তেমন কিছু জানা নেই। ওই হত্যার ঘটনায় গুজরাটের সব অফিসারদেরই জেরার মুখে পড়তে হয়েছে।'

চোখ বড় বড় করে বললাম–হ্যাঁ, যতজন অফিসারের সঙ্গে দেখা করেছি, সকলেই এই ঘটনাটার কথা বলেছেন। একটা 'গুন্ডা' যেন গোটা রাজ্যের প্রতিনিধি হয়ে উঠেছে– কথাটা বলতে গিয়ে হেসে ফেললেন তিনি। তাঁর জুনিয়র ভি.এল সোলাঙ্কির বক্তব্য অনুযায়ী, এই সেই গীতা জোহরি, যিনি সাজানো বন্দুকযুদ্ধে সোহরাব উদ্দিনকে হত্যা করার যে স্ট্যাটাস রিপোর্ট সুপ্রিম কোর্টে পাঠানোর কথা ছিল তা বদলে দিতে বলেছিলেন। অমিত শাহের বাড়িতে অনুষ্ঠিত একটা মিটিংয়ে ওই রিপোর্টের নানান বিষয় পাল্টে দিতে বলা হয়েছিল তাকে। সিবিআই এর হাতে তদন্তের ভার তুলে দেওয়ার সময় তদন্তকে ভুল পথে চালিত করার জন্য গীতা জোহরিকে কঠোর তিরস্কার করেছিল সুপ্রিম কোর্ট।

এখন গীতা জোহরি সম্বন্ধে কিছু তথ্য পাঠকদের জানিয়ে রাখা দরকার।

১৯৮২ ব্যাচের গীতা জোহরি হচ্ছেন গুজরাটের প্রথম আইপিএস অফিসার। ১৯৯০ থেকে তাঁর কর্মজীবনে বহু উত্থান পতন ঘটেছে। ১৯৯২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে দরিয়াপুর পোপাটিওয়াড়ে মাফিয়া ডন আব্দুল লতিফের ডেরায় হানা দিয়ে তাঁর বন্দুকবাজ শরিফ খানকে পাকড়াও করে বিখ্যাত হয়ে ওঠেন জোহরি। লতিফ অবশ্য পালিয়ে যেতে পেরেছিল।

২০০৬ সালে সিআইডি (ক্রাইম) এ থাকার সময় সাজানো বন্দুকযুদ্ধে সোহরাব উদ্দিন শেখ ও তাঁর স্ত্রী কওসর বাইকে হত্যার তদন্তের নেতৃত্বে ছিলেন তিনি। সুপ্রিম কোর্টে সোহরাব উদ্দিনের ভাই রুবাব উদ্দিনের জমা দেওয়া পিটিশনের ভিত্তিতেই এই তদন্ত করা হয়। তাঁর বিস্তৃত ও কঠোর তদন্তের ফলে প্রমাণিত হয় ওটা আসলে সাজানো বন্দুকযুদ্ধ ছিল। তদন্তে জানা যায় বেশ কয়েকজন পুলিশ অফিসার জড়িত ছিলেন এই ঘটনায়। তাঁর জোগাড় করা স্বাক্ষ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে ১৩ জন পুলিশ অফিসার গ্রেপ্তার হন, যাদের মধ্যে বিতর্কিত ডিআইজি ডি.জি. বানজারা, এসপি রাজকুমার এবং দীনেশ এমএন–ও ছিলেন। ডিআইজি পুলিশ রজনীশ রাই এদের গ্রেপ্তার করেন, তিনি এই তদন্তের দায়িত্বে ছিলেন।

কিছুদিনের মধ্যেই রজনীশ রাইকে তদন্ত থেকে সরিয়ে গীতা জোহরিকে তাঁর জায়গায় বসানো হয়। যাওয়ার আগে তিনজন অভিযুক্তের টেলিফোন রেকর্ড সম্বলিত সিডিগুলো নিজের উর্ধ্বতনদের হাতে তুলে দিয়ে যান রজনীশ রাই। নিজের উর্ধ্বতনদের কাছে চরম পরীক্ষা দিতে হয় জোহরিকে এবং তাকে সর্বোচ্চ আদালতের কাছে সরাসরি রিপোর্ট দিতে বলা হয়। দায়রা আদালতে এই মামলার যে চার্জশীট তিনি পেশ করেন তা কঠোরভাবে সমালোচিত হয়। জোহরি যেভাবে এই মামলা চালিয়েছেন তাতে নানান ত্রুটি খুঁজে পেয়ে মামলাটি সিবিআই এর হাতে তুলে দেওয়ার নির্দেশ দেয় সুপ্রিম কোর্ট।

সাজানো বন্দুকযুদ্ধের মামলায় সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ছিলেন জোহরি। আগে একটি লেখায় আমি বলেছিলাম, 'এক আদর্শ জগতে এবং আদর্শ পরিস্থিতিতে, যেসব মহিলা সরকারি চাকরিতে যোগ দিতে চান তাদের কাছে দৃষ্টান্ত হয়ে উঠতে পারতেন গীতা জোহরি। কিন্তু এটা কোনো আদর্শ জগৎ নয় এবং ভাগ্যও গীতা জোহরিকে সাহায্য করেনি।'

তাকে দেখে মনে হচ্ছিল বেশ চাপে আছেন, তাই সবকিছু ঠিক আছে কিনা জানতে চেয়েই কথোকথন পর্ব শুরু করলাম।

উ: গত মাস দুয়েক খুব কঠিন অবস্থার মধ্য দিয়ে যাচ্ছি....পরিস্থিতি খুব খারাপ।

প্র: আপনি কি আগে থেকেই আঁচ করেছিলেন যে বিতর্ক শুরু হতে চলেছে।

উ: অনেক সময় আগে থেকে বোঝা যায় না। আমিও বুঝিনি, আগে থেকে আঁচ করার কোন কারণও ছিল না। বিশেষত কেউ যখন ভালো কাজ করে, তখন সে আশা করে না কেউ তাঁর কাজে কোনো ভুল খুঁজে পাবে। কিন্তু নানান কারণে অনেক সময় সব গণ্ডগোল হয়ে যায়, অনেক সময় রাজনৈতিক কারণেও হয়।

প্র: আপনার ব্যাপারটা কি বেশিরভাগই রাজনৈতিক কারণে ঘটেছে?

উ: হ্যাঁ, বেশিরভাগই রাজনৈতিক কারণে। নানা ধরনের সরকার - রাজ্যে একরকম, কেন্দ্রে অন্যরকম।

প্র: আপনার সম্বন্ধে অনেক কিছু পড়েছি। আপনি নাকি পার্লামেন্টকে প্রায় অচল করে দিয়েছিলেন?

উ: হাহা। হ্যাঁ, ওই সোহরাব উদ্দিনের ঘটনাটায়। খবরের কাগজে কিছু জঘন্য রিপোর্ট বেরিয়েছিল। কাগজের রিপোর্টে খুব খারাপ খারাপ কথা লেখা হয়েছিল আমার ব্যাপারে।

প্র: তাঁর মানে আপনি বলতে চাইছেন সিবিআই কখনোই আপনাকে গ্রেপ্তার করতে চায়নি?

উ: না, সিবিআই কখনোই বলেনি যে আমাকে তাঁরা গ্রেপ্তার করতে চায়। আমি তখন লন্ডনে ছিলাম, ট্রেনিং নিচ্ছিলাম আর এইসব কথা কানে আসছিল। ফিরে আসার পর খবরের কাগজের রিপোর্টগুলো দেখলাম। আরে বাবা, যদি কোন প্রমাণ থাকে তো হাজির করো। সেটাই আমি বলেছিলাম তাদের। এসব কথা কিন্তু অফ দ্য রেকর্ড বলছি, ঠিক আছে? মূলত স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর ব্যাপারেই ওরা প্রশ্ন করেছিল আমাকে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে আমার কখনো সামনাসামনি দেখা হয়নি। সিবিআই যখন আমাকে প্রশ্ন করল, বললাম অমিত শাহের সঙ্গে কখনো সামনাসামনি দেখা হয়নি আমার। কেউ, কোনো রাজনীতিবিদ আমার সঙ্গে কথা বলেন না, কারণ আমাকে ওরা ভয় পান। গত দু'বছরে কেউ আমাকে ফোন করেননি।

প্র: ওই একই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কথা বলছেন?

উ: হ্যাঁ, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। শুনতে অদ্ভূত লাগবে, কিন্তু আমি কখনো ওর সঙ্গে কথা বলতে চাইনি। আসলে ওরা আমাকে স্রেফ ভয় দেখাচ্ছিল। আমার স্বামী আমাকে প্রচুর সাহায্য করেছেন। সব অবস্থায় দৃঢ়ভাবে আমার পাশে থেকেছেন, প্রতিটা দরখাস্ত লিখতে সাহায্য করেছেন। উনি একজন ফরেস্ট অফিসার, গান্ধীনগরে থাকে।

প্র: সকলেই এই এনকাউন্টারটা নিয়ে নানান কথা বলাবলি করছে .... সোহরাব উদ্দিনের এনকাউন্টারের ঘটনাটা। খুব ইন্টারেস্টিং ঘটনা...

উ: ওর থেকেও ওর স্ত্রী কওসর বাই এর ঘটনাটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। বয়স্কা মহিলা, দুটো বাচ্চা ছিল, দু'জনেই তখন অল্পবয়সি। মহিলার বয়স তখন ৩৫ কি ৪০ হবে। আগে অন্য কারও সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল ওর। ইন্দোরে বোনের কাছে থাকতে গিয়েছিল। ওর বোন ওখানে বিউটি পার্লার চালাত। ওখানেই এই সোহরাব

উদ্দিনের প্রেমে পড়ে ও। আগের স্বামীর থেকে ডিভোর্স নিয়ে ওরা বিয়ে করে। সোহরাব উদ্দিন ক্রিমিনাল ছিল, চাঁদাবাজি করত।

প্র: একজন ক্রিমিনালের জন্য গোটা রাজ্য জুড়ে আলোড়ন শুরু হয়ে গেল?

উ: হ্যাঁ, সে ক্রিমিনাল ছিল। সোহরাব উদ্দিনকে এনকাউন্টারে মারতে চেয়েছিল ওরা, কিন্তু কাজটা করল একেবারে বোকার মতো। লোক ভর্তি একটা বাস থেকে ধরা হয় ওকে। এটা করা উচিত নয়। এসব কাজ গোপনে করতে হয়, এত খোলাখুলি করতে নেই। তাই ওরা ফেঁসে গেল।

প্র: তারপর ওই মহিলাকেও এনকাউন্টারে মেরে দেওয়া হল?

উ: মহিলা সোহরাব উদ্দিনকে ছাড়তে চায়নি, সে বুঝেছিল সোহরাব উদ্দিনকে এনকাউন্টার করে মেরে দেবে তাঁরা। সোহরাব উদ্দিনকে হত্যা করার পর তাঁরা বুঝতে পারে কওসর বাই সব ফাঁস করে দেবে, তখন ওকেও মেরে দেয় তাঁরা। তাই সোহরাব উদ্দিনকে এনকাউন্টারের নামে মেরে দেওয়াটা মূল প্রশ্ন ছিল না, মূল প্রশ্ন ছিল কওসর বাই এর খুন হওয়াটা। সোহরাব উদ্দিন সম্ভবত মানুষ হিসেবে খারাপ ছিল না। কওসর বাই এর বাড়ির লোকেরা ব্যাপারটা বুঝতে পেরে সুপ্রিম কোর্টে যায়। সেই সময় সিআইডি ক্রাইমে ছিলাম আমি। সুপ্রিম কোর্ট ঠিক করল ব্যাপারটা আমাদের কাছে পাঠাবে। সম্ভবত আমি একজন মহিলা এবং অন্য একজন মহিলা নিখোঁজ বলেই কেসটা আমার কাছে পাঠানো হয়। তখন আমি ওকে খুঁজতে শুরু করি। তখনই আসল ব্যাপারটা শুরু হল। ব্যাপারটা রাজনৈতিক বিষয়ে পরিণত হল। কওসর বাই আর সোহরাব উদ্দিনের কথা ভুলে গেল সবাই।

প্র: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এর সঙ্গে জড়িয়ে পড়লেন কেন?

উ: কারণ সকলেই বলছিল কাজটা বেআইনিভাবে করা হয়েছে, অন্যায়ভাবে খুন করা হয়েছে। সোহরাব উদ্দিন খুন হয়ে গেল, কওসর বাই খুন হযে গেল, তারপর তদন্ত শুরু হতেই সবকিছু বেড়িয়ে পড়ল। বোঝা গেল (কাজটা) নিশ্চয়ই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নির্দেশেই করা হয়েছিল। তবে কোনো প্রত্যক্ষ প্রমাণ ছিল না। ১৩ জন পুলিশ অফিসারকে গ্রেপ্তার করি আমি। সংখ্যাটা নেহাত

কম নয়। এটা ছিল স্রোতের বিরুদ্ধে যাওয়া, রাজ্যের বিরুদ্ধে যাওয়া। খুব কঠিন কাজ।

প্র: নিজের লোকেদের বিরুদ্ধে যেতে হল আপনাকে?

উ: হ্যাঁ।

প্র: কিন্তু সরকার আপনার ওপর এত চাপ সৃষ্টি করল?

উ: হ্যাঁ, প্রত্যেকে করেছিল, আমার সহকর্মীরা পর্যন্ত। এসব হচ্ছে নিজেদের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব, কিন্তু শেষ পর্যন্ত না, সোহরাব উদ্দিনের কাজকর্ম আমি সমর্থন করি না, কিন্তু তার জন্য উপযুক্ত উপায় আছে, আইনি পদ্ধতিতে কাজ করতে হবে, অন্তত কাগজে কলমে এমনভাবে রাখতে হবে যাতে আপাতভাবে কাজটাকে আইনসম্মত বলেই মনে হয়।

প্র: আপনার পক্ষে সেটা নিশ্চয়ই খুব কঠিন সময় ছিল?

উ: তা ছিল। অন্তত সোহরাব উদ্দিনের ঘটনায় অফিসারদের গ্রেপ্তার করতে আমি খুব একটা স্বস্তি অনুভব করিনি। তবে কওসর বাই এর ব্যাপারে আমার কোন অস্বস্তি ছিল না।

প্র: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে তখন গ্রেপ্তার করা হয়নি?

উ: না, ওকে আমি গ্রেপ্তার করিনি, কেননা নিজের লোকেদের গ্রেপ্তার করতে হলে অকাট্য প্রমাণ দরকার।

প্র: কিন্তু সিবিআই তো ওকে গ্রেপ্তার করেছিল?

উ: সিবিআই শুধুমাত্র স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আর অন্য একজন অফিসারকে গ্রেপ্তার করেছিল। আমি গ্রেপ্তার করেছিলাম ১৩ জনকে। ওরা অন্য কাউকে গ্রেপ্তারও করেনি অথবা অন্য কোন অভিযোগ যোগও করেনি। দুর্বল আইনি প্রমাণের ভিত্তিতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে গ্রেপ্তার করেছিল ওরা। আমি সেটা করিনি।

অনেকে বলেন সাজানো বন্দুকযুদ্ধের মামলায় প্রথমদিকে চমৎকার কাজ করেছিলেন জোহরি, পরে তাঁর স্বামীর সঙ্গে যুক্ত কিছু দুর্নীতির ঘটনা কাজে লাগিয়ে তাকে ব্ল্যাকমেইল করা হয়।[২৩] সিবিআই এর কাছে দাখিল করা একটা নোটে বলা হয়, নিজের স্বামী আইএফএস অফিসার অনিলের জন্যই তদন্ত প্রক্রিয়াকে ধোয়াটে করে দেন তিনি এবং এই মামলা থেকে অমিত শাহকে বাঁচিয়ে দেন। কিন্তু যে পুলিশ অফিসার একটা অটোয় চড়ে কুখ্যাত গ্যাংস্টারের ডেরায় হানা দিতে পারেন, তাকে ব্লাকমেইল করে

থামিয়ে দেওয়া যাবে এটা যেন ঠিক মেনে নেওয়া যায় না। নিজের ওপর চাপ আসছে জানিয়ে গীতা জোহরি সিবিআইকে লিখে জানানোর পর অমিত শাহকে বাঁচানোর জন্য যে সম্মিলিত প্রচেষ্টা হয়, এটুকু থেকেই অনেক কিছু বোঝা যায়। ঘটনাচক্রে, সিবিআই গীতা জোহরিকে আবার জিজ্ঞাসাবাদ করার কয়েকদিন আগে রাজ্যসভার তৎকালীন বিরোধী নেতা অরুন জেটলি ২০১৩ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংয়ের উদ্দেশ্যে একটি দীর্ঘ চিঠি লেখেন।[২৪]

সেই চিঠির নিম্নোদ্ধৃত অংশটুকু অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য:

> কমতে থাকা জনপ্রিয়তার সামনে দাঁড়িয়ে কংগ্রেসের নীতি বুঝতে কোনো অসুবিধা হয় না। রাজনীতিগতভাবে বিজেপি এবং নরেন্দ্র মোদির বিরুদ্ধে লড়ার সাধ্য কংগ্রেসের নেই। তাদের পরাজয় আসন্ন। বিভিন্ন তদন্তকারী সংস্থার অপব্যবহার করে তাঁরা এখনও পর্যন্ত গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং গুজরাটের আইন, পরিবহন ও সংসদীয় বিষয়ক মন্ত্রী এবং ভারতীয় জনতা পার্টির সাধারণ সম্পাদক শ্রী অমিত শাহ এবং বিজেপির অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ নেতাদের নানান মিথ্যা মামলায় জড়ানোর বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করেছে।

সোহরাব উদ্দিন ও তুলসী প্রজাপতিকে সাজানো বন্দুকযুদ্ধে হত্যা করার দায়ে সাত বছরের জন্য জেলে যান ডি.জি. বানজারা। পরে সাজানো বন্দুকযুদ্ধে ইশরাত জাহানকে হত্যার ঘটনাতেও অভিযুক্ত হন। তিনি বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগে অমিত শাহকে অভিযুক্ত করে একটি চিঠি[২৫] লেখার ঠিক দু'সপ্তাহ পরে অরুণ জেটলির এই চিঠিটি প্রকাশিত হয়। বানজারা লিখেছিলেন, সমস্ত পুলিশ কর্মকর্তাকে জেলে পঁচে মরতে পাঠিয়ে বিচারব্যবস্থাকে প্রভাবিত করে নিজেকে মুক্ত করে নেন অমিত শাহ। এই চিঠিতে গিরিশ সিংঘলের মতো অফিসারদের মনোভাব বিবৃত করেন বানজারা। মোদি-শাহ জুটি জনগনকে ব্যবহার করো এবং ছুড়ে ফেলো

নীতি অনুযায়ী চলেন বলে অভিযোগ করেছিলেন সিংঘল। তিনি লিখেছিলেন:

একটা সময় আমি বুঝতে পারি এই সরকারের যে কেবলমাত্র আমাদের রক্ষা করার ব্যাপারে কোনো আগ্রহ নেই তাই নয়, বরং তাঁরা আমাকে এবং আমার অফিসারদের জেলে পাঠানোর জন্য গোপনে সবরকম চেষ্টা করছে। যেন একদিকে সিবিআই এর হাত থেকে নিজেদের বাঁচাতে পারে এবং অন্যদিকে রাজনৈতিক ফায়দা উঠাতে পারে। সকলেই জানেন যে গত ১২ বছর ধরে গুজরাটের আকাশে এনকাউন্টার মামলাগুলির ঔজ্জ্বল্য অক্ষুণ্ন রেখে বিপুল রাজনৈতিক ফায়দা লুটেছে এই সরকার, অন্যদিকে জেলখানা বন্দি পুলিশ অফিসারদের ভবিষ্যত সম্বন্ধে প্রায় কিছুই না বলে উদাসীন হয়ে থেকেছে। সুপ্রিম কোর্টের প্রতি সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা রেখেই একটা কথা বলতে চাই। আমি আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করি শ্রী অমিত শাহের আইনি ও রাজনৈতিক চক্রান্ত, চালবাজি ও কৌশলের স্বরূপ উন্মোচনের স্বার্থে সোহরাব উদ্দিন এবং তুলসীরাম প্রজাপতি সাজানো বন্দুকযুদ্ধ মামলা গুজরাট থেকে সরিয়ে নেওয়া উচিত নয়।

আমি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলতে চাই যে শ্রী অমিত শাহের জঘন্য কৌশলের সাহায্যে এই সরকার কেবলমাত্র নিজেরই স্বার্থরক্ষা করছে। যেন ভেসে থাকতে ও সমস্ত দিক থেকে ফুলেফেঁপে উঠতে পারে। অন্যদিকে পুলিশ অফিসারদের বিপজ্জনক অবস্থায় ছুঁড়ে ফেলছে যেন ডুবে গিয়ে অস্বাভাবিক মৃত্যু হয় তাদের। একমাত্র গুজরাটের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদির প্রতি সর্বোচ্চ বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার দরুনই এত দীর্ঘদিন চুপ করে ছিলাম আমি, যাকে আমি ঈশ্বরের মতো ভক্তি করি। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে শ্রী অমিত শাহের অশুভ প্রভাবের ফলে আমার ঈশ্বর এক্ষেত্রে সময়োপযোগী পদক্ষেপ নিতে পারেননি। শ্রী অমিত শাহ তাঁর চোখ ও কান দখল করে নিয়েছেন এবং বিগত ১২

বছর ধরে ছাগলকে কুকুরে ও কুকুরকে ছাগলে পরিণত করে তাকে ভুল পথে চালিত করে চলেছেন। রাজ্য প্রশাসনের উপর তাঁর অশুভ দখলদারি এতই মজবুত যে কার্যত তিনিই বেনামে গুজরাট সরকারকে চালাচ্ছেন বলা যায়।

চিঠিটা খবরের কাগজের হেডলাইন হয়ে যায়, কেননা একসময় যে মানুষটি নরেন্দ্র মোদি ও অমিত শাহের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিলেন তিনিই এখন তাদের বিরুদ্ধে চক্রান্তের অভিযোগ আনছেন এবং ভবিষ্যতে আরও কিছু ফাঁস করার ইঙ্গিত দিচ্ছেন। কয়েকদিনের মধ্যে আর একজন আত্মগোপনকারী পুলিশ অফিসার প্রাক্তন ডিজি পি.সি. পান্ডে, যিনি ইশরাত জাহানের ঘটনায় অভিযুক্ত ছিলেন- প্রকাশ্যে এসে সংবাদমাধ্যমের কাছে এ সম্বন্ধে কথা বলার প্রতিশ্রুতি দেন।

কেন্দ্রে বিজেপি ক্ষমতায় আসার কয়েক মাসের মধ্যেই ডি.জি. বানজারা জামিন পেয়ে যান। গুজরাটে তাকে বীরের অভ্যর্থনা জানানো হয়। সোহরাব উদ্দিনের ঘটনায় গ্রেপ্তার হওয়া দু'জন প্রধান অভিযুক্ত অফিসার রাজকুমার পান্ডিয়ান ও অভয় সুদাসামা জামিন পেয়ে গেছেন এবং গুজরাট পুলিশ তাদের আগের পদে পুনর্বহাল করেছে। এই বছরের শুরুর দিকে গীতা জোহরির বিরুদ্ধে যাবতীয় অভিযোগ তুলে নেয় সিবিআই। এরপর তাকে গুজরাট পুলিশের ডিজিপির পদে প্রোমোশন দেওয়া হয়েছে। গুজরাটে সমস্ত মামলার ন্যায়চক্র যেন উল্টোদিকে ঘুরতে শুরু করেছে।

হরেন পান্ডিয়া

২০০৮ সালে মুম্বাইতে *তেহেলকা*'র হয়ে রিপোর্টিং করার সময় মুম্বাইয়ের এনকাউন্টার বিশেষজ্ঞ পুলিশ কর্মকর্তা দয়া নায়কের সঙ্গে বেশ কয়েকবার দেখা হয় আমার। দয়া একটা বিশেষ চরিত্র। শেষবার যখন তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করি তখন আমার সঙ্গে কথা বলতে অস্বীকার করেন তিনি, কেননা গুজরাটে সাজানো বন্দুকযুদ্ধে সাদিক জামালকে হত্যায় তাঁর যুক্ত থাকার কথা উল্লেখ করেছিলাম আমি। তাকে ও প্রদীপ শর্মাকে দীর্ঘ সময় ধরে জেরা করে সিবিআই এবং দু'জনকেই সাসপেন্ড করা হয়। এদের দু'জনের ঘটনা নিয়ে 'অব তক ছপ্পন' নামে একটা সিনেমাও বানিয়েছিলেন চিত্রপারিচালক রামগোপাল ভার্মা। বেআইনি কাজের দায়ে ধরা পড়ার আগ পর্যন্ত প্রচুর প্রশংসা পেতেন তাঁরা। বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে সম্মান জানানো হত তাদের।

দয়ার প্রচুর বন্ধু ছিল সংবাদমাধ্যমে। বলা যায় রীতিমতো মিডিয়া ঘনিষ্ঠ ছিলেন তিনি। লোখান্ডওয়ালা মার্কেটের কোস্টা ক্যাফে বা ক্যাফে কফি ডে-তে নিয়মিত যেতেন, তাঁর জিমের বন্ধুরা এসে সেখানে দেখা করতেন তাঁর সঙ্গে। সবসময় কোমরে রিভলভার গোজা থাকত। সেটা দেখাতে ভালোবাসতেন তিনি। ২০০৮ সালে আমার সহকর্মী ও আমি যখন মহারাষ্ট্রের সন্ত্রাসবিরোধী কঠোর আইন এমসিওসিএ-র অপব্যবহার নিয়ে কাজ করছিলাম, তখন মাঝেমধ্যে দয়ার সঙ্গে দেখা হত আমার। এইরকম একবারের দেখার সময় দয়া যা বলেছিলেন তা আমি আজও ভুলিনি। তিনি বলেছিলেন: দেশের বৃহত্তম রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড ঘটেছে গুজরাটে, মোদির চরম প্রতিদ্বন্দ্বী হরেন পান্ডিয়ার হত্যাকাণ্ড। জানতে চেয়েছিলাম, তাঁর কাছে কোনো প্রমাণ আছে কিনা। তিনি বলেছিলেন, 'আপনি সাংবাদিক, তদন্ত করাটা আপনার কাজ।' কথাবার্তা সেখানেই শেষ হয়।

হরেন পান্ডিয়ার হত্যা সম্বন্ধে প্রায় সব লেখা পড়ে দেখার চেষ্টা করি বাড়ি ফেরার পর। কথিত মুসলিমদের হাতে পান্ডিয়া নিহত হওয়ার পর থেকেই নানান সন্দেহ মাথাচাড়া দেয়। কিন্তু পান্ডিয়ার বাবা বিট্ঠল পান্ডিয়া তাঁর

মৃত্যুর আগে পর্যন্ত বলে গেছেন, গুজরাটে নিজের রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীদের হাতেই নিহত হয়েছেন তাঁর পুত্র। হরেন পান্ডিয়ার স্ত্রী জাগ্রুতি পান্ডিয়া গুজরাটের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। তিনিও বলেছিলেন পান্ডিয়ার হত্যাকান্ডের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী এবং অমিত শাহ যুক্ত ছিলেন।[২৬] কিন্তু তাঁর এই অভিযোগকে পরিবারের শোকার্ত সদস্যদের ক্রোধের প্রকাশ হিসেবেই ধরে নেওয়া হয়।

এ ব্যাপারে একটা লেখার কথা আমার স্পষ্ট মনে আছে। ঘটনাচক্রে সেটাও একটা অনুসন্ধানী প্রতিবেদন। লিখেছিলেন সিনিয়র সাংবাদিক সংকর্ষণ ঠাকুর। সংকর্ষণের বুদ্ধিদীপ্ত লেখা থেকে কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত করছিঃ

"একমাত্র প্রত্যক্ষদর্শী স্বাক্ষী ইয়াদরাম বলেছেন, চোখের সামনে যা ঘটে গেল তা দেখে তিনি এতই হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছিলেন যে প্রায় এক ঘণ্টা সেখান থেকে নড়তেই পারেননি। যখন চলতে পারলেন, তখন খবরটা পুলিশকে না জানিয়ে তাঁর শেঠকে জানান। শেঠ একজন স্থানীয় ব্যবসায়ী, নাম স্নেহাল আদেনওয়ালা। আদেনওয়ালাও পুলিশে খবর দেননি, যদিও তিনি জানতেন ল গার্ডেনের পার্কিং লটে মারুতি ৮০০ গাড়িতে পড়ে থাকা মৃতদেহটি হরেন পান্ডিয়ার। পান্ডিয়ার সহযোগি প্রকাশ শাহকে ফোন করে তাকেই খবরটা জানান তিনি। শাহ-ও পুলিশে খবর দেননি। তিনি ফোন করেন পান্ডিয়ার সেক্রেটারি নীলেশ ভাটকে, যিনি পান্ডিয়ার বাড়িতেই ছিলেন এবং বসের ফিরতে এত দেরি হচ্ছে কেন ভেবে দুশ্চিন্তা করছিলেন। খবর পেয়ে ল গার্ডেনে ছুটে যান ভাট, গাড়িটা খুঁজে বের করে দেখেন তাঁর বসকে বেশ কয়েকবার গুলি করা হয়েছে। তখন দশটা বেজে গেছে। দু'ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে শহরের কেন্দ্রস্থলে একটা গাড়িতে মৃত অবস্থায় পড়ে আছেন গুজরাটের সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। ইতিমধ্যে কন্ট্রোল রুম থেকে এলিসব্রিজ থানায় একটা ফোন আসে, ল গার্ডেনে কী হচ্ছে খবর নিন, শোনা যাচ্ছে ওখানে একটা ঝামেলা হয়েছে। ওয়াই.এ. মেখ নামে একজন এসআই রওনা হন। ল গার্ডেনের দিকে যাওয়ার সময় কন্ট্রোল রুম থেকে আর একটা ফোন পান তিনি, ল

গার্ডেনে নয়, পরিমল গার্ডেনে যান। গাড়ি ঘুরিয়ে নেন শেখ। ১০টা ৫০ মিনিটে আবার একটা ফোন আসে তাঁর কাছে, এবার আবার ল গার্ডেনে যেতে বলা হয়। ১০টা ৫৪ মিনিটে সেখানে পৌছান তিনি, অর্থাৎ পান্ডিয়া গুলিবদ্ধ হওয়ার প্রায় তিন ঘণ্টা পরে। সেখানে পৌঁছে কী দেখলেন তিনি? শেখের সহকর্মী এসআই নায়েক তাঁর আগেই ল গার্ডেনে যাওয়ার জন্য রওনা হয়েছিলেন, কিন্তু তখনও ঘটনাস্থলে পৌছাননি তিনি। সেদিন সকালে স্থানীয় পুলিশকে কে নির্দেশ দিচ্ছিলেন? মাত্র দশ মিনিট দূরত্বের একটা জায়গায় পৌছাতে এত দেরি হল কেন? সেইদিনই বিকালে ভিএস হাসপাতালে ময়নাতদন্ত করা হয়। তা থেকে জানা যায়, মোট সাতটা গুলির ক্ষত আছে, চালানো হয়েছিল পাঁচটা গুলি। এগুলির মধ্যে পাঁচটা ক্ষত ০.৮ সেন্টিমিটার এবং দুটো ০.৫ সেন্টিমিটার ব্যাসের। তলগত প্রসারণ ও প্রতিরোধের কারণে একই আগ্নেয়াস্ত্র থেকে বিভিন্ন মাপের ক্ষত সৃষ্টি হওয়া বৈজ্ঞানিকভাবে অসম্ভব নয়। পাঁচটা গুলি থেকে সাতটা ক্ষত সৃষ্টি হওয়াও সম্ভব, কেননা, শরীরের অঙ্গগুলির মধ্যে দিয়ে গুলি চলাচল করতে পারে। কিন্তু যেসব বিশেষজ্ঞ মৃতদেহ পরীক্ষা করেছেন তাদের মতে এক্ষেত্রে এমনটা হওয়া একান্তই অসম্ভব। অন্য কথায় বললে, দুটি গুলির কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি।

ময়নাতদন্তের রিপোর্টে ৫ নম্বর ক্ষত সৃষ্টিকারী যে গুলির কথা বলা হয়েছে সেটি পান্ডিয়ার শরীরের নীচের দিকে অণ্ডকোষ দিয়ে ঢুকে উপরে বুক পর্যন্ত চলে যায়, তাঁর তলপেটের চামড়া ছিঁড়ে যায়। একজন মানুষ গাড়িতে বসে আছেন, মারুতি ৮০০-র মতো ছোট একটা গাড়িতে পান্ডিয়ার মতো ছ'ফুটেরও বেশি লম্বা সবলদেহী একজন মানুষ, তাকে কি অণ্ডকোষ দিয়ে গুলবিদ্ধ করা সম্ভব? যেকোন লোকের অণ্ডকোষে গুলি লাগলে, যেমন পান্ডিয়ার লেগেছিল, অনেক রক্তপাত হবে। অণ্ডকোষ হচ্ছে রক্তবাহী জালিকার একটা জটিল জাল, যা শরীরের উত্তাপ নিয়ন্ত্রণ করে। পান্ডিয়ার কি রক্তপাত হয়েছিল? হ্যাঁ? হয়েছিল। গাড়িতে কোনো চিহ্ন পাওয়া গেছে? না। পান্ডিয়াকে অণ্ডকোষে, ঘাড়ে, বুকে দু'বার, বাহুতে একবার গুলি করা হয়েছিল। গাড়িটা রক্তে ভেসে যাওয়া উচিত ছিল, অন্তত্পক্ষে তাঁর সিটটা রক্তে ভেসে যাওয়া তো একান্তই উচিত

ছিল। কিন্তু ফরেনসিক রিপোর্টে গাড়িতে কোনো রক্তের দাগ পাওয়া যায়নি, সামনের প্যাসেঞ্জার সিটে এবং চাবির চেনে কিছুটা রক্তের দাগ ছিল (সেন্ট্রাল ফরেনসিক সায়েন্স ল্যাবরেটরি রিপোর্ট নাম্বার সিএফএসএল-২০০৩/এফ-০২৩২)।

পান্ডিয়ার গাড়ির ভিতরে বন্দুকের গুলির খোসা পড়ে থাকার কথাও লেখা নেই ফরেনসিক রেকর্ডে (মোবাইল ফরেনসিক সায়েন্স ল্যাবরেটরি, গুজরাট স্টেট এর রিপোর্ট)। আপাতভাবে মনে হচ্ছে, তিনি গাড়িতে বসে থাকার সময় অন্তত পাঁচটি গুলি করা হয় তাকে। তারপরও কোনো গুলির খোসা পড়ে রইল না?

আসলেই কি হরেন পান্ডিয়াকে গাড়ির মধ্যে গুলি করা হয়েছিল? নাকি অন্য কোথাও তাকে হত্যা করে পরে দেহটা এনে গাড়িতে রেখে দেওয়া হয়েছিল? এর উত্তর খুঁজে পাওয়ার মতো কিছু সূত্র ছিল, কিন্তু সেগুলো উধাও হয়ে গেছে অথবা সেগুলো পাওয়ার কোনো উপায় নেই। ল গার্ডেনে গাড়ি থেকে পান্ডিয়ার দেহ বের করার সময় তাঁর পায়ে জুতা ছিল। কিন্তু যখন তাকে ময়নাতদন্তের জন্য নিয়ে যাওয়া হয় তখন আর তাঁর পায়ে জুতা ছিল না, জুতার কথা রেকর্ডে লেখাও নেই। সেদিন সকালে পান্ডিয়া কোথায় গিয়েছিলেন তা জানার খুব গুরুত্বপূর্ণ সূত্র থাকতে পারত জুতায়।

পান্ডিয়ার সেলফোনটি উদ্ধার করে পুলিশ গাড়ি থেকে। স্যামসাংয়ের ধূসর রঙের একটা ফ্লিপটপ সেলফোন। হয় পুলিশ সেই সেলফোনটি আদৌ পরীক্ষা করে দেখেনি, অথবা পান্ডিয়ার ফোনের সেদিনের যাবতীয় কল রেকর্ডের কথা চেপে যাচ্ছে। কল রেকর্ড থেকে জানা যেতে পারত পান্ডিয়া কাদের ফোন করেছিলেন অথবা তাকে কারা ফোন করেছিল। সত্য উদ্ঘাটনের ক্ষেত্রে এই কল রেকর্ডও একটা গুরুত্বপূর্ণ সূত্র হয়ে উঠতে পারত। কিন্তু না, কোনো রেকর্ড রাখা হয়নি। পান্ডিয়ার সার্ভিস প্রোভাইডার হাচ এর কাছে কল রেকর্ড চাওয়া হলে তাঁরা ২০০৩ সালের জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি মাসের রেকর্ড পেশ করে। কিন্তু ২০০৩ সালের মার্চ মাসের রেকর্ডের ব্যাপারে এক বিচিত্র অজুহাত দেয় তাঁরা, "এগুলো বড্ড

পুরোনো"। কিন্তু জানুয়ারি আর ফেব্রুয়ারি মাস তো মার্চের আগেই আসে, তাইনা!

পান্ডিয়া হত্যা মামলার অন্যতম অভিযুক্ত মুফতি সুফিয়ানের বিচিত্র ঘটনার সঙ্গে কি এইসব সূত্র হারিয়ে যাওয়ার কোনো সম্বন্ধ আছে? সুফিয়ান একজন তরুণ মাওলানা, আহমেদাবাদ লাল মসজিদে জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিয়ে দ্রুত বিখ্যাত হয়ে উঠেছিলেন। ২০০২ সালের হিংসাত্মক ঘটনাবলির পর তিনি আরও উগ্র হয়ে ওঠেন, নামায পরবর্তী আলোচনায় পাল্টা সাম্প্রদায়িক আগুন জ্বালানোর ব্যাপারে ইন্ধন জোগাতে থাকেন। এটাও সবার জানা যে আহমেদাবাদের অপরাধ জগতের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল, মাদকদ্রব্যের চোরাচলানই যে জগতের মূল কাজ। শোনা যায় পান্ডিয়াকে হত্যা করার জন্য আসগর আলির সঙ্গে যোগাযোগের ব্যাপারে একটা ভূমিকা ছিল সুফিয়ানের। হত্যার এক সপ্তাহের মধ্যেই, যখন নাকি তাঁর উপর নজর রাখা হচ্ছিল, দেশ ছেড়ে পালিয়ে যান তিনি। কোথায় গেলেন? কেউ জানে না। বাংলাদেশ, পাকিস্তান, আফগানিস্তান, ইয়েমেন... কেউই সঠিক জানে না। সিবিআই তাদের ওয়েবসাইটে সুফিয়ানকে দুর্বৃত্ত হিসেবে চিহ্নিত করে এবং ইন্টারপোলকে দিয়ে তাঁর নামে রেড কর্নার নোটিশ জারি করায়। কাগজে কলমে সুফিয়ান ছিলেন একজন ওয়ান্টেড ব্যক্তি, পান্ডিয়াকে হত্যার চক্রান্তে অভিযুক্ত। তা সত্ত্বেও সুফিয়ানের রহস্যময় অন্তর্ধানের বছরখানেকের মধ্যে তাঁর স্ত্রী ও সন্তানরাও উধাও হয়ে যায়। জনৈক সিনিয়র পুলিশ অফিসার বলেছেন, 'ওদের ওপর কড়া নজর রাখা উচিত ছিল। সুফিয়ানের খোঁজ পাওয়ার ব্যাপারে ওরাই ছিল আমাদের শেষ সূত্র।' তথাপি উধাও হয়ে গেল তাঁরা। এটা কীভাবে সম্ভব হতে পারে? কেউ কি তাদের পালাতে সাহায্য করেছিল? সুফিয়ান কি অনেক অস্বস্তিকর গোপন তথ্য জেনে ফেলেছিল? বিশেষ কোনো লেনদেন হয়েছিল কি?"

২০১০ সালে জাগ্রুতি পান্ডিয়ার সঙ্গে প্রথমবার দেখা হয় আমার। স্টিং অপারেশন শুরু করার অল্প কিছুদিন আগে। তখনও সোহরাব উদ্দিনের এনকাউন্টারের ঘটনার তদন্ত করছি আমি। তাঁর আগে তাঁর স্বামীর মৃত্যুর

পর টিভিতে নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি জানাতে দেখেছি তাকে, মনে হয়েছে ভদ্রমহিলা খুব মনোবলসম্পন্ন। আহমেদাবাদের এক উচ্চ মধ্যবিত্ত এলাকায় দুই ছেলে আর নিজের বাবার সঙ্গে থাকতেন। জাগ্রুতিবেন বা জাগ্রুতির (পরে তাকে নাম ধরেই ডাকতাম আমি) মধ্যে খুব সাহসী একটা ব্যাপার ছিল। আজ আমি তাকে একজন প্রিয় বন্ধু বলতে পারি, স্বামীর হত্যাকারীদের খুঁজে বের করার জন্য যার সাহসী লড়াই নিঃসন্দেহে অভিনন্দনযোগ্য। আরএসএস, লালকৃষ্ণ আদবানি ও আরও অনেক বিজেপি নেতার খুবই প্রিয়ভাজন ছিলেন হরেন পাণ্ডিয়া, সেইসঙ্গে গুজরাটের অনেক পুলিশ অফিসারেরও প্রিয় ছিলেন তিনি। গুজরাট দাঙ্গায় তাঁর ভূমিকা নিয়ে বিতর্ক থাকলেও, অনেকে মনে করেন মুসলিম সম্প্রদায়ের অনেকের কাছেও প্রিয় ছিলেন তিনি।

মুসলিমদের সম্বন্ধে একটু তিক্ততা ছিল জাগ্রুতির মধ্যে, কারণ একজন মুসলিমই তাঁর স্বামীকে হত্যা করেছে বলে অভিযোগ উঠেছিল। আমার সৌভাগ্য যে রানা নামটাকে হিন্দু নাম বলে ধরে নিয়েছিলেন তিনি। ভুলটা শুধরে দিতে বেশ অস্বস্তি হচ্ছিল। ঠিক করলাম পরে আমার কোন কলামে পদবীটা দেখলে তিনি নিজেই বুঝতে পারবেন আমি কোন ধর্মের মানুষ। স্বামীর হত্যাকারীদের সম্বন্ধে বলতে গেলেই মুসলিমদের সম্বন্ধে 'ওইসব লোকেরা' বলতেন তিনি, মাঝেমধ্যে মুসলিমদের 'হিংস্র লোকজন' ও বলতেন। কিন্তু জাগ্রুতিবেনের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের সময় থেকেই দেখেছিলাম তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস কোন ক্ষমতাশালী লোক মুসলিম ছেলেদের 'ব্যবহার করেছে' এবং এই ব্যাপারটা রীতিমতো ধাধায় ফেলে দিয়েছিল আমাকে। আট বছর আগে স্বামীকে হারিয়েছেন ভদ্রমহিলা। তাঁর ছোট ছেলের বাবার শেষকৃত্যের স্মৃতিটুকুও প্রায় মনে নেই। তা সত্ত্বেও ছেলেদের ভালোভাবে বড় করে তোলার পাশাপাশি ন্যায়বিচারের লড়াই ছেড়ে সরে আসেননি তিনি। একই সঙ্গে খেয়াল রেখেছেন তাঁর সন্তানদের ওপরে এর কোনো প্রতিকূল প্রভাব যেন না পড়ে। তাঁর ছোট ছেলেটি রাজ্যস্তরের খেলোয়াড়, বড় ছেলে একটা প্রাইভেট ফার্মে চাকরি করে। দু'জনেই দৃঢ়ভাবে মায়ের পাশে দাঁড়িয়েছে। তাদের বাবার মৃত্যুর পিছনে যে বৃহত্তর কোনো চক্রান্ত আছে, মায়ের এই বিশ্বাস সম্বন্ধে কোন সন্দেহ

নেই তাদের মনে। ফোন কলের রেকর্ড দেখে স্বামীর মৃত্যু সম্বন্ধে সঙ্গত কারণেই প্রশ্ন তুলেছিলেন তিনি। ফোন কলের এই রেকর্ডগুলি তিনি আমাকে দেন, সেইসঙ্গে দেন মুফতি সুফিয়ান ও তাঁর পরিবারের সম্বন্ধে বিভিন্ন তথ্য। সুফিয়ানের বাড়ির লোকেদের সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করেছিলেন তিনি।[২৭]

সংকর্ষণ ঠাকুরের বিস্তৃত রিপোর্টও (যার কথা আগেই বলা হয়েছে এবং কিছু অংশ উদ্ধৃতও করা হয়েছে) আমাকে দিয়েছিলেন তিনি। অমিত শাহ এর জেলে যাওয়া এবং পান্ডিয়ার হত্যা সম্বন্ধে অনেক জরুরি তথ্য যে তুলসী প্রজাপতি (যিনিও সাজানো বন্দুকযুদ্ধে নিহত হন) জানতেন তা প্রকাশ্যে আসার ঠিক পরেই তাঁর সঙ্গে দেখা করি আমি। স্টিং অপারেশন শেষ করে দিল্লিতে ফিরে আসার কয়েক মাস পরে পান্ডিয়ার হত্যা সম্বন্ধে একটা নিবন্ধ লিখি আমি। সেই লেখায় কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তুলেছিলাম:

> মুফতি সুফিয়ানের বাবা সুদাসামার প্রশংসা করলেন কেন, যিনি তখন আহমেদাবাদের ক্রাইম ব্রাঞ্চে ছিলেন? সুফিয়ানের বাবার কথা সত্যি বলে ধরে নিলে প্রশ্ন ওঠে, সুদাসামা কেন প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে তাদের পরিবারের কোন ক্ষতি হবে না? প্রাথমিক তদন্তের রিপোর্ট সিবিআই এর হাতে তুলে দিয়েছে ক্রাইম ব্রাঞ্চ। সিবিআই বলছে এটা একটা বিশেষ মামলা। এখানে যুক্তিসঙ্গতভাবেই প্রশ্ন তোলা যায়, এই ঘটনার তদন্তকারী টিম সুফিয়ানকে খুঁজে বের করার জন্য কোনো চিঠি পায়নি কেন?

দ্বিতীয়ত, সিবিআই এর তদন্তকারী অফিসার জানিয়েছেন পান্ডিয়ার ২০০৩ সালের মার্চ মাসের কল রেকর্ড পাওয়া যায়নি, যদিও তাঁর আগের দু'মসের কল রেকর্ড পাওয়া গেছে। এইসব রিপোর্টের একটি কপি *তেহেলকা*'র কাছে আছে। তাতে দেখা যাচ্ছে, আহমেদাবাদের জনৈক মহিলা সাংবাদিক ৪০ বার ফোন করেছিলেন তাকে। আশ্চর্য বিষয় হল, সিবিআই অথবা পুলিশ, কেউ তাকে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করেনি।

তৃতীয়ত, প্রধান স্বাক্ষী অনিল ইয়াদরাম, যিনি ল গার্ডেনের কাছে একটি খাবারের দোকান চালান। অনিল এই হত্যাকাণ্ডের প্রত্যক্ষদর্শী বলে জানা গেছে; তিনি পরস্পর বিরোধী বক্তব্য দিয়েছেন। পুলিশকে তিনি বলেছেন একেবারে হতভম্ব হয়ে পড়ার দরুন তিনি কিছু করে উঠতে পারেননি, তবে এক ঘণ্টা পরে তাঁর দোকানোর মালিককে ফোন করেন, সেই মালিক আবার ফোন করে পান্ডিয়ার সহকারীকে খবর দেন, কিন্তু পুলিশকে কিছু জানান না। *তেহেলকা* যখন ইয়াদরামের সঙ্গে দেখা করে, তখন তিনদিন তিনরকম কথা বলেন তিনি। প্রথম দিন বলেন, আলি একটা বাইকে করে এসেছিল, দ্বিতীয় দিন বলেন, আলিকে গাড়ির দিকে হেঁটে আসতে দেখেছিলেন তিনি, তৃতীয় দিন বলেন, সব ঘটনা ঠিকঠাক মনে নেই তাঁর।

চতুর্থত, ফরেনসিক রিপোর্ট থেকে জানা যাচ্ছে পান্ডিয়ার কুর্তায় ছয়টি ছিদ্র ছিল, কিন্তু তাঁর শরীর থেকে মাত্র পাঁচটা গুলি পাওয়া গেছে। তিনি যদি স্টিয়ারিং হুইলের পিছনে বসা অবস্থায় থেকে থাকেন এবং ডানদিকের কিছুটা খোলা জানালা দিয়ে গুলি চালানো হয়ে থাকে, তাহলে তাঁর অণ্ডকোষে কোন ক্ষত হওয়ার কথা নয়। বিবাদী পক্ষ বলেছেন এবং বিচারপতি মেনে নিয়েছেন যে তিনি বাকাঁ হয়ে প্যাসেঞ্জার সিটে পড়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু তেমনটা হওয়া সম্ভবপর বলে মনে হয় না।

পঞ্চমত, পুলিশ কন্ট্রোল লগবুকে লেখা এফআইআর যথেষ্ট বিভ্রান্তিকর অথবা দেরিতে লেখা। এত ফাঁকফোকর এবং স্বাক্ষীরা ক্রমাগত বক্তব্য বদলানোর ফলে, দুঃখজনক হলেও খুব স্বাভাবিকভাবেই এই মামলায় ১২ জন অভিযুক্তকে গত মাসে রেহাই দিয়েছে হাইকোর্ট। আলি যে পান্ডিয়াকে গুলি করেছিল তাঁর কোনো প্রমাণ নেই বলে রায় দিয়েছে।

পরে জাগ্রতিবেনের সঙ্গে অনেকবার সাক্ষাত হয়েছে। আমরা গাড়িতে করে বেড়াতে যেতাম, কিংবা বাইরে ডিনার খেতে যেতাম। তিনি একজন

বিশ্বস্ত মানুষ পেয়েছিলেন যার কাছে সব কথা বলা যায়, আর আমি একজন বন্ধু পেয়েছিলাম যিনি আমাকে সত্য উদ্ঘাটনের শক্তি জোগাতেন। একবার তাঁর স্বামীর হত্যা মামলায় দাখিল করা চার্জশিটটা নেওয়ার জন্য তাঁর সঙ্গে দেখা করি। সেটা ছিল রমজান মাস, আমি রোজা রেখেছিলাম। তাঁর বাড়িতে ঢোকামাত্রই আমাকে লেবুপানি এগিয়ে দিলেন তিনি। বললাম আমি খেতে পারব না। উনি আমাকে চা খেতে বললেন। বললাম, 'না জাগ্রুতিবেন, রমজান হ্যা না', মেরা রোজা হ্যায়। কুছ খা পি নেহি সকতি।' রীতিমতো বিস্মিত হয়ে কোনোমতে তিনি বললেন, 'আপ মুসলমান হো? মুঝে পাতা নেহি থা।' আমার সামনে আমার ধর্মের লোকেদের সম্বন্ধে বহুবার অপ্রীতিকর কথা বলেছেন ভেবে বেশ লজ্জিত মনে হল তাকে। তাকে আশ্বস্ত করে বললাম, 'কোন ব্যাপার না। আপনার যায়গায় আমি হলে আমারও ভুল হতে পারতো। আপনার সাথে যা হয়েছে এটা ক্ষমা করার মতো নয়।'

আমি চার্জশিট আর কল রেকর্ডগুলো দেখতে লাগলাম। পাশে বসে ধৈর্য্য সহকারে আমার সব প্রশ্নের উত্তর দিয়ে চললেন তিনি। তিনি বললেন ২০০২ সালে গুজরাট গণহত্যার ব্যাপারে ভি.আর. কৃষ্ণ আইয়ার নেতৃত্বে নাগরিক অনুসন্ধান শুরু হওয়ার আগেই তাঁর স্বামীকে পদচ্যুত করা হয়। কাজটা খুব গোপনে করা হয়েছিল, কিন্তু তাঁর ধারণা মোদিই এটা করিয়েছিলেন। তাঁর মতে, হরেনের সঙ্গে নানান ব্যাপারে মর্যাদার লড়াই ছিল মোদির, সেইজন্যই বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্বকে অগ্রাহ্য করে তাঁর স্বামীকে এলিসব্রিজ আসনটি ছেড়ে দিতে বাধ্য করেন তিনি। জাগ্রুতিবেন বলেছিলেন, নরেন্দ্র মোদির জন্য একটা রাজনৈতিক কাঁটা হয়ে উঠেছিলেন পান্ডিয়া, কারণ সর্বদাই আরএসএসের সুনজরে ছিলেন তিনি এবং আরএসএস তাকে সমর্থনও করত। যখন বেরিয়ে আসতে যাচ্ছি, তিনি জানতে চাইলেন আহমেদাবাদে কোথায় থাকছি আমি। সেদিনই সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টার দিকে, আনুমানিক ইফতারের ৩০ মিনিট আগে, আমাকে ফোন করলেন তিনি। আমার হোটেলের বাইরে তিনি অপেক্ষা করছেন, কোথাও খাওয়াতে নিয়ে গিয়ে আমাকে ইফতার করাতে চান।

আমার নিরাপত্তার ব্যাপারে সেই দিন থেকে অত্যন্ত সচেতন হয়ে ওঠেন জাগ্রুতিবেন। বলতেন, এই রাজ্যকে আমি চিনি। আমার স্বামীর মৃত্যুর ব্যাপারে সত্য উদ্ঘাটনের জন্য এত খাটছেন আপনি। আপনাকে রক্ষা করা আমার কর্তব্য, বিশেষত আপনার পদবীর জন্য।

বহু অধিকারিক যুক্ত ছিলেন হরেন পান্ডিয়ার হত্যা তদন্তে। হত্যার কয়েকদিন পর নিয়ম অনুযায়ী গুজরাট পুলিশ এফআইআর লেখা ও স্বাক্ষর করার পরেই মামলাটা হাতে নেয় সিবিআই। এফআইআরটা পড়ে দেখলাম। তদন্তকারী অফিসার একজন ইন্সপেক্টর, নাম ওয়াই.এ. শেখ (আগে উদ্ধৃত সংবাদপত্রের প্রতিবেদনেও তাঁর নামের উল্লেখ ছিল)।

কাকতলীয়ভাবে শেখ ছিলেন ভি.এল. সোলাঙ্কির (গীতা জোহরির প্রসঙ্গে তাঁর কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে) বন্ধু। শেখ কারও সঙ্গে দেখা করতেন না, সংবাদমাধ্যমের লোকেরা তো সম্পূর্ণ এড়িয়ে চলতেন। তখনও আমার স্টিং অপারেশন শুরু করিনি। অমিত শাহের গ্রেপ্তারির পর আহমেদাবাদে থেকে বিষয়টা নিয়ে পড়াশোনা করার চেষ্টা করছি। ভি.এল. সোলাঙ্কির সঙ্গে দু'বার দেখা করেছিলাম আমি, আমার সম্বন্ধে যথেষ্ট খোঁজখবর নেওয়ার পর আমাকে বাড়িতে ডেকেছিলেন তিনি। তাঁর বাড়ির বাইরে কনস্টেবল ভর্তি একটা পুলিশ জিপ দাঁড়িয়ে ছিল। আসলে গীতা জোহরির বিরুদ্ধে বিবৃতি দেওয়ার পর তাঁর বাড়িতে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

আমার কাছে সেই কথাগুলোই বললেন সোলাঙ্কি যেগুলো সিবিআই এর কাছে বলেছিলেন। বেরিয়ে আসার আগে কথাচ্ছলে সোলাঙ্কিকে জিজ্ঞেস করলাম, তিনি শেখ নামে কোনো অফিসারকে চেনেন কিনা। তীক্ষ্ম সুরে তিনি বললেন, 'তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চান কেন? তাঁর সম্বন্ধে জানতেই বা চাইছেন কেন?' হালকা সুরে বললাম, 'একটা কেসের ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে একটু কথা বলতে পারলে ভালো হত।' একটু হেসে আমাকে দরজার কাছে এগিয়ে দিতে এসে তিনি বললেন, 'রহেনে দো বেন, উয়ো নেহি মিলেগি আপসে, আউর আপ ইয়ে সব মে মত পড়ো।'

নিজের সহকর্মী এবং রাজ্য প্রশাসন সম্বন্ধে ভয়ে ভয়ে থাকতেন শেখ। কারণ পান্ডিয়ার ব্যাপারে নিজে এফআইআর দাখিল করেছিলেন। মামলাটা সিবিআই এর হাতে যাওয়ার আগে পর্যন্ত এই ঘটনার তদন্তের সঙ্গে তিনিই জড়িত ছিলেন। এ মামলায় অনেক কিছু চেপে দেওয়া হচ্ছে বলে পান্ডিয়ার বাবা অভিযোগ করার পরই সিবিআইকে তদন্তের ভার দেওয়া হয়। গুজরাটের একজন আইনজীবির সঙ্গে ভালো পরিচয় ছিল শেখের, পরামর্শ নেওয়ার জন্য প্রায়ই তাঁর কাছে যেতেন। সেই আইনজীবিকে অনুরোধ করলাম শেখের সঙ্গে দেখা করিয়ে দেওয়ার জন্য। দরকার হলে ধর্মের দিকটাও ব্যবহার করতে বললাম। অর্থাৎ আমি একজন মুসলিম এবং তাঁর মতো যেসব অফিসার বর্তমান প্রশাসনের অধীনে হাঁসফাঁস করছেন তাদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন।

মুসলিম অধ্যুষিত খানপুর এলাকায় অ্যাম্বাসাডর হোটেলে থাকছিলাম সেই সময়। প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যা কাছের মসজিদের আজান শুনে রমজানের সময় সেহরি ও ইফতার খেতে সুবিধা হত। অ্যাম্বাসাডরের মালিক ছিলেন একজন সিন্ধি ব্যবসায়ী। অ্যাম্বাসেডরের ঠিক উল্টোদিকে একটা রেস্টুরেন্ট ছিল, তার মালিক ছিলেন একজন মুসলিম। ইফতারের পর চা আর এটা সেটা খেতে রেস্টুরেন্টে ভিড় করত ওই এলাকার মুসলিমরা। এখানেই আমার সঙ্গে প্রথম দেখা করতে রাজি হলেন শেখ। নিজের পরিচয় দিলাম। বললাম আমিই সেই সাংবাদিক যে সোহরাব উদ্দিন আর তুলসী প্রজাপতির মামলায় প্রমাণ জুগিয়েছিল এবং যার ফলে জেলে যেতে হয়েছে অমিত শাহকে। উনি বললেন, পরিচয় দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই, কেননা পুরো গুজরাটই রানা আইয়ুব নামে একজন লোকের কথা জানে। হেসে ফেললাম।

খুব আশঙ্কার মধ্যে ছিলেন শেখ। বললাম আমি একজন ধর্মপ্রাণ মুসলিম, ধর্মের সব রীতিনীতি মেনে চলি, দাঙ্গায় নিহতদের জন্য গভীরভাবে মর্মাহত আমি। নম্র সুরে উনি বললেন, 'আপনি *তেহেলকা*'র লোক, কথা বলতে ভয় লাগে, যদি রেকর্ড করে ফেলেন।' আমার ডায়েরি আর ব্যাগ পরীক্ষা করতে বললাম তাকে। লাজুক ভঙ্গিতে হেসে উঠলেন তিনি।

বললাম আবার তাঁর সঙ্গে দেখা করব, কিন্তু পরের সপ্তাহে একবারও যোগাযোগ করলাম না।

বুদ্ধিটা কাজে লাগল। তাঁর পরের সপ্তাহে আবার শেখের সঙ্গে দেখা করলাম। তাঁর বিশ্বাসটা ভেঙ্গে দিতে চাইছিলাম। ব্যাপারটা আমাকে কুরে কুরে খাচ্ছিল, অপরাধবোধে শেষ হয়ে যাচ্ছিলাম। উনি জানেন আমি কে। আমি হচ্ছি সাংবাদিক রানা আইয়ূব, যে সব তথ্য গোপন রাখবে। কিন্তু শেখ এমন একজন মানুষ যিনি সম্ভবত সত্যটা জানেন। পান্ডিয়ার হত্যার পর ১০ বছর কেটে গেছে, মামলার নিষ্পত্তি হওয়ার আর কোনো আশা নেই। ভাবলাম স্পাই ক্যামেরা নিয়ে গিয়ে ওর কথাবার্তা রেকর্ড করে নেব, তবে সাধারণ পন্থায় কিছু না পেলে তবেই করব সেটা। শেখের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর যেকোনো একটা প্রমাণ খুঁজে পাওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করেছি। এমনকী মুফতি সুফিয়ানের বাড়িতেও গেছি, কিন্তু তাঁরা শুধু পুলিশদের প্রশংসাই করেছে। বোঝা যায় আগে থেকেই তাদের সবকিছু শিখিয়ে রাখা হয়েছিল। পরের বার দেখা হতে খোলা মনেই কথা বলেছিলেন শেখ।

উ: আগে আপনাকে একটা কথা জানিয়ে রাখি, শুনুন। আইবির লোকেরা আপনাকে ফলো করছে। আইবির সর্বোচ্চ কর্মকর্তারাই ফলো করছে।

প্র: রাজ্য আইবি না, কেন্দ্রীয় আইবি?

উ: রাজ্য আইবি। উনি আমাকে বললেন যে আপনি আমার সঙ্গে দেখা করছেন। ওরা জানতে পেরেছে আপনি আমার সঙ্গে দেখা করছেন, তাই আমাকে সতর্ক থাকতে বলল। ওটাই ওদের কাজ.... তাই আপনাকে বলছি, একটু সতর্ক থাকবেন।

প্র: কিন্তু ওরা আমার বিরুদ্ধে যাবে কেন?

উ: ওই হরেন পান্ডিয়ার ব্যাপারটা একটা আগ্নেয়গিরির মতো। একবার সত্যিটা সামনে এলেই মোদিকে ঘরে ঢুকে যেতে হবে। না, ঘরে নয়, জেলে যেতে হবে। জেলখানায় থাকতে হবে। দেখুন না, হরেন পান্ডিয়ার ঘটনার ব্যাপারে আজম খানের বিবৃতি

বিচার করে দেখার জন্য জাগ্রুতি পান্ডিয়া আবেদন জানানোর দু'দিন পরেই উদয়পুরে গুলি করা হল আজম খানের ওপর। উনি বেঁচে গেছেন। তাঁরপর তাকে শাসানো হয়েছে এবং রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টি করা হয়েছে।

প্র: আমি কিন্তু ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছি না। আইবি কী করে জানল আমার কথা?

উ: ম্যাডাম, ওরা জানতে পেরেছে, কারণ ওরা মোদির হয়ে কাজ করে। ওই স্বাক্ষী অনিল ইয়াদরামের স্টিং অপারেশন করছেন না কেন?

প্র: করে কী হবে? কী বলার থাকতে পারে ওর?

উ: আরে, অনিল আসল ব্যাপারটা বলবে। কে প্রথম ওর সঙ্গে কথা বলে, ও কী কী জানে এবং কী করতে বলা হয়েছিল। সুদাসামাও এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। অনেক ক্রিমিনালের সঙ্গেই রীতিমতো দহরম-মহরম আছে ওর। সুদাসামা আর অন্য অফিসাররা বারোত এর মতো ইন্সপেক্টরদের সাহায্য নিয়ে এসব কাজ করে। বারোত একজন ইন্সপেক্টর, নিম্নপদস্থ অফিসার। সমস্ত লেখালেখির কাজ ওই করে থাকে।

প্র: স্বাক্ষী অনিল ইয়াদরাম মিথ্যা বক্তব্য দিল কেন?

উ: ম্যাডাম, ওকে হেফাজতে নিয়ে সব শিখিয়ে পড়িয়ে দিয়েছিল তাঁরা। খুনের আগে আগে আসগর আলি ওদের হেফাজতে ছিল, তাই তাকে সব শিখিয়ে পড়িয়ে দেওয়া হয়। মি. পান্ডিয়া খুন হওয়ার পর আসগর আলিকেও অপরাধী হিসেবে দাঁড় করতে চাইছিল তাঁরা এজন্য একজন স্বাক্ষী দরকার ছিল।

প্র: আসগরকে ওদের হেফাজতে রাখতে হল কেন?

উ: দোষটা কোন মুসলিম তাঁবেদারের ওপর চাপাতে চাইছিল তাঁরা। আসগরকে বেআইনিভাবে হেফাজতে রাখা হয়। পরে নিজের পক্ষে আর কী বলবে সে? তাছাড়া আসগর আলির স্বীকারোক্তির কোনো প্রয়োজন ছিল না। তাদের দরকার ছিল প্রমাণ।

প্র: তাঁর মানে আপনি কি বলতে চাইছেন যে তরুন বারোত, সুদাসামা আর বানজারা এই ঘটনায় জড়িত ছিলেন?

উ: হ্যাঁ। কানহাইয়া শুধু বলেছিল যে সে একটা গাড়িতে করে যাচ্ছিল এবং হরেন পান্ডিয়াকে একটা গাড়ির মধ্যে পড়ে থাকতে দেখেছিল। গুজরাট পুলিশের বানানো গল্প মেনে নিয়েছিলেন সিবিআই অফিসার গুপ্তা। সিবিআই থেকে পদত্যাগ করেন গুপ্তা, এখন উনি সুপ্রিম কোর্টের একজন আইনজীবি। রিলায়েন্সের বেতন প্রাপকদের তালিকায় ওর নাম আছে। ওকে জিজ্ঞেস করুন কেন উনি সিবিআই থেকে পদত্যাগ করলেন। উনি সুপ্রিম কোর্টে বসেন। ওর সঙ্গে দেখা করুন।

প্র: তাঁর মানে সিবিআই তদন্ত চালায়নি?

উ: ওরা স্রেফ জোড়াতালি দিয়েছে। গুজরাটের পুলিশ অফিসাররা যা বলেছিল, সেগুলোই আউড়ে গেছে।

প্র: এটা কি রাজনৈতিক হত্যা ছিল?

উ: সকলে জড়িত ছিল। আদবানির নির্দেশে মামলাটা সিবিআই এর হাতে দেওয়া হয়। কারণ আদবানি ছিলেন নরেন্দ্র মোদির উপদেষ্টা। তাই ওকে বাঁচানোর জন্য, মানে, স্থানীয় পুলিশের বক্তব্য লোকে বিশ্বাস করত না, কিন্তু সিবিআই এর বক্তব্য সবাই মেনে নেবে। মুফতি অনেক পরে পালিয়েছিল।

প্র: কার ভূমিকা প্রধান ছিল? বারোতের না বানজারার?

উ: তিনজনেরই। বারোত অন্য কোথাও ছিল, সুদাসামাকে ডেপুটেশনে আনা হয়েছিল। সুদাসামাকে ধরেছিল ওরা। উনি সরকারের হয়ে কাজ করেন। এই এনকাউন্টারের সঙ্গে পোরবন্দরের একটা সম্পর্ক আছে। এ মামলার কোনে পরিণতি নেই। আসগর আলি আর স্বাক্ষীকে নামে মাত্র দাঁড় করেছিল ওরা। ক্রাইম ব্রাঞ্চ তদন্ত করেছিল এবং সে তদন্তে কেউ বিশ্বাস করেনি, এমনকী বিট্ঠল পান্ডিয়াও নন।

প্র: সিবিআই ব্যাপারটা ঘুরিয়ে দিল কেন?

উ: এই মামলায় মোদিকে বাঁচিয়ে দিয়েছিল সিবিআই।

সবাই জানেন, কিছু কথার কোনো ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয় না। হরেন পান্ডিয়াকে গুলি করেছিলেন বলে অভিযোগ যে মানুষটির বিরুদ্ধে, সেই আসগর আলী হায়দ্রাবাদের একটা জেলে আছেন। অন্যদের গ্রেপ্তার করা হয়েছিল অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে, তুলসী প্রজাপতি এবং সোহরাব উদ্দিন হত্যায় জড়িতদের সঙ্গেও তাদের যোগাযোগ ছিল। তাহলে হরেন পান্ডিয়াকে হত্যা করেছিল কে? শেখ কি জনশ্রুতির ভিত্তিতে কথা বলেছিলেন? প্রশ্ন হল, কেন তা করবেন তিনি? তিনিই ছিলেন তদন্তকারী অফিসার, প্রাসঙ্গিক নথিপত্রে তিনিই স্বাক্ষর করেছিলেন। প্রাথমিক তদন্ত তিনিই করেন, তাঁর পর দায়িত্ব নেন অভয় সুদাসামা, পরে সুদাসামাকে গ্রেপ্তার করে সিবিআই।

সোহরাব উদ্দিন এবং প্রজাপতিকে কেন হত্যা করা হল? হত্যার উদ্দেশ্য এখনও পর্যন্ত খুব স্পষ্ট নয়। সিবিআই এর চার্জশিটে যে মুফতি সুফিয়ানকে হরেন পান্ডিয়ার হত্যার মূল কুচক্রী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে, সে এত সহজে দেশ ছেড়ে প্রতিবেশী দেশে পালাল কী করে? কেন সুফিয়ানের পরিবার অভয় সুদাসামার প্রতি এত কৃতজ্ঞ, সাজানো বন্দুকযুদ্ধে নিরপরাধ ব্যক্তিদের হত্যা করার জন্য যার নামে চার্জশিট দেওয়া হয়েছে?

যেসব স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী গুজরাটের মানুষের সবথেকে বেশি ভালোবাসা পেয়েছেন, হরেন পান্ডিয়া তাদেরই একজন। শোনা যায় একটা নাগরিক বিচারসভার সামনে গুজরাট দাঙ্গার ব্যাপারে উপস্থিত হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন তিনি। তাঁর এই ইচ্ছার মধ্যেই কি লুকিয়ে আছে প্রকৃত সত্যটা? অবিচার ও পরস্পরবিরোধী স্বাক্ষ্যপ্রমাণের গোলকধাঁধার জট ছাড়ানোর সময় এসে গেছে।

একাদশ পরিচ্ছেদ

উন্মোচন

অনুসন্ধানের কাজ শেষ করে মুম্বাইয়ে ফেরার ঠিক পরেই পি.সি. পান্ডে ফোন করেন। তিনি জানতে চান, ফিল্ম সম্বন্ধে গবেষণার কাজ শেষ করে ফেলেছি কিনা। আমাকে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে বলেন তিনি। শুনে প্রায় লাফিয়ে উঠলাম। সিনিয়রদের কাছে একটা মেইল পাঠালাম। সোমা আর তরুণ তৎক্ষণাৎ বললেন, চালিয়ে যাও। আমাকে সাহায্য করার জন্য শেষবারের মতো মাইককে আহমেদাবাদে পাঠানোর ব্যবস্থাও করলেন ওরা। মাইকের মা-বাবা ওর সঙ্গে দেখা করার জন্য দিল্লিতে এসেছিলেন। একদিনের জন্য আহমেদাবাদে যেতে হবে বলে তাদের বুঝিয়ে চলে আসে মাইক।

মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির দরজায় তন্নতন্ন করে তল্লাশি করা হবে আমাদের এটা মাইককে বুঝিয়ে বললাম, আর আমাদের ওখানে যেতে হবে যাতে পি.সি. পান্ডের মনে কোনো সন্দেহ দেখা না দেয়। রেকর্ড করার জন্য আমার ক্যামেরা লাগানো ঘড়িটা পড়ে নিলাম। সেদিনের জন্য স্থানীয় একটা টুরিস্ট কার ভাড়া করলাম। তখন আমি ফাউন্ডেশনে থাকতাম না বলে এসজি হাইওয়ের সেই নির্জন বাংলোটার চাবি একদিনের জন্য চেয়ে নিয়েছিলাম। নির্ধারিত সময়ের এক ঘন্টা আগে মোদির গান্ধীনগরের বাড়িতে পৌঁছে গেলাম আমরা। ড্রাইভারকে কাছেই গাড়িটা পার্ক করতে বলে ভাবতে লাগলাম ঘড়িটা যেন দ্রুত চলে। আমি বেশ নার্ভাস আর মাইক মিটিমিটি হাসছে। আমার মনে হচ্ছিল তল্লাশি আর মেটাল বেরিয়ারে আমার ঘড়িটা ধরা পড়লেই সব শেষ। আধ ঘন্টা পরে মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনে ঢুকলাম আমরা। তল্লাশিতে কিছুই ধরা পড়ল না। স্বস্তিতে শ্বাস নিলাম।

মোদির ওএসডি সঞ্জয় ভাবসার আমাদের সঙ্গে দেখা করলেন। অবশেষে মুখ্যমন্ত্রীর ঘরে নিয়ে যাওয়া হল আমাদের। তিনি দাঁড়িয়ে আমাদের

অভ্যর্থনা জানালেন। মাইক বলল, আহমেদাবাদের অনেক অটোয় তাঁর পোস্টার দেখেছে সে এবং তাঁর জনপ্রিয়তা দেখে অবাক হয়ে গেছে। মোদির টেবিলের ওপর বারাক ওবামা সংক্রান্ত দুটো বই ছিল।

আমি তৎক্ষণাৎ জিজ্ঞেস করলাম, 'তাহলে আপনিই কি পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী হবেন, স্যার? লজ্জায় একটু রাঙিয়ে উঠে বারাক ওবামা সম্বন্ধে বলতে শুরু করলেন তিনি, যিনি তাঁর অনুপ্রেরণা। স্বামী বিবেকানন্দের গুণাবলির কথাও বললেন। ৩০ মিনিট কথাবার্তা চলার পর মুখ্যমন্ত্রী ভাবসারকে ঘরে ডেকে বললেন তাঁর সম্বন্ধে যা যা লেখা বেরিয়েছে সেগুলো আমাদের দেখাতে। ভাবসার আমাদের তাঁর কেবিনে নিয়ে গেলেন। তাঁর টেবিলে *তেহেলকা* এবং *দ্য হিন্দুতে* মুখ্যমন্ত্রীর সম্বন্ধে প্রকাশিত লেখাপত্রের প্রিন্টআউট রাখা ছিল। আমি সেগুলো সম্বন্ধে জানতে চাওয়ায় ভাবসার বললেন, মুখ্যমন্ত্রীর অনেক শত্রু আছে। মনে হল মাইক যেন খুক খুক করে হেসে উঠল। পরে মুখ্যমন্ত্রীর লেখা নানান বইপত্র দেখানো হল আমাদের। ভারতে এবং পৃথিবীর অন্যান্য জায়গায় তাঁর বক্তৃতার রেকর্ডও শুনতে হল বসে বসে।

ভাবসার আমাকে ওইসব বই আর রেকর্ড কপি করে নিতে বললেন, কারণ তাতে আমার ছবির কাজে সুবিধে হবে। বললাম পরের বার এসে নিয়ে যাব। দু'জন ফিরে এলাম। মাইক ব্যাগপত্র গুছিয়ে নিল, দিল্লি যাওয়ার বিমান ধরতে হবে ওকে। মাইককে আলিঙ্গন করলাম, তারপর ওর বিমানবন্দরে যাওয়ার জন্য একটা ট্যাক্সি ডেকে দিলাম। কয়েক মিনিট পর মাইক ফোন করে জানালো, বিমানবন্দরে পৌঁছে দেখে পকেটে একটাও টাকা নেই। ট্যাক্সিচালক শুধু যে ওর ভাড়া নেয়নি তাই নয়, বরং ওর হাতখরচের জন্য দুইশত টাকাও দিয়ে দিয়েছে। মাইক বলল, ঠিক এই স্মৃতিটাই গুজরাট থেকে নিয়ে যেতে চেয়েছিল ও। আমি অকপটে ওর কথা সমর্থন করলাম। মাইকের সঙ্গে সেই আমার শেষ দেখা। নিশ্চিত জানি, ও যেখানেই থাকুক, নিজের দিদি, নিজের সহযোদ্ধা মৈথিলীকে ওর মনে পড়বেই। সোমাকে ফোন করে সব কিছু জানালাম। সোমা জানতে চাইল

মুখ্যমন্ত্রীকে আমি দাঙ্গা সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছিলাম কিনা। একটু কঠিন সুরে বললাম, 'সোমা, প্রথম দেখাতেই এ প্রশ্ন করা সম্ভব ছিল না।'

সন্ধ্যার দিকে সোমা ফোন করে বলল, 'রানা, দিল্লিতে ফিরে এসো।' আপত্তি করে কিছু বলতে যাচ্ছিলাম, ও বলল আমি গেলে সব বুঝিয়ে বলবে।

পরের দিন সকালে দিল্লি পৌঁছে সোজা *তেহেলকা*'র অফিসে গেলাম। মোদির কথাবার্তার রেকর্ডিংয়ের ফুটেজ আমার ল্যাপটপে ট্রান্সফার করে নিয়েছিলাম। তরুণ নিজের কেবিনে ছিলেন। সোমা আমার কাছে এল। ফুটেজটা ওদের দেখালাম। ওবামা সংক্রান্ত বইগুলো দেখে হেসে ফেলল ওরা। জিজ্ঞেস করলাম, 'আমাকে ফিরে আসতে বলা হল কেন? মোদীর অফিস থেকে কয়েকদিনের মধ্যেই ডেকে পাঠাবে আমাকে, আবার ওর সঙ্গে দেখা করার কথা আছে আমার।'

তরুণ বললেন, 'দেখুন রানা, বঙ্গারু লক্ষ্মণের ওপর স্টিং অপারেশন চালানোর পর *তেহেলকা*'র অফিস বন্ধ করে দিয়েছিল ওরা। মোদি এখন সবথেকে বেশি ক্ষমতাশালী ব্যক্তি হতে চলেছেন, প্রধানমন্ত্রী হবেন উনি। ওর গায়ে হাত দিলে আমরা শেষ হয়ে যাব।' আমি দ্বিমত পোষন করলাম। গোটা স্টিং অপারেশনটাই কি একটা বিশাল ঝুঁকি ছিল না? কিন্তু আমার প্রতিটি প্রশ্নের উত্তরে শুধু স্পষ্ট 'না' শুনতে হল।

সেদিনই সন্ধ্যার দিকে সঞ্জয় ভাবসার আমাকে ফোন করলেন। ফোনটাকে বাজতে দিলাম। তিনবার ফোন করে আমাকে না পেয়ে একটা মেসেজে তিনি জানালেন, পরের রবিবার আমার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। কাছের একটা একটা পাবলিক বুথে গিয়ে ভাবসারকে ফোন করে জানালাম আমি এখন দিল্লিতে আছি, একজন আত্মীয় মারা গেছেন। আমাকে এখন এই শহরেই থাকতে হবে। তবে কথা দিলাম এক সপ্তাহের মধ্যেই ফিরে যাব। দু'দিন পর আমার ফোন থেকে ইউনিনর সিম কার্ডটা খুলে, ভেঙ্গে ডাস্টবিনে ফেলে দিলাম। ফোনটাও ভেঙ্গে ফেলে দিলাম

ডাস্টবিনে। সেদিন থেকে চিরদিনের মতো হারিয়ে গেল মৈথিলী। সম্পাদকদের ফোন করে জানালাম, এই অনুসন্ধান প্রকাশিত হবে না।

সেই থেকে চুপ করেই ছিলাম।

আজ পর্যন্ত।

পাদটীকা

১। গুজরাটের আহমেদাবাদ শহরের কাছে একদল পুলিশ ২০০৪ সালের ১৫ জুন তিনজন সঙ্গীসহ গুলি করে মেরে ফেলে ১৯ বছর বয়সী ইশরাত জাহানকে। সেইসময় আহমেদাবাদ পুলিশ বলেছিল এরা হচ্ছে পাকিস্তানভিত্তিক সন্ত্রাসবাদী সংগঠন লশকর-ই-তয়িবার সদস্য, গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে হত্যার চক্রান্তে জড়িত ছিল। অন্য তিনজন নিহতের নাম জিশান জোহর, আমজাদ আলি এবং জাভেদ শেখ।

২। http://old.tehelka.com/dead-man-talking/

৩। https://bit.ly/2F1nNek

৪। https://bit.ly/2I6VUTX

৫। https://bit.ly/2R0Jvnm

৬। https://bit.ly/2WoOFPi

৭। https://bit.ly/2WoOGCQ

৮। রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ার পর মানসি সোনিকে যথেষ্ট ভুগতে হয়। বাড়ির লোকেরা তাঁকে আমেরিকায় ফিরে যাওয়ার জন্য চাপ দিতে থাকেন। এ থেকেই বোঝা যায়, আমার আশঙ্কা অমূলক ছিল না। এ-সংক্রান্ত ফুটেজটি প্রকাশ না-করার সিদ্ধান্ত নিই আমি।

৯। http://www.tehelka.com/2011/04/gujarat-ex-intelligence-chief-blames-modi-for-gujarat-riots/

১০। https://bit.ly/20g6vwV

১১। https://bit.ly/2YOUEdU

১২। https://bit.ly/31o2GfQ

১৩। https://bit.ly/2K2QkTZ

১৪। পূর্বোক্ত।

১৫। http://www.tehelka.com/2011/02/senior-ips-officer-sanjeev-bhatt-arrested-in-ahmedabad/?singlepage=1

১৬। https://bit.ly/2K4grKi

১৭। https://bit.ly/2X5zPu

১৮। এই স্বীকৃতিটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কেননা নানাবতী কমিশনে স্বাক্ষ্য দিতে গিয়ে রাজ্য সরকারের ভূমিকা সম্বন্ধে স্মৃতিভ্রংশতা দেখা দিয়েছিল চক্রবর্তীর এবং বিভিন্ন সময়ে দ্ব্যর্থমূলক বিবৃতি দিয়েছিলেন তিনি।

১৯। চক্রবর্তী বলছেন নানাবতী কমিশন সরকারের পক্ষে বেশি কার্যকরী ছিল, অর্থাৎ তিনি বলতে চাইছেন যে বিচারপতি নানাবতীর নেতৃত্বে গঠিত কমিশন মোদি সরকারের পক্ষপাতী ছিল

২০। এখানে চক্রবর্তী বলতে চেয়েছেন–অন্য একজন অফিসার ডিজি হিসেবে দেখা দেবেন, যিনি দাঙ্গার সময় মুসলিমদের ওপর হামলা চালানোর কাজে সরকারকে প্রশ্রয় দিয়ে চলবেন, এমন কোন আশঙ্কা থেকে তিনি পদত্যাগ করেননি।

২১। এখানে ২৭ ফেব্রুয়ারির সেই মিটিংয়ের কথা বলা হচ্ছে যেখানে মোদি নাকি মুসলিমদের হত্যা করার জন্য অফিসারদের নির্দেশ দিয়েছিলেন বলে শোনা যায়। স্টিং অপারেশন চালাতে গিয়ে অনেকের বক্তব্য শুনে আমার মনে হয়েছে- এ ধরনের কোনো নির্দেশ মোদি দেননি। তবে চক্রবর্তী এবং আশোক নারায়ণ দু'জনেই বলেছেন যে রাজ্যের বিভিন্ন অফিসারকে আলাদা আলাদা ভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। পি.সি. পাণ্ডেও প্রায় একই কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন এরকম স্পর্শকাতর পরিস্থিতিতে এবং দেশের ইতিহাসে মূলধারার সংবাদমাধ্যমে সর্বপ্রথম কোন দাঙ্গার ঘটনা সরাসরি দেখানো হচ্ছে এমন অবস্থায় এত বড় ঝুঁকি নেওয়ার মতো বোকামি কোনো মুখ্যমন্ত্রীই করতে পারেন না।

২২। চক্রবর্তী এখানে কুলদীপ শর্মার কথা বলছেন যাঁর গুজরাটের ডিজি হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু গুজরাট সরকার তাঁর বিরুদ্ধে ভুজে ২০ বছরের পুরোনো একটা এনকাউন্টারের মামলা নতুনভাবে দায়ের করে। শোনা যায় সমবায় সংক্রান্ত একটা কেলেঙ্কারির ঘটনায় শর্মা গুজরাটের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন বলেই তাঁর বিরুদ্ধ এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়। কুলদীপ ও প্রদীপ শর্মা দু'জনের বিরুদ্ধে অমিত শাহের ক্রুদ্ধ হওয়ার আর একটা কারণ হল– এরা দু'জনই নাকি একটা স্নুপগেট কেলেঙ্কারির কথা ফাঁস করে দিয়েছিলেন, যেখানে একজন মহিলার সম্বন্ধে অবৈধভাবে খোঁজখবর নেওয়ার জন্য জি.এস. সিংঘলকে দেওয়া অমিত শাহের নির্দেশ রেকর্ড হয়ে গিয়েছিল। রেকর্ডেড কথাবার্তায় অমিত শাহ বলেছিলেন কাজটা 'সাহেব'–এর নির্দেশেই করতে হবে–এখানে সাহেব বলতে সম্ভবত নরেন্দ্র মোদির কথাই বলেছিলেন তিনি।

২৩। http://www.tehelka.com/2010/09/geeta-johri-was-known-to-be-a-fearless-officer-so-what-accounts-for-her-flip-flops/?singlepage=1

২৪। http://dnaindia.com/india/report-arun-jaitley-writes-to-pm-on-congress-dirty-war-against-narendra-modi-1896969

২৫। http://www.ndtv.com/cheat-sheet/jailed-cop-dg.vanzara-attacks-amit-shah-gujarat-goverment-fake-encounters-533486

২৬। http://indiatoday.intoday.in/story/jagruti-haren-pandyas-wife-to-contest-gujarat-poles-keshubhai-patel-gujarat-parivartan-party/1/235242.html

২৭। এই হত্যার পিছনে মূল কুচক্রী ছিলেন মুফতি সুফিয়ান। স্থানীয় মাওলানা ছিলেন তিনি। পান্ডিয়া খুন হওয়ার পর স্বচ্ছন্দে গুজরাট ছেড়ে পালান তিনি। লক্ষণীয় বিষয় হল, আহমেদাবাদে পুলিশের সদরদপ্তরের একেবারে পাশে বাস করা সত্ত্বেও, পান্ডিয়া নিহত হওয়ার এক সপ্তাহের মধ্যেই পালাতে সক্ষম হন তিনি।

প্রজন্ম পাবলিকেশনের বইয়ের তালিকা

বিশ্ব রাজনীতি

১. কয়েদী ৩৪৫: গুয়ান্তানামোতে ছয় বছর
লেখক: সামী আলহায, *সাংবাদিক*
২. আফিয়া সিদ্দিকী: গ্রে লেডি অব বাগরাম
সংকলন: টিম প্রজন্ম
৩. আয়না: কাশ্মীরের স্বাধীনতার প্রতিচ্ছবি
লেখক: আফজাল গুরু
৪. উইঘুরের কান্না (প্রকাশিতব্য)
লেখক: মুহসিন আব্দুল্লাহ, *সাংবাদিক*
৫. দ্য কিলিং অব ওসামা (প্রকাশিতব্য)
লেখক: সিমর হার্শ, *সাংবাদিক*
৬. কান্দাহারের ডায়েরি (প্রকাশিতব্য)
লেখক: রবার্ট গ্রানিয়ার, *সাবেক সিআইএ স্টেশন চীফ*
৭. আফগানীদের চোখে আমেরিকা, তালেবান ও আফগান যুদ্ধ (প্রকাশিতব্য)
লেখক: আনন্দ গোপাল, *সাংবাদিক*

থ্রীলার

১. ব্লন্ড হেয়ার ব্লু আইজ (প্রকাশিতব্য)
লেখক: কারিন স্লাথার

"উচ্চ পদস্থ আমলা ও পুলিশ কর্মকর্তাদের সম্পর্কে এই বইতে যা বলা হয়েছে তা আমাদের দেশের বিভিন্ন আদালতে মুলতবি হয়ে থাকা মামলাসমূহের সাথে সম্পূর্ণ প্রাসঙ্গিক। এই বই থেকে ঐ সকল মামলা সংশ্লিষ্ট তথ্য-প্রমাণ সম্পর্কেও একটা পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যায়। এতে উল্লেখিত অপরাধসমূহ রীতিমত ভয়ংকর। কিন্তু এখানে প্রশ্ন এই যে, আমাদের দেশের সবচেয়ে প্রভাবশালী ও ক্ষমতাশালী ব্যক্তিরাই যদি অপরাধী হয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে আমাদের কী করা উচিৎ? আর আমরা যারা তাদের এই ক্ষমতা দিয়েছি, আমাদের কী বিচার হওয়া উচিৎ?"

অরুন্ধতী রায়

"**গুজরাট ফাইলস** অত্যন্ত সাহসী এবং জরুরী একটি বই।"

রামচন্দ্র গুহ

"রানা'র মত লেখিকা না থাকলে আমাদের সমাজ, রাজনীতিবিদদের নিজেদের স্বার্থে তৈরি করে নেওয়া গল্পকেই সত্য বলে মেনে নিত এবং সেগুলোর ওপরই নির্ভর করত। রানা'র এই গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য আমি তার কাছে কৃতজ্ঞ।"

হানসাল মেহতা

"যে সকল মানুষ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, বিচার ব্যবস্থার মূল্যবোধ ও সততার পরোয়া করেন, তাদের জন্য **গুজরাট ফাইলস** একটি সতর্কবাণী।"

আউটলুক ম্যাগাজিন